রঙ্গপুর শাখা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

তৃতীয় ভাগ।
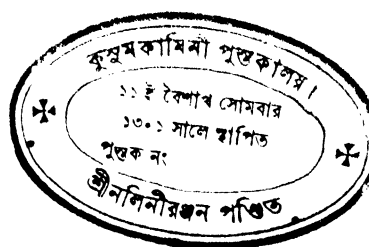
১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

শ্রীপঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল, সম্পাদক।

শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু সহকারী সম্পাদক।

রঙ্গপুর।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর শাখা কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রিণ্টার—এ, ব্যানার্জি,
মেটকাফ্ প্রেস,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রঙ্গপুর শাখা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার

তৃতীয় ভাগের সূচী।

১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

বিষয়	লেখকের নাম		পৃষ্ঠা
বগুড়ার পুরাতত্ত্ব	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ	...	১
পালি প্রকাশ	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	..	৬
মহিলাব্রত	শ্রীগিরীন্দ্রমোহন মৈত্রেয়	...	১৭
মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী	শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	...	৩০
রঙ্গপুরের ভাওয়াইয়া গান	শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	...	৩৭, ৭৪
উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বানুসন্ধান	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্	...	৪৩
প্রাচীন মুদ্রা	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	...	৫৪
প্রাচীন পুঁথির বিবরণ	শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস	...	৬২
মেয়েলী সাহিত্য (কৃষ্ণকালী)	শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	...	৭৮
রঙ্গপুরের জাগের গান	শ্রীপণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন	...	৭২
বগুড়ার শিল্পেতিহাস	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল্	...	৯১
উত্তরবঙ্গের মুসলমান সাহিত্য	শ্রীহামেদ আলী	...	১১৫
বাঙ্গালা ভাষার সমৃদ্ধি	শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য ব্যাকরণতীর্থ	...	১৩২
রাজা বিরাট ও মৎস্যদেশ	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল্	...	১৩৯
স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সময়নিরূপণ ও জীবনী	শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	...	১৪৮
স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি	শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্	...	১৫৬
বাভ্রবীকায়া	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্	...	১৬৪
রঙ্গপুর শাখা পরিষদের তৃতীয় সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণী (১৩১৪)	পরিশিষ্ট		১—২০ পৃষ্ঠা
ঐ মাসিক কার্য্যবিবরণী (১৩১৫)	ঐ		।০—৩।৵০ পৃষ্ঠা

রঙ্গপুর-শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার

তৃতীয় ভাগের

ছবির সূচী।

১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

	ছবির নাম			যে পৃষ্ঠায় গ্রথিত হইবে
১।	শ্রীবিষ্ণু গয়াসুর দমন করিতেছেন	...	...	৩
২।	সশিষ্য বুদ্ধমূর্ত্তি ...	...	...	৩
৩।	ক্ষীরমোদক হস্তে গোপালমূর্ত্তি	...	...	৩
৪।	খোদার পাথর (একাংশ)...	...	...	৪
৫।	ঐ (অপরাংশ)...	...	...	৪
৬।	সোপানশ্রেণীর ন্যায় খোদিত পাথর	...	..	৪
৭।	শীলাদেবীর ঘাটের নিকটস্থ প্রাচীরের প্রস্তর		...	৫
৮।	ঐ		...	৫
৯।	বেল আমলার প্রাচীন মন্দিরত্রয়	...	...	৫
১০।	ঐ দ্বাদশ মন্দির ...	...	...	৫
১১।	ঐ চতুর্ভুজা মূর্ত্তি ...	...	...	৫
১২।	বৌদ্ধচৈত্য	...	...	৪৩
১৩।	প্রাচীন মুদ্রা	...	...	৫৪
১৪।	কেলিকদম্ব	...	...	
১৫।	স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি	...	...	পঃ ৩/০
১৬।	বাভ্রবীকায়া ও অন্য দুইটী মূর্ত্তি	...	...	১৬৪
১৭।	পরলোকে (ক্রোড়পত্র) ...	...	...	
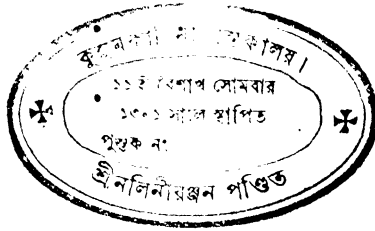
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বগুড়ার পুরাতত্ত্ব*

(সংক্ষিপ্ত কাহিনী)

উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বাদির আলোচনার জন্য রঙ্গপুরে যে সাহিত্য-সম্মিলনী হইতেছে তদুপলক্ষে বগুড়ার প্রাচীনতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণিত হইলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া বোধ হয়। বগুড়ার ন্যায় একটি আধুনিক ক্ষুদ্র জেলায় প্রাচীনকালের বিরাট কীর্ত্তিসমূহ এখনও জীর্ণ ভগ্ন ইষ্টকস্তূপে, কৌতূহলপূর্ণ জনপ্রবাদে ও কয়েকজন বৈদেশিকের রচিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধে জীবিত রহিয়াছে। আমরা অতি অল্পকাল হইল ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, সুতরাং কেবল নিজেদের চেষ্টায় ধ্বংসাবশেষ হইতে নষ্ট গৌরব উদ্ধার করিবার অধ্যবসায় এখনও দেশে সেরূপ ভাবে দেখা দেয় নাই।

ইতিহাসের গৌরব পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের হীরকোজ্জ্বল কাহিনী, ভারতের ঐতিহাসিক মাত্রেই অল্পাধিক বর্ণনা করিয়াছেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের স্থান-নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদেরও অবধি নাই। প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির সূত্র ধরিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, হয়ত এমন দিন আসিতে পারে, যখন বঙ্গবিশ্রুত মহাস্থান পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া পরিচিত ও প্রমাণিত হইলেও হইতে পারিবে। চৈনিক পরিব্রাজকের ষষ্ঠ শতাব্দীর লিখিত কাহিনী বর্ত্তমান না থাকিলে, কে আজ বিশ্বাস করিত যে, এখন যে করতোয়া গোষ্পদতুল্যা, তাহারই একতট কোনদিন ময়মনসিংহ জেলার সেরপুর বলিয়া পরিচিত ছিল। সেরপুর হইতে বগুড়া আসিতে হইলে, করতোয়া উত্তীর্ণ হইবার জন্য সেকালে দশ কাহন কড়ি লাগিত; জনপ্রবাদ তাই সেরপুরকে আজিও "দশকাহনিয়া সেরপুর" বলিয়া থাকে।

অনুসন্ধিৎসুর নয়ন লইয়া মহাস্থান দর্শন করিতে গেলে, তাহার সুবিশাল মৃৎপ্রাচীর, প্রাসাদ প্রভৃতির বহু বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ, দেবায়তনের কারুকার্য্যসমন্বিত প্রস্তরাবলী, সুগভীর পাষাণকুণ্ড, সুরবিন্যস্ত জাঙ্গালসমূহ দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। মনে হয় হিন্দু হউন, বৌদ্ধ হউন বা মুসলমান হউন,—যাঁহারা এই সমুদয় গড়িয়াছিলেন, তাঁহারা অর্থে, বলে ও কৌশলে বিশেষ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মনে হয় মহাস্থানের ন্যায় সুরক্ষিত দুর্গ বোধ হয়

* রঙ্গপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

বাঙ্গালায় সে কালে আর ছিল না। একদিকে ভীমনাদিনী করতোয়া এবং তাহার বারিরাশি চুম্বন করিয়া বহু উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের সুদৃঢ় কোণসমূহ, প্রতিকোণের ক্রমোচ্চশির,—যেন সুদূর বিস্তৃত করতোয়াবক্ষে শত্রুর রণতরিসমূহ ধ্বংস করিবার জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। অদূরে নাগর এবং করতোয়াকে সংযুক্ত করিয়া চাঁদমুয়া হইতে যোগীরভবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত কালীদহ, দুর্গের বহিঃপরিখারূপে বর্ত্তমান থাকিয়া সীমা রক্ষা করিত। আজিও যে স্তূপ রাজা পরশুরামের সভাবাটী বলিয়া পরিচিত রহিয়াছে, তাহার স্থানে স্থানে এখনও ইষ্টক-বিনির্ম্মিত সুদৃঢ় পয়ঃপ্রণালীর চিহ্ন বর্ত্তমান আছে; সেই স্তূপের একপার্শ্ব ইষ্টকবিনির্ম্মিত। দেখিলেই মনে হয়, কালীদহ হইতে দুর্গাভ্যন্তরে জল আনাইবার জন্যই বোধ হয় ঐ সকল পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালীদহকে দুর্গের বহিঃপরিখা বলিয়া অনুমান করিলে, দুর্গের যে অন্তঃপরিখাও ছিল, তাহা বলা যাইতে পারে এবং অনুসন্ধান করিলে হয়ত ইহার প্রমাণও মিলিবে।

মহাস্থানের নিকটবর্ত্তী গোকুল, মথুরা, বারাণসীখাল প্রভৃতি গ্রামসমূহ এখনও হিন্দুনামে পরিচিত থাকিয়া মহাস্থানের কীর্ত্তিকাহিনীর সহিত হিন্দুগৌরবের সম্বন্ধ সূচিত করিতেছে, কিন্তু এই প্রমাণই যথেষ্ট নহে। কবে, কিরূপে কোন ভূপাল কর্ত্তৃক, কি অবস্থায় মহাস্থানের ন্যায় বিরাট নগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান করা নিতান্ত প্রয়োজন। যে পরশুরামের সহিত হিন্দুর পুণ্যতীর্থের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে, যে শীলাদেবীর নামে আজিও হিন্দুললনার চিত্ত হর্ষে ও গৌরবে ভরিয়া উঠে, তাঁহাদিগের ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইলে, তাহা বাঙ্গালার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয়। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে মহাস্থানের বিস্তৃত কাহিনী লিখিবার স্থান নাই এবং তাহার আবশ্যকতাও নাই। উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্ব আলোচনা ও আবিষ্কার করিবার যদি কোনও ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে যাহাতে মহাস্থানের প্রতি সাহিত্যিকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সেই জন্যই এই নিবন্ধ লিখিত হইল। গবর্ণমেণ্ট প্রতি জেলার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া "গেজেটিয়ার" নামে প্রচার করিতেছেন। কি প্রণালীতে "গেজেটিয়ার" লিখিতে হইবে, গবর্ণমেণ্ট রচয়িতাদিগকে তাহার পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া থাকেন। বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে, সরকারী "গেজেটিয়ারের" ন্যায় কোনও প্রথা অবলম্বন করা আমাদেরও উচিত।

মহাস্থানগড়ের উপরে উঠিলে প্রথমে "সাহসুলতানের দরগা" দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তাহারই পার্শ্বে আর একটী অল্পায়তন মস্‌জিদ আছে। উহার প্রবেশদ্বারের শিরে একখানি শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত বেভারিজ সাহেব মহাস্থান দর্শনকালে এই প্রস্তরফলক দেখিয়াছিলেন না বলিয়া অনুমান হয়। কারণ, দেখিয়া থাকিলে, তিনি ইহার উল্লেখ করিতেন। আমরা সেই শিলালিপি হইতে এইটুকু সংগ্রহ করিয়াছি যে বাদসাহ ফররুখশিয়রের আমলে (১১৩০) উক্ত মস্‌জিদ নির্ম্মিত

বগুড়ার পুরাতত্ত্ব।

১ নং চিত্র।

শ্রীবিষ্ণু গয়াসুর দমন করিতেছেন।

১৩১৫, ৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যার, ৩য় পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

বগুড়ার পুরাতত্ত্ব।

২ নং চিত্র।

"খোদার পাথর" নামক স্তূপ হইতে উৎকীর্ণ প্রস্তর গাত্রে খোদিত—সশিষ্য বুদ্ধ মূর্ত্তি।

১৩১৫, ৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যার—৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হইয়াছিল। মহিশূরবীর হায়দরআলীর সমাধির উপর যেমন কবিতায় বর্ষ, মাস ও তারিখ লেখা আছে, এ স্থানেও ঠিক তাহাই দেখা যায়।

সাহ সুলতানের সমাধি ৬ ফুট বেধের উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীরগাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুলুঙ্গি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। অনেক স্থানে প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দিরের প্রাচীরগাত্রে এই প্রকার কুলুঙ্গি দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত প্রাচীরের উপরিভাগ ভাল করিয়া দেখিলে মনে হয় যে এক-দিন উহার মাথায় খিলান করা ছাদ ছিল। জনপ্রবাদ, রাজা পরশুরামের কালীবাড়ীকে ঐস্থানে স্থাপন করিতে চাহে। এই প্রাচীরবেষ্টিত সমাধি স্থানের প্রবেশদ্বার প্রস্তর নির্ম্মিত। দ্বারের একখানি চৌকাঠে সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—"শ্রীনরসিংহ দাসস্য" শ্রীযুক্ত কানিংহাম সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে অক্ষরগুলি প্রাচীন দেবনাগরী, তিনি আরও বলিয়াছেন যে, শ্রীনরসিংহদাসস্য, অর্থে "শ্রীনরসিংহের দাস কর্ত্তৃক" বুঝিতে হইবে। অবস্থা বিবেচনায় ইহাই অনুমান হয় যে, উহা স্থপতির নামই সূচিত করিতেছে, তাহার প্রভুর নাম নহে। বগুড়ার ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত বগুড়া জেলার "গেজেটিয়ার" প্রকাশ হইলেই এই সকল বিষয়ের আলোচনা সাধারণের দৃষ্টি-পথে পতিত হইবে।

শ্রীবিষ্ণু আপনার চরণ গয়াসুরের মস্তকে স্থাপিত করিয়া অসুর দমন করিতেছেন, এই রূপ ভাবে খোদিত একটী ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি আমরা এই দরগার নিকট পাইয়াছিলাম। অসুরের অবয়ব কোন বৌদ্ধ মূর্ত্তির অনুরূপ বলিয়া মনে হয়; সুতরাং ইহা হইতে বোধ হয় এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যখন এদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্ত হইতেছিল, উহা সেই কালের বৌদ্ধ বিদ্বেষের নিদর্শন। [১ নং চিত্র দেখ।]

সাহ সুলতানের আস্তানার উত্তর দিকে একটী প্রকাণ্ড মৃত্তিকা ও ইষ্টকের স্তূপ আছে। উহার অংশ বিশেষ খনন করাইয়া আমরা একটী প্রস্তর নির্ম্মিত কক্ষ বাহির করিয়াছি। কক্ষের মেজে পাথরের। চতুর্দ্দিকের প্রস্তরপ্রাচীর এখনও অনেকাংশে বর্ত্তমান আছে। প্রাচীরের ঊর্দ্ধভাগ ইষ্টক নির্ম্মিত। এই কক্ষ মধ্যে ও ইহার চতুঃপার্শ্বে নানাবিধ প্রস্তর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। সে গুলির মধ্যে ধ্যান নিমগ্ন সশিষ্য বুদ্ধ ও ক্ষীর-মোদক হস্তে গোপালের মূর্ত্তি উল্লেখ যোগ্য। এই স্থানে একটি মৃৎভাণ্ড ও মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছিল। তারকেশ্বরের মহাদেবের শিরে বারি বর্ষণের জন্য ভক্তগণ যেরূপ ভাণ্ডের ব্যবহার করিয়া থাকেন, এ ভাণ্ডটিও তদ্রূপ। [২ ও ৩ নং চিত্র দেখ।]

দারাব সাহের সমাধি দ্বার হইতে যে পথ বাহির হইয়াছে, তাহারই সন্নিকটের একটি স্তূপ "খোদার পাথর" নামে পরিচিত। একখণ্ড দীর্ঘ প্রস্তরের অংশ বিশেষ এতদিন সেই স্তূপের একাংশ দেখা যাইত। উহা দেখিয়া কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছিলেন— "The massive door-sill of a *Hindu temple,* which is now worshipped

under the name of *Khudaka pathar or* God's stone." আমরা সে স্থান খনন করাইয়া প্রস্তর খানি বাহির করিয়াছি। উহার মাপ নিয়ে দেওয়া গেল:—৯´-৪´´×২´-৪´´×২´–৫´´। কানিংহাম সাহেব এই প্রস্তরের যে মাপ দিয়াছিলেন তাহা ভ্রমাত্মক। এখন দেখা যাইতেছে যে খোদার পাথর কোন দেবমন্দিরের দ্বারের চৌকাট। উহার সম্মুখ ভাগে ঠিক মধ্যস্থলে একটী ফুল খোদিত রহিয়াছে। [৪ নং চিত্র দেখ।]

অপর দিকে সাধারণ চৌকাঠের ন্যায় উপরের খানিকটা অংশ কাটা। তাহারই দুই প্রান্তে দুইটী বৃহৎ ও সমব্যবধানে আর দুইটী ক্ষুদ্র রন্ধ্র আছে। বৃহৎ ছিদ্রটী অন্ততঃ সাত আট ইঞ্চি গভীর হইবে। সেই চারিটী ছিদ্রের উপর মন্দিরদ্বারের নিম্নপ্রান্ত বসানো ছিল বলিয়া অনুমান হয়। [৫ নং চিত্র দেখ]

ঐ স্থানে আরও অনেক প্রকার খোদিত প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে সোপান শ্রেণীর ন্যায় খোদিত একখানি প্রস্তরের চিত্র দেওয়া গেল। [৬ নং চিত্র দেখ]

"খোদার পাথরের" চতুর্দ্দিকে পাঁচ ফুট পরিমাণ খনন করিলে পর আমরা প্রস্তরের মেজে পাইয়াছিলাম। মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে মন্দিরটী অন্ততঃ ২৪´×১৫´ ছিল। মেজের উপরও ২ ফুট পরিমাণ প্রস্তর বসানো ছিল।

"খোদার পাথরের" উত্তরে পরশুরামের বাড়ী ছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। এই স্থান খুঁড়িয়া দুইটী মৃন্ময় ছোট ছোট রঙিন ভাঁটা, একখানি ক্ষুদ্র দা ও কতকগুলি কড়ি পাওয়া গিয়াছে। আরও খনন করিলে হয়ত অনেক নূতন জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে। ভাঁটার লোহিত রঙ আজিও বর্ত্তমান আছে।

এই স্থানে দুইটী অল্লায়তন কক্ষ বাহির হইয়াছে। মৃত্তিকার দ্বারা ইষ্টক গাঁথিয়া কক্ষ প্রাচীর নির্ম্মিত। কক্ষের মেজেও ইষ্টকের। কক্ষমধ্যে প্রাচীরগাত্রে বালুকার আস্তর ও তাহার উপর চুণের কাজ করা। এতকাল পরেও কক্ষপ্রাচীরের উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ বর্ত্তমান আছে।

মহাস্থান সম্বন্ধে আরও অনেক কথা লিখিবার থাকিল। আর একটী স্থানের কথা লিখিয়াই মহাস্থানের বিবরণ আপাততঃ শেষ করিব।

গড়ের উত্তর দিকে করতোয়ার তীরে "গোবিন্দের দ্বীপ" নামে একটী স্থান আছে। উহার উত্তরাংশের একটী প্রস্তরপ্রাচীরকে লোকে "পাথরঘাটা" বলিয়া জানে। ঐস্থানে মাটির বাঁধ দিয়া করতোয়ার জল সরাইয়া ফেলায়, একটী প্রস্তরপ্রাচীরের একাংশ বাহির হইয়াছে। প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ১৫০ ফুট। প্রাচীরটি দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দ্বারা নির্ম্মিত। প্রস্তরখণ্ড গুলি পরীক্ষা করিলে এইরূপ অনুমান হয় যে, কোন বৃহৎ মন্দিরের দ্বারদেশের কারুকার্য শোভিত প্রস্তরখণ্ড একদিন কোন হিন্দুবিদ্বেষীর হস্তে পতিত হইয়া, প্রাচীর-নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রস্তরের কারুকার্য্য ও খোদিত মূর্ত্তি যাহাতে কোনও দিন আর নয়নপথে পতিত না হয়, প্রাচীর নির্ম্মাতা সেইজন্য প্রস্তরখণ্ডগুলি বিপর্য্যস্তভাবে

বগুড়ার পুরাতত্ত্ব।

৩ নং চিত্র।

ক্ষীরমোদক হস্তে গোপালের মূর্ত্তি।

১৩১৫, ৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যার, ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বগুড়ার পুরাতত্ত্ব।

৪ নং চিত্র।

খোদার পাথর (একাংশ)

১৩১৫, ৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যার, ৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বগুড়ার পুরাতত্ত্ব।

৫ নং চিত্র।

খোদার পাথর (অপরাংশ)

১৩১৫, ৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যার, ৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
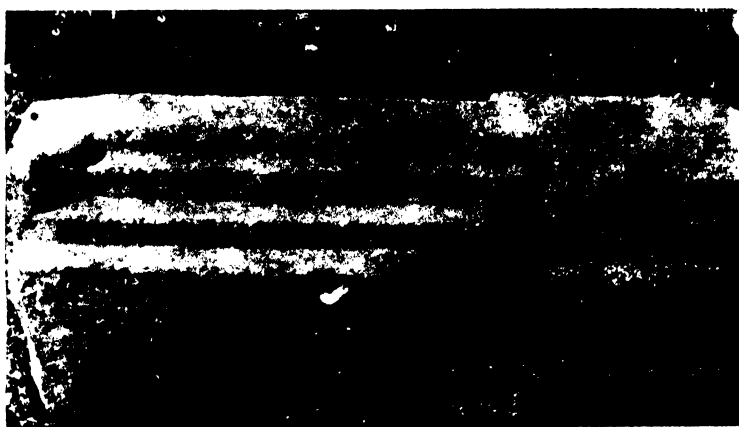
বগুড়ার পুরাতত্ত্ব।

৬ নং চিত্র।

সোপান শ্রেণীর ন্যায় খোদিত পাথর।

১৩১৫, ৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যার, ৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
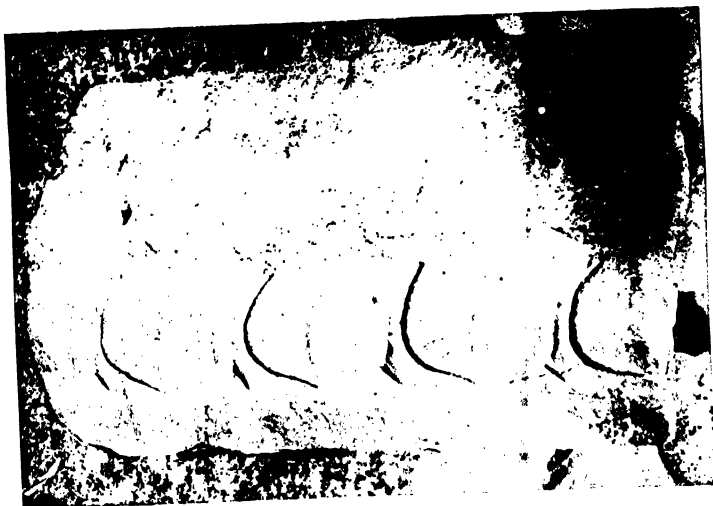
বগুড়ার পুরাতত্ত্ব।

৭ নং চিত্র।

শীলাদেবীর ঘাটের নিকটস্থ প্রাচীরের প্রস্তর।

১৩১৫, ৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যার, ৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বগুড়ার পুরাতত্ত্ব।

৮ নং চিত্র।

শীলাদেবীর ঘাটের নিকটস্থ প্রাচীরের প্রস্তর।

১৩১৫, ৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যার, ৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বগুড়ার পুরাতত্ত্ব

৯ নং চিত্র।

বেলআমলার প্রাচীন মন্দিরত্রয়।

১৩১৫, ৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যার—৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বগুড়ার পুরাতত্ত্ব

১০ নং চিত্র।

বলআমলার দ্বাদশটী প্রাচীন মন্দির।

৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যার ৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বগুড়ার পুরাতত্ত্ব।

১১ নং চিত্র।

খেলআমলায় প্রাপ্ত চতুর্ভুজামূর্ত্তি।

১৩১৫, ৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যার—৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। প্রাচীরটী যেস্থানে বর্ত্তমান আছে তাহা দেখিলেই মনে হয়, করতোয়ার বেগ হইতে দুর্গ রক্ষা করিবার জন্যই উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাচীরের নিকটে মৃত্তিকার নিম্নে স্নানের ঘাটের সোপনাবলীর অংশবিশেষ এখন বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এই ঘাটকেই লোকে "শীলাদেবীর ঘাট" বলিয়া থাকে। উক্ত প্রাচীরের দুই এক খণ্ড প্রস্তরের চিত্র প্রদত্ত হইল। এখনও মহাস্থান গড় সম্পূর্ণরূপে অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। অর্থ এবং অধ্যবসায় সহকারে মহাস্থানকহিনী উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিলে, বাঙ্গালার ইতিহাসের কায়া অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে বলিয়া বিশ্বাস হয়।

[৭ ও ৮ নং চিত্র দেখ]

বেলআমলা।

বগুড়ার অধীন জয়পুরহাট রেলষ্টেসনের সন্নিকটে বেলআমলা নামে একটী গ্রাম আছে। তথায় যে সকল মন্দির আছে সে সমুদয় বাঙ্গালায় ইংরাজের আগমনের প্রাক্কালে তথাকার ধনী বণিক্‌দিগেরদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। বেলআমলার একস্থানে বারটী ও একস্থানে তিনটী মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষলতাগুল্মাদি পরিবেষ্টিত হইয়া সেই জীর্ণ মন্দিরগুলি এখন ধীরে ধীরে খসিয়া পড়িতেছে। মন্দিরগুলির চিত্র প্রদত্ত হইল।

[৯ ও ১০ নং চিত্র দেখ]

শ্লেট প্রস্তরে খোদিত একটী চতুর্ভুজামূর্ত্তি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই স্থানের কোন একটী দীর্ঘিকা খনন করাইবার সময় পাওয়া যায়। যে প্রস্তরখণ্ডে মূর্ত্তিটী খোদিত তাহা দেখিলে অনুমান হয়, উহা কোন একটী দেব-মন্দিরের গাত্রাভরণ ছিল। চতুর্ভুজার চিত্র অপর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। এই প্রস্তর মূর্ত্তির পাদদেশে পুরাতন অক্ষরে কয়েকটী অক্ষর লিখিত আছে।*. [১১ নং চিত্র দেখ]

বদলগাছী।

বগুড়ায় "বোদালস্তম্ভ" একটী বিরাট ঐতিহাসিক ব্যাপার। ইহা প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। এই স্তম্ভটী একখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত ছিল। এখন ইহার নানাস্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্তম্ভ গাত্রে যে সংস্কৃত শিলালিপি ছিল, তাহা হইতে পাল বংশের অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত সি, ডব্‌লিউ উইলকিন্স সাহেব সেই

---

* এই চতুর্ভুজামূর্ত্তির পাদদেশে অঙ্কিত লিপির দুইটী ছাপ আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। অস্পষ্ট ছাপ দেখিয়া ভাল করিয়া পাঠোদ্ধার করিতে না পারিয়া আমি তাহার একটী ছাপ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম। তিনিও দুইটী অক্ষরের পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। "রাজ্ঞী শ্রী" পর্য্যন্ত স্পষ্ট পাঠ করা যায়। এই খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার সুসম্পন্ন হইলে, চতুর্ভুজা মূর্ত্তির প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হইতে পারিবে। আমার ন্যায় শ্রীযুক্ত বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ও উহাকে বৌদ্ধকীর্ত্তি বলিয়াই আপাততঃ অনুমান করিতেছেন। (শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।)

শ্লোকাবলীর ইংরাজী অনুবাদ "এসিয়াটিক রিসার্চেস" পত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহার পর এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রে, ঐতিহাসিক চিত্র নামক ত্রৈমাসিক পত্রে, রঙ্গপুর-শাখা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ও অন্যান্য অনেক পত্রে তাহার কিছু কিছু আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

পালিপ্রকাশ।*

সাধারণ কল্প।

১। পালিতে স্বরের মধ্যে ঋ, ৯, ঐ, ঔ এই চারিটি বর্ণের প্রয়োগ নাই। অতএব পালিতে স্বরবর্ণ আটটি। যথা—অ, আ, ই, ঈ; উ, ঊ, এ, ও, ।+

২। সংস্কৃতে যে সকল শব্দে ঋকার প্রযুক্ত হয়, পালিতে তাহাদের ঐ ঋকার স্থানে সাধারণতঃ স্থলবিশেষে অকার, ইকার বা উকার দেখা যায়। যথা—

ঋ = অ		ঋ = অ‡	
ঋক্ষঃ	অচ্ছো	কৃতং	কতং
কৃষ্ণঃ	কণ্হো	গৃহং	গহং§
ঘৃতং	ঘতং	নৃত্যং	নচ্চং
ভৃত্যঃ	ভচ্চো	বৃষলঃ	বসলো
মৃত্যুঃ	মচ্চু	গৃহ্ণাতি	গণ্হাতি
স্পৃষ্টঃ	সট্ঠো	মৃষ্টঃ	মট্ঠো
বিজৃম্ভতে	বিজম্ভতে	বৃদ্ধিঃ	বড্ঢি, (বুড্ঢি)

* উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ জেলায় কথিত ভাষা, বিশেষতঃ রঙ্গপুরী বা রাজবংশী ভাষার সহিত পালি ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এজন্য উহার ব্যাকরণ বাঙ্গলাভাষায় প্রণীত হইলে ঐ সকল প্রাদেশিক ভাষার শব্দতত্ত্বাদি আলোচনার সুযোগ হইবে। এজন্য "পালিপ্রকাশ" নামক পালিভাষার ব্যাকরণের নমুনা পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহা দেখিয়া মতামত প্রকাশ করিলে রঙ্গপুর শাখা পরিষৎ ঐ গ্রন্থ প্রণয়নে অগ্রসর হইবেন। মল্লিখিত "রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা" প্রবন্ধ মূল সভা হইতে প্রকাশিত সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১২শ ভাগ ১৪ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য। (পরিষৎ-সম্পাদক।)

+ প্রাকৃতেও এই নিয়ম। প্রাকৃত প্রকাশভামহবৃত্তি, ১।৩৩।

‡ "ঋতোঽৎ," প্রাকৃত প্রকাশ, ১।২৭।

§ 'গৃহ' স্থানে পালিতে 'ঘরং'ও হয়।

ঋ=ই		ঋ=ই *	
তৃণং	তিণং	কৃত্যং	কিচ্চং
মৃগঃ	মিগো (মগো),	দৃষ্টং	দিট্ঠং
ঋণং	ইণং	কৃতকং	কিতকং
ঋষিঃ	ইসি	তৃপ্তিঃ	তিত্তি
ভৃঙ্গারঃ	ভিঙ্কারো	যদৃচ্ছা	যদিচ্ছা
শৃঙ্গং	সিঙ্গং		

ঋ=উ		ঋ=উ †	
ঋতু	উতু	ঋষভঃ	উসভো
ঋজু	উজু	পৃষ্টঃ	পুট্ঠো
বৃদ্ধঃ	বুড্ঢো	বৃষ্টি	বুট্ঠি
বৃত্তান্তঃ	বুত্তন্তো	কৃত্রিমং	কুত্তিমং‡

৩। ঌকারের প্রয়োগ সংস্কৃতেও অতি বিরল। ক্লৃপ্ ধাতুর প্রয়োগে ঌ দেখা যায়। কল্পতে প্রভৃতি পদ এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। কল্পতে প্রভৃতি লকারযুক্ত পদের পালিতে পরিবর্ত্তনের নিয়ম পরে বলা যাইবে।

৪। সংস্কৃতে যে সকল শব্দে ঐকার আছে, পালিতে তাহাদের সেই ঐকার স্থানে প্রায়ই একার, § কখন কখন ইকার ও কচিৎ ঈকার হয়। যথা—

ঐ=এ		ঐ=এ	
ঐতিহ্যং	এতিহ্যং	ঐকাগারিকঃ	একাগারিকো
ঐরাবণঃ	এরাবণো	বৈয়াকরণঃ	বেয়্যাকরণো
বৈমানিকঃ	বেমানিকো	নৈগমঃ	নেগমো
নৈয়ায়িকঃ	নেয়্যায়িকো	তৈলং	তেলং
কৈবর্ত্তঃ	কেবট্টো		

---

* প্রা, প্র। ১।২৮ † প্রা, প্র। ১।২৯

‡ [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়, যথা।—

ঋ—ইরি ঋষিক্—ইরিষিশ

ঋ—এ বৃহৎফলঃ—বেহপ্ফলো

ঋ—রি ঋতে—রিতে

প্রাকৃতে অসংযুক্ত ঋস্থানে সাধারণতঃ 'রি' বিহিত হইয়াছে; যথা—ঋণং—রিণং, ইত্যাদি, প্রা প্র, ১।৩০

ঋ—র বৃহস্পতি—ব্রহস্পতি

'ঋক্' স্থানে পালিতে 'ইরু' হয়।

§ প্রা, প্র, ১।৩৫

ঐ = এ

চৈত্রঃ	চিত্তো
পৈত্রিকং	পিত্তিকং

ঐ = ই*

সৈন্ধবঃ	সিন্ধবো
ঐশ্বর্য্যং	ইসসরিযং, (ইস্সেরং)+

এ = ঈ

গৈবেয়ং	গীবেয্যং

৫। সংস্কৃত শব্দের ঔকার স্থানে পালিতে প্রায়ই ওকার এবং কখন কখন উকার হয়। যথা—

ঔ = ও

ঔপম্যং	ওপম্মং
ঔদরিকঃ	ওদরিকো
মৌদ্গল্যায়নঃ	মোগ্গল্লায়নো, (মোগ্গল্লানো)
দৌবারিকঃ	দোবারিকো

ঔ = ও‡

ঔরভ্রিকঃ	ওরভ্ভিকো
ঔদুম্বরং	ওদুম্বরং
সৌগন্ধিকং	সোগন্ধিকং
পৌরঃ	পোরো

ঔ = উ

ঔৎসুক্যং	উস্সুক্কং
মৌঞ্জায়নঃ	মুঞ্জায়নো, (মুঞ্জানো)
সৌত্রিকং	সুত্তিকং
ঔদ্দেশিকঃ	উদ্দেসিকো

ঔ = উ

ক্ষৌদ্রং	খুদ্দং
মৌক্তিকং	মুত্তিকং
ঔদ্ধত্যং	উদ্ধচ্চং
ঔর্দ্ধদৈহিকং	উদ্ধদেহিকং§

৬। পালিতে শকার ও ষকারের মোটে প্রয়োগ নাই; তাহাদের স্থানে সকার হয়; যথা—

শিষ্যঃ	সিস্সো
শ্রমণঃ	সমণো ‖

৭। পালিতে পদের অন্তে হসন্ত বর্ণের প্রয়োগ হয় না। সংস্কৃতে যে সকল শব্দের শেষে হসন্ত বর্ণ আছে, পালিতে তাহাদিগকে ঐ হসন্ত বর্ণ লোপ করিয়া পাঠ করা হয়।** যথা—

---

* তুলনীয়—প্রা, প্র। ১।৩৬—৩৮

+ তুলনীয়—আশ্চর্য্যং—অচ্ছরিয়ং (জাতক ২ খণ্ড, ৩০৩ পৃঃ) — অচ্ছরিয়ং — অচ্ছেরং ; এইরূপ ঐশ্বর্য্যং — ইস্সরিয়ং—ইস্সরিয়ং—ইস্সেরং ; এইরূপ মাৎসর্য্যং — মচ্ছেরং।

‡ প্রা, প্র। ১।৪১

§ নিম্নলিখিত স্থানে ঊকার আকার হইয়াছে—গৌরবং—গারবং ; প্রাকৃতেও এইরূপ হয়। প্রা, প্র। ১।৪৩

‖ প্রাকৃতেও এইরূপ, প্রা, প্র। ২।৪৩। মাগধী প্রাকৃতে স ও ষ স্থানে শকার হয় (প্রা, প্র। ১১।৩।) মৃচ্ছকটিকে শকারের প্রাকৃত মাগধী।

** প্রা, প্র। ৪।৬।

গুণবান্	গুণবা	ধনবান্	ধনবা
দ্যুতিমান্	দ্যুতিমা	স্মৃতিমান্	সতিমা
হরিৎ	হরি	বিদ্যুৎ	বিজ্জু
কশ্চিৎ	কোচি	সমন্তাৎ	সমন্তা
পশ্চাৎ	পচ্ছা	ঈষৎ	ঈসং
যাবৎ	যাব	তাবৎ	তাব

৮। সংস্কৃতে পদের অন্তে হসন্ত ম (ম্) বা অনুস্বার (ং) উভয়ই থাকিতে পারে, কিন্তু পালিতে সর্ব্বদা অনুস্বারই হয়। যথা—সংস্কৃত 'চিত্তম্', পালিতে সর্ব্বদা 'চিত্তং'ই হইবে ; 'চিত্তম্' কখন হইবে না। সন্ধির নিয়ম স্বতন্ত্র।

৯। পালিতে বিসর্গের প্রয়োগ নাই। সংস্কৃতের অকারান্ত পদের অন্তস্থিত বিসর্গের পালিতে লোপ হয় এবং অকার স্থানে ওকার হয় ; অন্যান্য স্বরান্ত পদের অন্তস্থিত বিসর্গের কেবলমাত্র লোপ হয়। যথা—

দেবঃ	দেবো	ধর্ম্মঃ	ধম্মো
মনঃ	মনো	সঃ	সো
কঃ	কো	এষঃ	এসো
ভিক্ষুঃ	ভিক্খু	অগ্নিঃ	অগ্‌গি
রাত্রিঃ	রাত্তি	ধেনুঃ	ধেনু

১০। পদের মধ্যস্থিত বিসর্গ সম্বন্ধে নিয়ম এই—

(ক) বিসর্গের পর শ, ষ বা স থাকিলে বিসর্গের স্থানে পালিতে স হয়। যথা—

দুঃসহঃ	দুস্‌সহো	নিঃসরতি	নিস্‌সরতি
নিঃশোকঃ	নিস্‌সোকো	দুঃশীলঃ	দুস্‌সীলো

(খ) বিসর্গের পর প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে, বিসর্গের স্থানে ঐ বর্ণের প্রথম বর্ণ হয়। যথা—

দুঃখং	দুক্‌খং	পুনঃপুনঃ (ব্)	পুনপ্পুন (§ ১।৭)

(গ) সংযুক্ত বর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত বিসর্গের লোপ হয়। যথা—

বয়ঃস্থঃ	বয়ট্‌ঠো	দুঃস্থঃ	দুট্‌ঠো

১১। পালিতে সংযুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর প্রায়ই* হ্রস্ব হয়। যথা—

* কিন্তু দাত্রং—দাত্তং   আর্জ্জবং—আজ্জবং   মাধ্যং—মা্‌ধযং

ইত্যাদি স্থানে হয় নাই। কখন কখন ছন্দোরক্ষার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়। যথা—

"যদি ব (বা) সাবকে," "ভোবাদি-(দী) নামকো হোতি," " যথা ভাধি (বী) তপেন সো," চিট্‌টং ব (বা) হুতং ব (বা) লোকে," মহারূপসিদ্ধি, পৃষ্ঠা ১৬, (সিংহল)

তার্কিকঃ	তক্কিকো	মাৎসিকঃ	মচ্ছিকো
মার্দ্দবং	মদ্দবং	উত্তীর্ণঃ	উত্তিণ্ণো
বাৎস্যায়নো	বচ্ছায়নো	পরাক্রমঃ	পরক্কমো
আর্ত্তঃ	অট্টো		

১২। পালিতে রেফের (´) প্রয়োগ নাই। সংস্কৃত শব্দের কোন অবয়বে রেফ থাকিলে, পালিতে—

(ক) ঐ রেফের লোপ হয়।

(খ) যে বর্ণে রেফ থাকে, প্রায়ই তাহার দ্বিত্ব হয়।*

দ্বিত্ব হইলে সন্ধির নিয়মানুসারে + (সন্ধির প্রাপ্তি থাকিলে) সন্ধি হয় ; ও (গ) অন্তস্থ ব স্থানে বর্গীয় ব হয় ‡।

সর্ব্বঃ	সব্বো,	অর্থঃ	অত্থো §
কর্ম	কম্মং,	তীর্থং	তিত্থং
নির্গতঃ	নিগ্গতো	নির্লজ্জঃ	নিল্লজ্জো
নির্বাণং	নিব্বাণং,	নির্ঘোষঃ	নিগ্ঘোসো
অর্কঃ	অক্কো,	নির্ঝরঃ	নিজ্ঝরো
শর্করা	সক্করা,	নির্ণাদঃ	নিন্নাদো
বিচর্চ্চিকা	বিচচ্চিকা,	জীর্ণঃ	জিণ্ণো
বর্ষণং	বস্সণং,	নির্য্যাতনং	নিয্যাতনং ১
গর্জ্জঃ	গব্ভো,	দীর্ঘিকা	দিগ্ঘিকা **

১৩। রেফ হকারে থাকিলে ঐ রেফ স্থানে র, ও ক্বচিৎ রি হয়। যথা—

তর্হি	তরহি,	এতর্হি	এতরহি
গর্হতি	গরহতি,	অন্তর্হিতঃ	অন্তরহিতো
মহার্হঃ	মহারহো,	গর্হণং	গরহণং
বর্হঃ	বরিহঃ,	বর্হী	বরিহী

---

* সংস্কৃত শব্দ দ্বিত্ববিশিষ্ট থাকিলে আর দ্বিত্ব হইবে না।

+ বর্গের চতুর্থ বর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত চতুর্থ বর্ণ স্থানে ঐ বর্গের তৃতীয় বর্ণ, এবং দ্বিতীয় বর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত দ্বিতীয় বর্ণ স্থানে ঐ বর্গের প্রথম বর্ণ হয়।

‡ প্রা, প্র। ৩।২।

§ 'অট্টো' ও 'অট্‌ঠ' পদও হয়।

(১) § ১। ১৯ টীকা দ্রষ্টব্য।

** নিম্নলিখিত স্থলে এ নিয়মের ব্যতিচার দেখা যায়, যথা—পরামর্শঃ—পরামসো; আর্ষং—আরিসং; ঊর্মিঃ—উমি ; অর্শঃ—অরিসো ; আর্দ্রকঃ—আসতো ; ব্যাবর্ত্তিকঃ—বেব্যাবটিকো ইত্যাদি।

'পর্দ্দতঃ' স্থানে পালিতে 'পত্রতো' হয়, (জাতক, ২ খণ্ড, ১০৯ পৃ।)

১৪। নির্ উপসর্গের রকারের সহিত হকারের যোগ থাকিলে ঐ রকারের লোপ হয়, ও নি-স্থানে নী হয়। যথা—

নির্হরণং, নীহরণং নির্হারঃ নীহারো

নির্হৃতঃ নীহতো, নির্হারকঃ নীহারকো

সন্ধিকল্প।

১। স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ পরে থাকিলে (ক) কখন কখন পূর্ব্বস্বরের ও (খ) কখন পরস্বরের লোপ হয়। * যথা—

(ক)

নো হি + এতং = নোহেতং

মহা + ইচ্ছো = মহিচ্ছো

মে + অত্থি = মত্থি

সাধু + আবুসো = সাধাবুসো

মহা + ওঘো = মহোঘো

যস্স + ইন্দ্রিয়াণি = যস্সিন্দ্রিয়াণি

লঙ্কা + ইন্দো = লঙ্কিন্দো

কতমো + অস্স = কতমস্স

তুণ্হী + অস্স = তুণ্হস্স

(খ)

চত্তারো + ইমে = চত্তারোমে

সচে + অজ্জ = সচেজ্জ †

তে + ইমে = তেমে

* * *

৪। পূর্ব্ব স্বর লুপ্ত হইলে পরবর্ত্তী হ্রস্বস্বর কখন কখন দীর্ঘ হয়। যথা—

সদ্ধা + ইধ = সদ্ধীধ

তথা + উপমং = তথূপং

---

* সাধারণতঃ, পরবর্ত্তী স্বর গুরু হইলে পূর্ব্বস্বরের (গুরু হইলেও), এবং পূর্ব্ববর্ত্তীস্বর গুরু হইলে পরবর্ত্তী-স্বরের লোপ হয়।

† পূর্ব্ব ও পরস্থিত উভয় স্বরই লঘূ হইলে অন্যতর স্বরের লোপ হইতে দেখা যায়। যথা—

তুসিতেসু + উপপজ্জথ = তুসিতেসূপপজ্জথ

দসহি + উপগতং = দসহুপগতং

মনসি + ইচ্ছতি = মনসিচ্ছতি

গচ্ছামি + অহং = গচ্ছামহং

কিন্নু + ইমা = কিন্নুমা

উভয় স্বরই গুরু হইলে কখন কখন অন্যতর স্বরের লোপ দেখা যায়। যথা—

নে + আগতা = নাগতা

সীলবন্তো + এল = সীলবন্তেল

এখানে পূর্ব্বস্বর লোপ হইয়াছে।

কথা + এব = কথাব

পাকো + এব = পাকোব

সচে + অজ্জ = সচেজ্জ

এখানে পরস্বর লোপ হইয়াছে।

পরবর্ত্তী স্বর যদি সংযোগের পূর্ব্ব বলিয়া গুরু হয়, তবে অধিকাংশ স্থলেই পূর্ব্বস্বর লোপ হয়। ইহার ব্যভিচার অতি অল্প স্থানে।

অপ্পস্‌সুতো + অয়ং = অপ্পস্সুতায়ং দুক্‌খো + অয়ং = দুক্‌খায়ং

ইতর + ইতরো = ইতরীতরো

*   *   *   *   *   *

নিম্নলিখিত স্থানে এ নিয়ম হয় নাই—

পঞ্চহি + উপালি = পঞ্চহুপালি নথি + অঞ্‌ঞং = নথঞ্‌ঞং

৫। পরস্বর লোপ হইলে পূর্ব্ব স্বর ক্বচিৎ দীর্ঘ হয়। যথা—

সু + ইধ = সূধ সাধু + ইতি = সাধূতি

বি + অতিসায়েতি = বীতিসায়েতি সংঘাটি + অপি = সংঘাটীপি

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই—

ইদানি + অপি = ইদানিপি চক্‌খু + ইন্দ্রিয়ং = চক্‌খুন্দ্রিয়ং

*   *   *   *   *   *

১৫। অনুস্বারের পর যকার থাকিলে উভয়ে মিলিত হইয়া বিকল্পে ঞ্‌ঞ হয়। যথা—

সং + যোগো = সঞ্‌ঞোগো, সংযোগো সং + যুত্তং = সঞ্‌ঞুত্তং, সংযুত্তং

*   *   *   *   *   *

অনুস্বার সর্ব্বনামগত হইলে হয় না। যথা—

একং + যোজনং = একং যোজনং তং + যাতং = তং যাতং

*   *   *   *   *   *

১৭। সাধারণতঃ ইদম্-শব্দের পদ ও এব পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত স্বরান্ত পদের উত্তর র্‌ আগম হয়। যথা—

মা + ইদং = মারিদং বা + এব = বারেব

ন + এব = নরেব ছ + ইমানি = ছরিমানি

*   *   *   *   *   *

১৮। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের পর ম্‌ আগম হয়। যথা—

লঘু + এস্‌সতি = লঘুমেস্‌সতি কসা + ইব = কসামিব

ইধ + আহু = ইধমাহু

*   *   *   *   *   *

১৯। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের পর দ্‌ আগম হয়। যথা—

বহু + এব = বহুদেব মনসা + অঞ্‌ঞা = মনসাদঞ্‌ঞা

*   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *

নামকল্প।

১। বাঙ্গালার ন্যায় পালিতে দ্বিবচনের পৃথক্ বিভক্তি নাই; তাহার স্থানে বহু বচন প্রয়োগ করিতে হয়।

নামের উত্তর প্রযোজ্য বিভক্তিগুলি এই :—

	একবচন	বহুবচন		একবচন	বহুবচন
প্রথমা	সি	যো	পঞ্চমী	স্মা	হি
দ্বিতীয়া	অং	যো	ষষ্ঠী	স	নং
তৃতীয়া	না	হি	সপ্তমী	স্মিং	সু
চতুর্থী	স	নং			

তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহু বচনের বিভক্তি 'হি'-স্থানে বিকল্পে 'ভি' এবং পঞ্চমীর একবচনে 'স্মা' ও সপ্তমীর একবচনে 'স্মিং' স্থানে যথাক্রমে বিকল্পে 'ম্হা' ও 'ম্হি' হয়।

পুংলিঙ্গ শব্দরূপ।

অকারান্ত বুদ্ধ শব্দ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	বুদ্ধো	বুদ্ধা, (বুদ্ধসে)*
দ্বিতীয়া	বুদ্ধং	বুদ্ধে
তৃতীয়া	বুদ্ধেন†	বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি‡
চতুর্থী	বুদ্ধায়, বুদ্ধস্স	বুদ্ধানং
পঞ্চমী	বুদ্ধা, বুদ্ধস্মা, বুদ্ধম্হা	বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি
ষষ্ঠী	বুদ্ধস্স	বুদ্ধানং
সপ্তমী	বুদ্ধে, বুদ্ধস্মিং, বুদ্ধম্হি	বুদ্ধেসু
সম্বোধন	বুদ্ধ, বুদ্ধা	বুদ্ধা

সুগত, সংঘ, ধম্ম§, পুরিস, সুর, নর, আসন**, নিলয় প্রভৃতি সমস্ত অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ এই প্রকার।

---

* বন্ধনী চিহ্নিত পদগুলি সাধারণতঃ প্রচলিত নহে এবং কাত্যায়নকৃত পালিব্যাকরণে, মহারূপসিদ্ধিতে ও বালাবতারেও ইহাদের উল্লেখ নাই।

† কাত্যায়ন 'সো বা' (২।১।৫৪) এইসূত্রে অকারান্ত শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'না' স্থানে বিকল্পে 'সো' হয় লিখিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপে সেস্থানে এই কয়টি পদ প্রদর্শিত হইয়াছে—অথসো, ব্যঞ্জনসো, পদসো, যসসো।

‡ তুলনীয় বৈদিক প্রয়োগ—দেবেভিঃ সুরেভিঃ।

§ কখন কখন ধর্ম্মশব্দের রূপ ক্লীবলিঙ্গের ন্যায় দেখায়। যথা—"ধম্মানি সুত্বা" ধম্মপদ ৫।৪২

** মহারূপসিদ্ধিতে পুংলিঙ্গেই পঠিত হইয়াছে।

ইকারান্ত অগ্‌গি (অগ্নি) শব্দ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	অগ্‌গি, অগ্‌গিনি*	অগ্‌গী,† অগ্‌গয়ো, (অগ্‌গিয়ো)
দ্বিতীয়া	অগ্‌গিং	" "
তৃতীয়া	অগ্‌গিনা	অগ্‌গীহি, অগ্‌গীভি‡
	অগ্‌গিনো, অগ্‌গিস্স	অগ্‌গীনং
পঞ্চমী	অগ্‌গিনা, অগ্‌গিস্মা, অগ্‌গিম্হা	অগ্‌গীহি, অগ্‌গীভি
ষষ্ঠী	অগ্‌গিনো, অগ্‌গিস্স	অগ্‌গীনং
সপ্তমী	অগ্‌গিনি,§ অগ্‌গিস্মিং, অগ্‌গিম্হি	অগ্‌গীসু, অগ্‌গিসু
সম্বোধন	অগ্‌গি	অগ্‌গী, অগ্‌গয়ো, (অগ্‌গিয়ো)

ইসি (ঋষি), মুনি, বোধি, ধনি (ধ্বনি), বীহি (ব্রীহি), মুট্‌ঠি (মুষ্টি), জোতি (জ্যোতিঃ), প্রভৃতি ইকারান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার।

ইসি (ঋষি) শব্দের সম্বোধনের একবচনে 'ইসে' (সং ঋষে) এই একটি অতিরিক্ত পদ হয়।

মুনি শব্দের সপ্তমীর একবচনে 'মুনে' পদও দেখা যায়।

আদি শব্দের সপ্তমীর একবচনে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পদও হয়। যথা—'আদো' (সং আদৌ), 'আদু', ও 'আদিং' (বিরল-প্রয়োগ)।

* * * * * *

অব্যয় কল্প।

সর্ব্বনাম ঘটিত অব্যয় পদ।

সপ্তম্যর্থে—

কিম্-শব্দ	কুহিং, কুহং, কুহিঞ্চনং, কহং, কং, কুত্র, কুথ, কত্থ, কস্মিচি।
তৎ শব্দ	তহং, তহিং, তত্র, তথ।
যৎ-শব্দ	যহিং, যত্র, যথ।
এতৎ-শব্দ	অত্র, এথ, অথ, এত্তো, অত্তো।
ইদম্-শব্দ	ইহ, ইধ, ইত্তো।
পর-শব্দ	পরত্র, পরথ।

* কেবল অগ্নি-শব্দেরই এই অতিরিক্ত রূপ হয়।

† সংস্কৃতের দ্বিবচনের রূপ তুলনীয়। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, পালির প্রথমাবস্থায় দ্বিবচনের প্রয়োগ ছিল; ক্রমশঃ তাহার লোপ হইয়াছে।। 'ভিক্খু' শব্দ দ্রষ্টব্য।

‡ কখন কখন 'অগ্‌গিহি' 'অগ্‌গিভি' এইরূপ হয়, অর্থাৎ অন্ত্যস্বর বিকল্পে দীর্ঘ হয়। মহারূপসিদ্ধি।

§ কেবল অগ্‌গি শব্দেরই কখন কখন এতাদৃশ প্রয়োগ দেখা যায়।

অন্য প্রভৃতি অপর সর্ব্বনাম শব্দের সপ্তম্যর্থে এইরূপ 'ত্র' ও 'থ' প্রত্যয় হয়। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রই 'ত্তো' (সং তস্) হয়, যথা—'কুতো', 'ততো' ইত্যাদি। সর্ব্ব শব্দের 'সব্বত্র' ও 'সব্বথ' এই দুইপদ ভিন্ন 'সব্বধি' এই অতিরিক্ত পদ হয়।

কালার্থে—

কিম্-শব্দ	কদা, কুদাচনং
তৎ-শব্দ	তদা, তদানি
যৎ-শব্দ	যদা, যদানি
সর্ব্ব-শব্দ	সদা, সব্বদা
ইদম্-শব্দ	অধুনা, ইদানি, এতরহি

*

অন্যান্য অব্যয়।*

হলং—নিষেধার্থে।

আবুসো, অম্ভো, হম্ভো, হরে, জে—আমন্ত্রণার্থে।

* * * *

অপ্পেব, অপ্পেব নাম—সংশয়ার্থে।

অদ্ধা অঞ্ঞদত্থু, তগ্ঘ, জাতু, কামং, সসক্কং—একাংশার্থে।

* * * *

সেয্যথাপি, বিয়, যথরিব, তথরিব—সাদৃশ্যার্থে।

ধাতুকল্প।

পালিতে আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ উভয়ই আছে, কিন্তু আত্মনেপদের প্রয়োগ অল্প।

পালিতে আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ নির্ণয়ে কোন গোলমাল নাই; আত্মনেপদী ধাতুগুলিকে পরস্মৈপদে এবং পরস্মৈপদী ধাতুগুলিকে আত্মনেপদে প্রযুক্ত হইতে প্রায়ই দেখা যায়। যথা—সংস্কৃত √মৃ—মরতি, √বুধ্—বুজ্ঝতি, √মন্—মঞ্ঞতি।

কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে আত্মনেপদ হয়, ইহা সাধারণ নিয়ম; কিন্তু কার্য্যত পালিতে ঐ নিয়ম বৈকল্পিক। যথা—পচ্যতে=পচ্চতি, পচ্চতে; লভ্যতে=লব্ভতে, লব্ভতি, মন্যতে=মঞ্ঞতে, মঞ্ঞতি।

পালিতে ভ্বাদি, রুধাদি, দিবাদি, স্বাদি, ক্র্যাদি, তনাদি ও চুরাদি এই সপ্তগণে

---

* এই প্রকরণে পালিতে প্রযুক্ত সমস্ত অব্যয়ের উল্লেখ না করিয়া কতকগুলি সাধারণ ও সংস্কৃতে অপ্রচলিত অব্যয় শব্দ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ধাতুসমূহ বিভক্ত হইয়াছে।* অদাদি, তুদাদি ও জুহোত্যাদি ধাতু পূর্ব্বোক্ত গণেরই অন্তর্নিবিষ্ট, যদিও ইহাদের রূপ বিভিন্ন দৃষ্ট হয়। পাঠকগণের সুবিধার জন্য আমরা দশগণেই ধাতুসমূহকে বিভক্ত করিব।

পালিতে প্রযুক্ত ধাতুরূপগুলি সাধারণত সংস্কৃতানুযায়ী; কেবল অল্প বিস্তর স্বর বা ব্যঞ্জনের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। স্থূলতঃ সংস্কৃত পদের সাদৃশ্য দেখিয়া পালিতে ধাতু ঠিক করা তত কঠিন নহে।

কালাদি-অনুসারে ধাতুগণ সংস্কৃতে দশ প্রকারে প্রযুক্ত হয়, যথা—লট্, লোট্ ইত্যাদি। পালিতে আশীর্লিঙ্ ও লৃটের ব্যবহার নাই। অতএব পালিতে আট লকার। যথা—

১। বত্তমানা (বর্ত্তমানা) বা লট্
২। সত্তমী (সপ্তমী) বা বিধিলিঙ্
৩। পঞ্চমী বা লোট্
৪। হীয়ত্তনী (হ্যস্তনী) বা লঙ্
৫। পরোক্‌খা (পরোক্ষা) বা লিট্
৬। ভবিস্‌সন্তী (ভবিষ্যন্তী) বা লৃট্
৭। কালাতিপত্তি (ক্রিয়াতিপত্তিঃ) বা লৃঙ্
৮। অজ্জতনী (অদ্যতনী) বা লুঙ্

বত্তমানা বা লট্

লটের বিভক্তি, যথা—

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
প্রথম	তি	অন্তি	তে	অন্তে (অরে)
মধ্যম	সি	থ	সে	ব্‌হে
উত্তম	মি	ম	এ	ম্‌হে

(ক)

ভ্বাদিগণীয় ধাতুর উত্তর সংস্কৃতের ন্যায় প্রায়ই অকার আগম হয়, এবং স্থানে স্থানে অন্ত্যস্বর ও উপান্ত লঘুস্বরের গুণ হয়।

* "ভুবাদী চ রুধাদী চ দিবাদিস্বাদয়ো গণা।
কিয়াদি চ তনাদী চ চুরাদি চিধ সত্তধা॥" মহারূপসিদ্ধি।

কচ্চায়নধাতুমঞ্জুষায় দশগণই দেখা যায়। মহারূপসিদ্ধিকার জুহোত্যাদিগণ পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ না করিলেও ভ্বাদিগণের মধ্যে ঐ গণকে অবান্তররূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

বিভক্তির ব ও ম পূরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত অকার আকার হয়।

বিভক্তির অ বা এ পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত অকারের লোপ হয়।

×ভূ

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
প্রথম	ভবতি	ভবন্তি	ভবতে	ভবন্তে
মধ্যম	ভবসি	ভবথ	ভবসে	ভবব্হে
উত্তম	ভবামি	ভবাম	ভবে	ভবম্হে

×ভূস্থানে পালিতে বিকল্পে ×হূ আদেশ হয়। তখন তাহার রূপ এই প্রকার—

হোতি   হোন্তি।   হোসি   হোথ।   হোমি   হোম।

পচ্, যজ্, বহ্ প্রভৃতি ধাতুর রূপ এই প্রকার। যথা—পচতি, পচন্তি ইত্যাদি।

×স্থা—ঠা (পালি)

×স্থা-স্থানে বিকল্পে 'তিট্ঠ' (তিষ্ঠ) আদেশ হয়। তাহার রূপ তিট্ঠতি, তিট্ঠন্তি, তিট্ঠসি......ইত্যাদি। অন্যপক্ষে—

ঠাতি   ঠান্তি।   ঠাসি   ঠাথ।   ঠামি   ঠাম।

জুহোত্যাদি গণীয় কয়েকটি ধাতু ভিন্ন সমস্ত আকারান্ত ধাতুরই "স্থা"ধাতুর দ্বিতীয় প্রকারোক্ত রূপের ন্যায় রূপ হয়। (জুহোত্যাদিগণ দ্রষ্টব্য)।

কখন কখন (প্রায়ই সং, উৎ ও নি-পূর্ব্বক) স্থাধাতুর স্থানে 'ঠহ' আদেশ হয়। যথা—সণ্ঠহতি, সণ্ঠহন্তি ইত্যাদি।

কখন কখন (প্রায় অধি ও উৎ-পূর্ব্বক) "স্থা"ধাতুর আকার স্থানে একার হয়। যথা—অধিট্ঠেতি, অধিট্ঠেন্তি......ইত্যাদি।

*   *   *   *   *

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

মহিলাব্রত।

অরণ্যষষ্ঠী-ব্রত।

এই ষষ্ঠী জ্যৈষ্ঠ মাসে করিতে হয়। পুত্রবতী রমণীগণই এই ব্রত ধারণ করিয়া থাকেন। বন্ধ্যা নারীর এই ব্রত গ্রহণ করিবার পদ্ধতি প্রায়ই নাই। ব্রতটী ধারণ বা পালনের কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। সূতিকা গৃহে "আটৌর" বা সূতিকা ষষ্ঠীর দিন যে ষষ্ঠীপূজা

হইয়া থাকে পুত্রবতীগণ সেই দিন হইতেই এই ব্রত আরম্ভ করিয়া থাকেন। এই ষষ্ঠীব্রত কেবল মাত্র জ্যৈষ্ঠ মাসেই হয় না। ১২ মাসে ১২ প্রকার ষষ্ঠী আছে। তন্মধ্যে অদ্যকার লিখিত ষষ্ঠীটীর নাম "অরণ্যষষ্ঠী"। জনকদুহিতা সীতাদেবী রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা বনবাসে প্রেরিতা হইলে পর, বন মধ্যেই ফলমূল সংগ্রহ করতঃ এই ব্রত উদ্‌যাপন করেন। তজ্জন্যই ব্রতটী অরণ্যষষ্ঠী নামে অভিহিত হইয়াছে বিজন বনে তণ্ডুলসংগ্রহে অসমর্থা হইয়া শুধু ফলমূল দ্বারা পূজার সর্ব্বপ্রকার উপকরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন বলিয়া, ব্রতধারিণীগণ ঐ ব্রতটীর সর্ব্ব প্রকার উপকরণেই তণ্ডুলের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত রাখেন না। কোন কোন দেশে নৈবেদ্যটী আতপ তণ্ডুল দ্বারা প্রস্তুত হয়। ব্রতীকে ঐ দিবস অনাহারে থাকিয়া পূজা অন্তে ব্রতকথা শ্রবণ করিয়া, দধি, দুগ্ধ বুটের ছাতু, ফলমূল ইত্যাদির দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হয়। অন্ন স্পর্শ পর্য্যন্ত করিবার পদ্ধতি নাই।

সূতিকা ষষ্ঠীর সময় যখন ব্রত ধারণ করেন তখন বিশেষ কোন রূপ উদ্যোগ আয়োজন করিতে হয় না। ছয়টা নূতন গাছা বা দীপাধার, ছয়টা নূতন মল্লিকায় করিয়া তদুপরি প্রদীপ জ্বালাইয়া দিতে হয়। ছয়টা সরা ধানে পূর্ণ করিয়া তদুপরি প্রত্যেকটীতে একটা করিয়া কলা দিতে হয়। এক খানা নূতন কুলা ধানে পূর্ণ এবং তাহার উপর এক ছড়ি কলা, এক খানা নূতন বস্ত্র, ছয়টা পান, ছয়টা সুপারী, কিছু আদা ও হলুদ, আল্‌তা, অগনাঙ্গুরী, খোপকোটা ইত্যাদি দিয়া সাজাইয়া দিতে হয়। ইহা ব্যতীত নবজাত শিশুটীর ভাগ্য লিখন জন্য একটা দোয়াত, কলম, কিছু কাগজ, সিন্দুর, এক খানা লৌহ নির্ম্মিত খাঁড়া বা অস্ত্র, ইত্যাদি দিতে হয়। ইহার উদ্দেশ্য যে বিধাতা পুরুষ ঐ দিনেই প্রসূত শিশুর কপালে অদৃষ্টের শুভাশুভ লিখিয়া যান।

কোন কোন বন্ধ্যা রমণী পুত্রের কামনায় অনেক সময় এই ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে ব্রত গ্রহণ সময় অন্যান্য সমস্ত উদ্যোগই করিতে হয়। কেবল মাত্র ভাগ্য লেখন জন্য দোয়াত কলম ইত্যাদি যাহা কুলায় দেওয়া হয় তাহা দিতে হয় না।

ব্রতটী যে, বৎসরের মধ্যে এক দিন পালন করিলেই হইল তাহা নহে। ব্রতীকে বার মাসের বারটী ষষ্ঠীই পালন করিতে হইবে।

আমার পূর্ব্ব প্রেরিত অংশে ঐ ষষ্ঠীগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছি। অদ্যকার লিখিত বিষয় অরণ্যষষ্ঠী। ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসে করিতে হয়।

অরণ্যষষ্ঠীর পূজা ও পালন পদ্ধতি।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত পালন সময়। একটী পাকুড় গাছের শাখা কাটিয়া বাড়ীর যে কোন প্রাঙ্গন মধ্যে প্রোথিত করিতে হয়। সেই প্রোথিত শাখার নিম্নেই পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া ষষ্ঠীদেবীর পূজা করেন। ছেলে মেয়ে শ্বশুর, শাশুড়ী, জামাইদের, ইত্যাদি আত্মীয়বর্গের প্রত্যেকের নামে এক এক খানা, ডালা ফলমূল দ্বারা সাজাইয়া দিতে হয়। সেই ডালাগুলিতে ব্রতীর ইচ্ছানুরূপ ফলমূল দেওয়া যায়। কিন্তু যে

ডালা খানা স্বয়ং ব্রতীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই খানাতে ছয় রকম ফলের কম দেওয়া যায় না। এবং প্রতি প্রকার ফল একটীর বেশী দিতে হয়। পুরোহিত ষষ্ঠীদেবীর নামে ডালাগুলি উৎসর্গ করিয়া দেন। পূজা শেষ হইলে ব্রতী ব্রতকথা শুনেন এবং তার পর "সা'ট্" ও "কোল" বানান। অর্থাৎ এক গাছি দূর্ব্বা লইয়া প্রতি মাসের প্রত্যেকটী ষষ্ঠীর নামে তিন বার সা'ট্ বলিয়া মাথায় স্পর্শ করতঃ ঐ গাছের নীচে ফেলিয়া দেন—

যেমন—"বৈশাখ মাসে হরিষষ্ঠী সা'ট্ সা'ট্ সা'ট্

জ্যৈষ্ঠ " " অরণ্য " " "

আষাঢ় " বিমলা " " "

এইরূপ ১২ মাসের নামে, সুপরিজ্ঞাত যতগুলি তীর্থের নাম মনে থাকে তাহার নামে, এবং ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকের নামে "সা'ট" বানাইতে হয়।

"সা'ট্" বানান শেষ হইলে—"কোল" বানাইতে হয়। ব্রতী যখন ব্রতকথা শুনিতে বসেন তখন তাঁহার নিজের ডালা হইতে প্রত্যেক রকমের ফল দুইটী করিয়া উঠাইয়া লইয়া একটী নিজের কোছার কাপড়ের মধ্যে অন্যটী ঐ প্রোথিত শাখার নিম্নে রাখিয়া কথা শুনিতে থাকেন। ব্রতকথা শেষ হইলে, নিজের কোছার ফলগুলি ঐ শাখার নীচে ঢালিয়া দিয়া, পূর্ব্ব স্থাপিত শাখার নীচের ফলগুলি কোছায় উঠাইয়া লন এবং অঞ্চল দ্বারা তাহা অর্থাৎ যে ফলগুলি মাটীতে ঢালিয়া দিলেন তাহা কিয়ৎক্ষণ আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে হয়। পরে প্রণাম করিয়া উঠিয়া আসেন। এ ব্রতের উদ্দেশ্য পুত্র কন্যা লাভ।

অরণ্য ষষ্ঠীর ব্রতকথা।

জ্যৈষ্ঠমাস। অরণ্যষষ্ঠী। এক সওদাগরের ছেলে হয়, ছেলে বাঁচে না। ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর আগ্‌বোল্ (১) জিনিশ সওদাগরের বউ খায়; সেই জন্যই ছেলে পিলে বাঁচে না। শাশুড়ী ষষ্ঠী পূজার জোগাড় করিয়া রাখিয়া স্নান করতে গিয়েছে; সওদাগরের বউ পূর্ণ গর্ভা, দশ মাস দশ দিন; সে কিনা গিয়ে সেই ষষ্ঠী পূজার আগ্‌বোল্ জিনিস সব খেয়েছে। সওদাগরের মা স্নান করে এসে দেখে যে পূজার জোগাড়ের সব জিনিসই অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক করিয়া বউটী খেয়ে ফেলেছে। শাশুড়ী বকাবকী করিয়া কি করিবে সেই খাওয়া জিনিস দিয়াই পূজা শেষ করিল। তার পর কথা শুনতে বসেছে এমন সময় পাড়া প্রতিবাসী লোকে এসে বলিল যে "তোমার বেটার বেটা হ'য়ে মল"। সওদাগরের মা কাঁদতে লাগিল মামার এক মায়ের (২) সওদাগর হ'ত।

ফের (৩) বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাস হ'চ্ছে। অরণ্যষষ্ঠীর দিন আসছে। সওদাগরের বউ

---

(১) পূজার জন্য প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্যের অগ্রভাগ।

(২) "এক মায়ের এক সওদাগর" অর্থাৎ একটী পুত্র জন্মিয়া যদি বেঁচে থাকিত তবে সেও অন্ত এক খান টাকা লইয়া সওদাগরী ব্যবসা করিত।

(৩) পরের বৎসর।

আবার গর্ভবতী দশ মাস দশ দিন। সওদাগরের মা সকলের সহিত বুদ্ধি পরামর্শ করিল যে, আমার পুত্রবধূ ত এবারও গর্ভবতী। পূজার আগ্‌বোল জিনিষ খায়, কি করিব"? তখন সকলে বুদ্ধি দিল যে আর কিছু নয় ভাসুরকে দরজায় বসাইয়া রাখ তবেই কিছু খাইতে পারিবে না। বুড়ি পূজার উদ্যোগ কচ্ছে আর বউকে বুঝাচ্ছে "মা! পূজার আগ্‌বোল খাইও না; তোমার কোলে জিয়ন্ত ছেলে হবে"। বুঝায়ে সুঝায়ে পূজার উদ্যোগ আয়োজন সব করে বড় বেটাকে দরজায় বসাইয়া রাখিয়া স্নান করতে গেল। বউ, তার জিবা বের হ'য়ে পাউই (৪) পেঁচে (৫) ধরছে; চক্ষের জলে কাপড় ভিজে যাচ্ছে, লোভ সম্বরণ কর্ত্তে পাচ্ছে না; কি কর্ব্বে, ভাসুর দরজায় ব'সে আছে। বেড়া ভেঙ্গে ঘরের মধ্যে গিয়ে ছাতু, কাঁঠাল, আম, দৈ সব খেয়ে দেয়ে ব'সে আছে। শাশুড়ী ডুব দিয়ে আসছে ঘরের মধ্যে ভিজা কাপড়ে ভিজা চুলে যাচ্ছে; গিয়া দেখে যে বউ সব খেয়ে দেয়ে ব'সে আছে। কি কর্ব্বে, বুড়ি বকাবকি কচ্ছে, ঐ সব জিনিসই ধুয়ে' নিয়ে তাই দিয়ে পূজার উদ্যোগ কচ্ছে। পূজা হচ্ছে। সওদাগরের মা কথা শুনতে বসচে; পাড়া প্রতিবাসী সকলে এসে কহিল "সওদাগরের মা! তোমার বেটার আর এক বেটা হ'য়ে ম'ল"। বুড়ি কাঁদছে হায়! হায়! আমার দুই নায়ের দুই সওদাগর হ'ত।

ফের বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাস হচ্ছে। অরণ্য ষষ্ঠীর দিন আসছে। সওদাগরের বউ আবার গর্ভবতী। দশ মাস দশ দিন। সওদাগরের মা সকলের সহিত বুদ্ধি পরামর্শ করিল যে আমার বেটার বউ যে এবারও গর্ভবতী। প্রত্যেক বারেই পূজার আগ্‌বোল জিনিস সব খেয়ে ফেলে; ইহার উপায় কি করা যায়? তখন সকলে বুদ্ধি দিল যে আর কিছু নয় মামাশ্বশুরকে দরজায় বসাইয়া রাখিয়া স্নান ক'রে এস। তাহলে খেতে পার্ব্বে না। বুড়ি, পূজার উদ্যোগ আয়োজন কচ্ছে আর বউকে বুঝাচ্ছে মা! পূজার আগ্‌বোল কখনই খেও না তোমার কোলে জিয়ন্ত ছেলে পাবে। বুঝায়ে সুঝায়ে বুড়ি যাচ্ছে। স্নান করে এসে পূজা কর্ব্বে। বউ এর আর সহ্য হচ্ছে না। জিবা বের হ'য়ে ঘরের পাউই পেঁচে ধরছে, চক্ষের জলে কাপড় ভিজে যাচ্ছে, লোভ কিছুতেই সম্বরণ কর্ত্তে পারছে না। কি কর্ব্বে, মামা শ্বশুর দরজায় বসে আছে, ঘরের বেড়া ভেঙ্গে মধ্যে না গিয়ে ছাতু, কাঁটাল, আম, দৈ যত ছিল সব খেয়ে দেয়ে এসে বসে আছে। শাশুড়ী ডুব দিয়ে আসছে। আসতেই বেড়া ভাঙ্গা দেখে ভিজা কাপড় ভিজা চুলেই তাড়াতাড়ি করে ঘরের মধ্যে যাচ্ছে, গিয়া দেখে যে বউ সব খেয়ে দেয়ে বসে আছে। কি কর্ব্বে উপায় নাই; বউকে বকাবকি ক'রে ঐ সকল জিনিস দিয়েই আবার পূজার যোগাড় ক'রে নিল আর পূজা শেষ ক'রে কথা শুনতে বসল। কথা শুনছে, এমন সময় পাড়াপড়সী (৬) সকলে এসে বলল যে, সওদাগরের মা তোমার

(৪) খুঁটী, থাম

(৫) বেড়িয়া, সাপ্‌টিয়া।

(৬) পাড়া প্রতিবেশী।

যে বেটার ছেলে হয়ে ম'ল। সওদাগরের মা আকুল হ'য়ে কাঁদতে লাগ্‌ল "হায়! আমার তিন নৌকার তিন সওদাগর হ'ত।

ফের বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাস। অরণ্যষষ্ঠীর দিন আস্‌ছে, সওদাগরের মা পূজার উদ্যোগ আয়োজন শেষ করে, সকলের সহিত পরামর্শ কচ্ছে; সকলে বল্‌ছে যে, "আর এবার আর কি কর্ব্বে—ঘরের বেড়া (৭) শক্ত ক'রে বাঁধিয়া আর দরজায় তালা দিয়ে রাখ। বুড়ী সেই রকমই ক'রে রাখ্‌ল। তার পর স্নান কর্ত্তে যাচ্ছে। বউয়ের কি আর সহ্য হয়? তার জিবা দুই হাত বের হয়েছে। হ'য়ে ঘরের পাউই পেঁচে ধরছে, চক্ষের জলে বুক কাপড় ভেসে যাচ্ছে। কি করে, ঘরের বেড়া ভেঙ্গে মধ্যে গিয়ে, পূজার জিনিস যত ছিল সব খেয়ে দেয়ে ব'সে আছে। বুড়ী স্নান ক'রে আস্‌ছে। এসেই দেখে যে বেড়ার মধ্যে সব ভাঙ্গা। এই না দেখেই দৌড়াদৌড়ী করে ঘরের মধ্যে ভিজা কাপড় ভিজা চুলেই যাচ্ছে,গিয়ে দেখে বউ সব খেয়েদেয়ে ব'সে আছে। কি কর্ব্বে আর উপায় নাই। বউকে বকাবকি ক'রে ফের ঐ সব জিনিস দিয়েই পূজার জোগাড় কচ্ছে। পূজা হচ্ছে। বুড়ী কথা শুন্‌তে বসেছে। পাড়াপড়শী সকলে এসে সংবাদ দিল যে, সওদাগরের মা, তোমার যে বউয়ের বেটা হয়ে ম'ল। সওদাগরের মা হায় হায় করতে লাগিল। কাঁদিয়া ব্যাকুল হইল। হায়! হায়! আমার চার নৌকার চার জন সওদাগার হ'ত।

ফের বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাস। অরণ্যষষ্ঠীর দিন আস্‌ছে। সওদাগরের মা সকলের সহিত বুদ্ধি পরামর্শ করছে যে এবার কি উপায় কর্ব্ব। সকলে বুদ্ধি দিল "শুক্‌না যবের ছাতু বউকে গুঁড়া করিতে পাঠাইয়া দাও, বউ আস্‌তে দেরি হবে সেই সময় তোমার পূজা শেষ হয়ে যাবে"। বুড়ী বউকে বুঝাচ্ছে মা! পূজার আগ্‌ কোন জিনিস খেতে নাই। কোলে জিয়ন্ত ছেলে পাবে। তুমি এই যবের ছাতু তৈয়ার করে আন। বউ কি করে তাই গেল; বুড়ী স্নান কর্ত্তে যাচ্ছে। বউ কিছুতেই যবের ছাতু করতে পাচ্ছে না। কেঁদে কেটে অস্থির হচ্ছে। হায় হায় আমার এবার বুঝি কিছু খাওয়া হ'ল না। কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষের এক ফোটা জল একটা যবের উপর প'ল। বউ দেখে যে চোকের জল প'ড়ে যবটা ছাতু হয়ে গেল। তখন ভাবিল বুঝি জল দিলেই ছাতু তাড়াতাড়ি হবে। এই না বলে, সে ঘটীয়ে ঘটীয়ে জল এনে সেই যবের মধ্যে ঢেলে দিল। দিয়ে হাগাবাগি (৮) ক'রে ছাতু তৈয়ার ক'রে নিয়ে বাড়ী গেল। বাড়ী গিয়ে দরজা বেড়া সব ভেঙ্গে ভিতর গেল। পূজার যোগাড় যত ছিল ছাতু, দৈ, আম কাঁঠাল সব খেয়ে দেয়ে ব'সে আছে। সওদাগরের মা ডুব দিয়ে আস্‌ছে, এসে দেখে যে ঘরের বেড়া সব ভাঙ্গা। তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখে যে সব জিনিষ বউ খেয়ে দেয়ে ব'সে আছে। কি কর্ব্বে বকাবকি ক'রে সেই সব

(৭) বংশনির্ম্মিত মাদুরের দেওয়াল।

(৮) তাড়াতাড়ি।

খাওয়া জিনিস দিয়েই পূজার যোগাড় কচ্ছে। পূজা হচ্ছে। বুড়ী কথা শুন্‌তে বসেছে এমন সময় পাড়াপড়সী সকলে এসে সংবাদ দিল সওদাগরের মা! তোমার বেটার বউএর বেটা হ'য়ে ম'ল। বুড়ি কাঁদিয়া কাটিয়া ব্যাকুল হইল। হায় হায় আমার পাঁচ নৌকার পাঁচ সওদাগর হইত।

ফের বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাস। আরণ্যষষ্ঠীর দিন আস্‌ছে। বুড়ী সকলের সহিত বুদ্ধি পরামর্শ কচ্ছে যে বেটার বউ কিসে আগ্‌বোল খেতে না পারে। সকলের সহিত বুদ্ধি ক'রে—বুড়ী বউকে বলিল মা! এই টাকুয়ার (৯) নগুণ (১০) যতদূর যায় ততদূর পর্য্যন্ত কা'ড় (১১) দিতে দিতে চলিয়া যাও। যতদূর গেলে শেষ হয় ততদূর যাও। মধ্যে আগায় (১২) আসিও না। বুড়ী এক বৎসরে সব নগুণ কাটিয়াছে। বউ কি করে, টাকুয়া নিয়ে নগুণ কা'ড় দিতে দিতে যাচ্ছে। কত শ্মশান ঘাটে শ্মশান পাটে চ'লে যাচ্ছে, নগুণ আর ফুরায় না। অবশেষে শ্মশানের মধ্যে গিয়ে বউ এর প্রসব বেদনা উঠিল। সেই শ্মশান ঘাটের মধ্যেই সওদাগরের বউএর এক পুত্র সন্তান জন্মিল। এ দিকে সওদাগরের মা পূজা আর্চ্চা (১৩) শেষ ক'রে ষষ্ঠীর কথা শুন্‌তে বসেছে, পাড়া পড়সী সকলে এসে সংবাদ দিল সওদাগরের মা! তোমার বেটার বউয়ের যে এক বেটা হ'য়েছে। জিয়ন্ত (১৪) ছেলেই হয়েছে।

সওদাগরের মা এই কথা শুনে বড়ই সন্তোষ হ'ল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর কাছে মানা চিনা (১৫) ক'রে শ্মশান ঘাটে ছেলে দেখ্‌তে গেল। ছেলে দেখে সেই খানেই তাল-পাতায় এক কুঁড়ে (১৬) বেঁধে দিল। ছেলে পোয়াতি সেই ঘরেই থাকিল। ছেলে নিয়ে পোয়াতি শুয়ে আছে রাত্রে বুড়া রাক্ষসী এল। এসে পোয়াতিকে কহিল "আগ্‌-খাকি আগ্‌বুলানী, তার কোলে কেন জিয়ন্ত ছেলে? সাটের পুং গোবিন্দ, তুমি আমার সাথে এস।" ছেলে কহিল "আমি মার কোলে আছি, কেমন ক'রে যাব। তবে সাটোরের দিন মা যখন আমায় শুইয়ে রেখে ঘুমবে তখন আমি যাব।" মায়ে তাই শুন্‌ল। সাটোরের দিন ধাই ধরণী সাথে করে নিয়ে পোয়াতি ছেলে কোলে করে তাবৎ রাত্রি জেগে ব'সে থাকল। শেষ রাত্রে রাক্ষসী এল। ছেলেকে কহিল "সাটের পুং গোবিন্দ

(৯) টেকো, পৈতা তৈয়ার করার জন্য বংশ ও কর্দ্দমনির্ম্মিত ক্ষুদ্র কাঠি, ইহাতেই পৈতা পাকাইতে হয়।
(১০) যজ্ঞসূত্র, পৈতা।
(১১) টাকুয়া হইতে খুলিয়া দেওয়া।
(১২) জায়গায়, স্থানে।
(১৩) অর্চ্চনা,—পূজা।
(১৪) জীবিত
(১৫) মানস।
(১৬) কুটীর।

তুমি আমার কোলে এস। আপ্‌খাকী আগবুলানী, তার কোলে কেন জিয়ন্ত ছেলে ?" ছেলে কহিল "আমি মার কোলে আছি, মা জেগেই আছে, কেমন ক'রে যাই। যাই হ'ক দোষ না পে'লে ত যেতে পারি না ? তুমি মাকে গিয়ে ব'লো যে আমি অন্নপ্রাশনের দিন নিশ্চয় মার কাছে যাব। সেই অন্নপাশনের দিন পিশিমার কোলে উঠে তার শাড়ী ভ'রে বাহ্যে ক'রে দেব, হাড়ীর মাদল ভেঙ্গে দেব, তাহলেই সকলে দূর্ দূর্, ছেই ছেই কর্ব্বে, আমিও সেই দোষে সেই দিন চ'লে যাব।" বুড়ী রাক্ষসী চ'লে গেল। এক মাস দুই মাস ক'রে ছয় মাসের ছেলে হল। দিন ক্ষণ দেখ্‌ল ; গহনা গাঁঠরী গড়াল ; ধান ভেঙ্গে চা'ল ক'ল্ল ; কলাই ভেঙ্গে ডাল কল্ল ; বিল ছেঁকে মাছ আন্‌ল, গাই ছেঁকে দুধ আন্‌ল, আপ্তরঙ্গ (১৭) বন্ধুবর্গ যে যেখানে আছে নিয়ে এল ; কুলের কুলপুরোহিত আন্‌ল ; মহাধুমধাম্ ক'রে অন্নপ্রাশন দিচ্ছে। পিশিমা বানারসী শাড়ী প'রে আস্‌চে। মা কি না করল্ কি, দৌড়াদৌড়ি ক'রে গিয়ে ননদকে কচ্ছে "ঠাকুরঝি ! খোকা তোমার কোলে আজ বাহ্যি করে দিয়ে তোমার শাড়ী নষ্ট ক'রে দেবে, তুমি তাকে কিছু বল না ; তোমায় আমি জড়ির শাড়ী দিব ; সে যেমন বাহ্যি কর্‌বে তুমি তাকে অমনি বোলো, সাট্ সাট্ সাটের পুং গোবিন্দ ! তুমি যদি বেঁচে থাক তবে আমার জড়ীর শাড়ী হবে। তার পর হাড়ীকেও কহিল "দেখ্ আমার খোকা তোর মাদল ভেঙ্গে দিবে। তুই বলিস্ সাট্ সাট্ সাটের পুং গোবিন্দ ! তুমি যদি বেঁচে থাক তবে আমার সোণার মাদল হবে। তোরে আমি সোণার মাদল বানিয়ে দিব। কিন্তু তুই যেন কোন রকম অসন্তোষ হ'য়ে গালাগালি দিস্ না।" মহাধুমধাম ক'রে অন্নপ্রাশন হচ্ছে। পিশিমা গিয়ে ছেলেকে কোলে নিচ্ছে ; ছেলে কোল ভরে বাহ্যি করে দিচ্ছে। এ দিকে পিশি মা বল্‌ছে সাট্ সাট্ সাটের পুং গোবিন্দ তুমি যদি বেঁচে থাক তবে আমার সোণার শাড়ী হ'বে। তার কোলে থেকেই ছেলে কিনা করল্ কি সেই হাড়ীর মাদলের উপর যেমন লাফি মারিল অমনি মাদলটা ভেঙ্গে গেল। হাড়ী তৎক্ষণাৎ কহিল "সাট সাট সাটের পুং গোবিন্দ তুমি যদি বেঁচে থাক তবে আমার সোণার মাদল হবে।" এই রকমে অন্নপ্রাশন হ'য়ে গেল।

নিশীত (১৮) রাত্রে মা ছেলেকে কোলে নিয়ে শুয়ে আছে এ দিকে বুড়া রাক্ষসী এসে উপস্থিত। বল্‌ছে হতভাগী আপ্‌খাকী আগ্‌বালানীর কোলে কেন জিয়ন্ত ছেলে ? সাট সাট সাটের পুং গোবিন্দ ! আজ তুমি এস তোমার মা (১৯) তোমায় ডেকেছেন। ছেলে কহিল না না, আজ আমি যাই কেমন ক'রে এদের কোন দোষ না পেলে যাওয়া যায় কি ?

(১৭) আত্মীয় স্বজন।

(১৮) নিশীথ, দুই প্রহর রাত্রি।

(১৯) মা অর্থে [illegible]

যাহউক আজ তুমি যাও; আমি যে তা নগুণের দিন নিশ্চয় তোমার সাথে মার কাছে যাব। আমি সেই দিন নাপিতের ক্ষুর ভেঙে দিব আর খানসামার মাথা মোড়ায়ে ঘোল ঢেলে দিব; তবেই বাড়ী শুদ্ধ সকলে আমায় গালাগালি, দুর দুর, ছেই ছেই, কর্‌বে, আমি সেই দোষে তোমার সাথে চলে যাব। এক দিন দুই দিন করে নয় বৎসর যাচ্ছে, নগুণের জোগাড় হচ্ছে; সওদাগরের বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়েছে, আত্মকুটুম্ব, দাস দাসীতে বাড়ী ভরে যাচ্ছে। কলাই ভেঙ্গে ডাল কচ্ছে, ধানভেঙ্গে চা'ল কচ্ছে, বিল ছেঁকে মাছ আন্‌ছে, গাই ছেঁকে দুধ আন্‌ছে। মহা ধুমধাম পড়ে গেল। এ দিকে সওদাগরের মা সেই নাপিতের কাছে গিয়ে বল্‌ছে যে "দেখ্ নাপিত! খোকা যে আজ তোর ক্ষুর খানা ভেঙ্গে দেবে, তুই যেন অসন্তোষ হস্ নে, গালাগালি দিস না, তবে আমার খোকার অকল্যাণ হবে। তুই বলিস্ সাট সাট সাটের পুৎ গোবিন্দ তুমি যদি বেঁচে থাক তবে আমার লোহার ক্ষুর গেল সোণার ক্ষুর হ'বে। আমি তোকে এক গাছা সোণার ক্ষুর দেব।" পরে খানসামার কাছে যাচ্ছে, তাকে বলছে, "দেখ্‌রে খানসামা খোকা আজ তোর মাথা মোড়াইয়া ঘোল ঢেলে দেবে। তুই যেন তাতে রাগিস না, কি কোন রকম বকাবকি করিস না। বলিস্ যে সা'ট্ সা'ট্ সাটের পুৎ গোবিন্দ তুমি যদি বেঁচে থাক তবে আমি কত টাকা কত পয়সা পাব। তুমি বেঁচে থাক। তুই যত টাকা চা'স তাই তোকে দিব।" ছেলে গিয়ে নাপিতের কাছে বস্‌ছে, ব'সে তার ক্ষুর ভেঙ্গে দিচ্ছে, নাপিত বলছে তুমি যদি বেঁচে থাক ত'বে আমার লোহার ক্ষুর গেল সোণার হবে। তার পর সেই খানসামার মাথা মোড়ায়ে ঘোলঢেলে দিচ্ছে, খানসামা বল্‌ছে "সা'ট্ সাট্ সাটের পুঃ গোবিন্দ তুমি যদি বেঁচে থাক তবে আমি কত টাকা পয়সা পাব।" এই রকমে নগুণও হ'য়ে গেল।

নিশীত-রাত্রে মা ছেলে কোলে ক'রে শুয়ে আছে। বুড়া রাক্ষসী এসে উপস্থিত। বল্‌ছে আগ্‌খাকী আগ্‌বুলানী হতভাগীর কোলে কেন জীয়ন্ত ছেলে? সা'ট সা'ট সাটের পুৎ গোবিন্দ আজ তুমি এস। আজ আর তোমায় ছেড়ে কিছুতেই যাব না। তোমার মা আজ তোমায় ডেকেছেন। ছেলে কহিল,না না আজও ত কোন দোষ এই বাড়ীর পাই নাই। মার কোলে শু'য়ে আছি, যাই কেমন ক'রে? বাড়ী শুদ্ধ সকলেই সাট্ সাট্ সাটের পুৎ গোবিন্দ ব'লে বেঁচে থাক্‌তে বলে। কোন দোষ না পেলে যাই কেমন ক'রে? যাই হউক আমি আমার বিয়ের দিন যে তা আর কিছুতেই থাক্‌ব না। সে দিন আমি ১০১ বার হাঁচ্‌ব যদি নুতন বউ প্রত্যেক বার হাঁচির সাথে সাথে সা'ট্ সা'ট্ না করে তবে সেই দোষেই আমি সেই দিন তোমার সাথে নিশ্চয় মার কাছে যাব।" তখন বুড়া রাক্ষসী আর কি কর্‌বে ফিরে চলে গেল। দিনে দিনে দিন গেল। দুই দিন চার দিন করে ছেলে বিয়ের যোগ্য হ'ল। গাঁয়ের মধ্যেই বাড়ীর নিকটে একটী সুশ্রী পাত্রী ঠিক হ'ল। সওদাগরের মা বিয়ের অনেক আগে থেকেই আজ এ জিনিস কাল ও জিনিষ টুকু নিয়ে গিয়ে মেয়েটীকে দিয়ে আসে, একটু ভাল খাবার জিনিস হ'লেই নিয়ে গিয়ে মেয়ে

টীকে খাওয়ায়। এমনি করে ক্রমে ক্রমে মেয়েটীকে বশ করিতে লাগিল। শুভ দিনে শুভক্ষণে পাত্র যাত্রা ক’রে বিয়ে কর্‌তে গেল। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবর্গে বাড়ী ভ’রে গেল। কুলের কুল পুরোহিত এল। ঢাক ঢোল সানাই কাঁশি নাগারা টিকারায় বাড়ী তোলপাড় কর্‌তে লাগ্‌ল। মহাধুমধাম্ বিয়ে বাড়ীতে আরম্ভ হ’ল। এ দিকে সদাগরের মা দৌড়াদৌড়ী ক’রে পাত্রীর কাছে যাচ্ছে। বল্‌ছে “মা! বর যখন জলচৌকীর উপর দাঁড়াবে তখন ১০১ বার হাঁচ্‌বে, তুমি প্রত্যেক বারেই সা’ট্ সা’ট্ করো। নইলে অমঙ্গল হবে।” মেয়েটী আগে থেকেই বশ হয়েছে; পাত্র যখন মুখচন্দ্রিকার জন্য সেই জলচৌকীর উপর দাঁড়াল তখন থেকেই হাঁচা আরম্ভ কর’ল। নূতন কন্যা প্রত্যেক বারেই হাঁচির পরে পরেই “সা’ট্ সা’ট্” করিতে লাগিল। এই রকমে ১০১ বার হাঁচিল কন্যাও ১০১ বার “সা’ট্ সা’ট্” করিল। বিয়ে হ’য়ে গেল। বরকন্যা বাসর ঘরে গিয়ে শু’ল (২৩)। সওদাগরের মা সে আর ছেলেকে রাত্রে কখনই একা শুতে দেয় না। সেও গিয়ে সেই ঘরের মধ্যেই এক জায়গায় শু’য়ে থাক্‌ল। নিশীথ রাত্রে বুড়ী রাক্ষসী আসিল। আসিয়াই বলিল “আগ্‌থাকী আগ্‌বুলানীর কোলে, কেন জিয়ন্ত ছেলে? বাবা! তুমি আমার সাথে এস, আজ আমি অবশ্যই সঙ্গে ক’রে নিয়ে যাব। তোমার মা আজ তোমাকে নিশ্চয় যেতে ব’লেছেন। “ছেলে কহিল” না না বুড়ী আমি যে আজও যেতে পার্ব্ব না। আজিও এদের কোন দোষ দেখ্‌তে পাই নাই। আমি ১০১ বার হাঁচিয়াছি, নূতন কন্যা ১০১ বারই সা’ট সা’ট বলিয়াছে। এদের দোষ না পেলে আমি যাই কেমন ক’রে। যা’হক আজ ত আমি যেতে পা’রলাম না, তুমি মাকে গিয়ে ব’লো আমি এই আস্‌তেছে (২৪) আরণ্যষষ্ঠীর দিন মাথায় তেল মেখে * সেই দোষে বাড়ী ছেড়ে চ’লে যাব। “বুড়ারাক্ষসী চ’লে গেল। ক্রমে দিন গেল অরণ্য ষষ্ঠীর দিন আস্‌ছে। সওদাগরের মা পূজার জোগাড় কচ্ছে। ক্রমে পূজার সময় হ’ল। বেলা হ’ল, ছেলে এসে বলছে—“আমায় একটু তেল দাও, আমি স্নান করব। সওদাগড়ের মা সেই বিয়ের দিন রাত্রে বুড়া রাক্ষসীর কথা আর ছেলের উত্তর সব শুনিয়াছিল। শুনিয়াই গ্রামশুদ্ধ, আশেপাশে ২।৪ ক্রোশের মধ্যে ঢোলসহরৎ দিয়েছিল যে, অরণ্য ষষ্ঠীর দিন যেন কারও বাড়ীতে একটু তেলও না থাকে। খাওয়াদাওয়া, মাথায় মাখা সকলের জন্যই যত ঘি যত যা’ লাগে আমি দিব কিন্তু কারোর বাড়ীতে সরিষার তেল থাকা হবে না। সকল পাড়া সবশুদ্ধ তেল ছেড়েছে। তারে তারে ঝি সকলের বাড়ী যাচ্ছে, কোথাও এককোটা তেল পাওয়ার উপায় নাই। সওদাগরের মা নিজের বাড়ীর তেলের হাঁড়াটীও ফেলে দিয়েছে।

---

(২৩) শয়ন করিল।

(২৪) আস্‌তেছে অরণ্যষষ্ঠী অর্থ যে ষষ্ঠী আগামীতে হইবে। যাহা আসিতেছে।

* আমাদের দেশে এই হেতুই স্ত্রীলোকগণ কাহাকেও এই দিন তেল দিতে দেন না।

সওদাগরের মার নিকট তেল না পেয়ে ছেলেটী কহিল, "আচ্ছা আমি একবার দেখি ত তেল পাই কি না" এই বলিয়া দুই প্রহরের রৌদ্রের মধ্যে দিয়া হাঁ হাঁ করিতে করিতে পাড়ায় চলিতেছে। যাইতে যাইতে দেখে যে মাঠের মধ্যে খুলুর জাঠ (২৫) ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হ'য়ে সেইখানে প'ড়ে আছে। দুই প্রহরের ভয়ানক রৌদ্রে সেই ভাঙ্গা জাঠ উনাইয়া উনাইয়া চোয়াইয়া (২৬) তেল গ'লে পড়্‌ছে। সদাগরের ছেলে তখন সেই ভাঙ্গা জাঠ না হাতে নিয়ে মাথায় ঘষিয়া ঘষিয়া দিতে লাগ্‌ল। এই রকমে খুব করে জাঠ মাথায় ঘষিয়া যেখানে সওদাগরের মা পূজার জোগাড় করে নিয়েছে সেই জায়গায় এসে বল্‌ল— "আমি এখন যাই?" সওদাগরের মা তার কথা বুঝ্‌তে পার্‌ল, পেরে বলল "বাবা তুমি কি দোষে, কার দোষে আজ যাচ্ছ?" তখন সেই খুলুর ভাঙ্গা জাঠের কথা ছেলে সব তার কাছে ভেঙ্গে চুরে বল্‌ল। সওদাগরের মা আর কি কর্‌বে। এবার আর কোন উপায় নাই। নিরুপায় দেখে ছেলেকে বল্‌ল, বাবা যাবে যদি যাও," কিন্তু একটু বিলম্ব কর আমি তোমার কাছে একটু "সাধ" দিচ্ছি আর দুগাছি কঙ্কণ দিচ্ছি তাহা (২৭) নিয়ে গিয়ে তোমার সেখানকার মাকে দিও, আর তাকে আমার কথা ব'লে বলো যে, সেই এ "সাধ" তোমাকে খেতে দিয়েছে আর এ কঙ্কণ দুগাছি তোমার হাতে পর্‌তে দিয়েছে।" ছেলে খানিকক্ষণ সেই পূজার কাছে ব'সে থাক্‌ল। পূজা হ'ল। কথা শুনা হ'লে বুড়ী সদাগরের মা ভক্তির সাথে মা ষষ্ঠীর কাছে মানাছিনা ক'রে, কাঁদাকাটি ক'রে, সেই সাধটুকু ও কঙ্কণ দুগাছি ছেলের কাছে দিল। ছেলে তাই নিয়ে চলে গেল।

ষষ্ঠীঠাকুরাণীর কাছে গিয়ে পৌঁছে ছেলে তাঁকে কহিল "মা আমার গর্ভধারিণী মা তোমাকে এই সাধটুকু খাইতে ও এই কঙ্কণ দু'গাছি হাতে দিতে দিয়েছেন। মা ষষ্ঠী তখন ছেলের হাতে থেকে সেই সাধটুকু নিয়ে খেলেন, আর কঙ্কণ দুগাছি হাতে দিলেন। সাধটুকু খাইয়া ষষ্ঠীঠাকুরাণী এতই সন্তোষ হইলেন, আর সেই কঙ্কন দুগাছি হাতে দিয়ে ও এতই সন্তোষ হইলেন যে, ছেলেকে ডাকিয়া কহিলেন "বাবা তোমার মা যে আমাকে সাধ দিয়াছে তাহা খাইয়া আমি বড়ই সন্তোষ হইলাম আর এই কঙ্কণ দুগাছি আমার হাতে শাঁখার কাছে যেমন সুন্দর শোভা হইয়াছে, তুমিও তেমনি তোমার মার কোলে গিয়ে শোভা সম্পাদন কর। যাও তোমার মার কোলে যাও।" ছেলে তখন আবার ফিরিয়া আসিয়া সওদাগরের বাড়ীর মধ্যে গেল। সওদাগরের মা ছেলে হারাইয়া কাঁদা-

(২৫) যাহাতে কলুজাতি সরিষা ভাজিয়া তেল তৈয়ার করে।

(২৬) বহিয়া বহিয়া।

(২৭) ব্রতধারিণীগণ পূর্ব্বেই অকলশস্য কলাচিনি ইত্যাদি দ্বারা হাতু মাখাইয়া সাধ তৈয়ার করেন এবং কার্পাস সূত্রদ্বারা হলুদচুণের মিশ্রিত রং দিয়া কঙ্কণ তৈয়ার করিয়া রাখেন। ব্রতকথা শুনিতে শুনিতে এইস্থানে উপস্থিত হইলে ঐ সাধ ও কঙ্কণ বাহির করিয়া ষষ্ঠীঠাকুরাণীকে দেন।

কাটি করিয়া ভাতজল কিছুই স্পর্শ করে নাই। ছেলে পাইয়া হাতে স্বর্গ পাইল। কোলে লইয়া সব সমাচার শুনিয়া বড়ই সন্তোষ হইল। সেই হ'তে ষষ্ঠীর কথা সংসারে খ্যাত হ'ল।

ধর্ম্মপুকুর ব্রত।

কেহ কেহ এই ব্রতটীকে "পুণ্য-পুকুর" নামেও প্রকাশ করিয়া থাকেন। চৈত্রসংক্রান্তি হইতে বৈশাখীসংক্রান্তি পর্য্যন্ত অর্থাৎ বৈশাখ মাসটী সম্পূর্ণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সম্পূর্ণ বৈশাখ মাস ভরিয়া প্রতিদিন নিম্নলিখিত উপকরণগুলি নূতন নূতন সংগ্রহ করিয়া ব্রতধারিণীকে পূজা করিতে হয় ও প্রতিদিনই ব্রতকথা শুনিতে হয়। অনূঢ়াকন্যা এ ব্রতধারণ করিতে পারেন না। পাঁচ বৎসর ব্রতপালনান্তর "প্রতিষ্ঠা" করিতে হয়। ব্রতধারণকালে বিশেষ কোন উদ্যোগ করিতে হয় না। পূজাপদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয়গুলি পাঠ করিলেই ব্রতধারণের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পূজা-পদ্ধতি ও উপকরণ।

চৈত্রসংক্রান্তির দিনে, ব্রতধারিণী ঠিক পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া বসিতে পারেন এরূপভাবে একটী ক্ষুদ্রাকৃতি পুষ্করিণী কাটিতে হয় এবং উহার চতুর্দ্দিকের তীরে, মধ্যস্থানে ও চতুষ্কোণে একুনে ৭টী ঘাট তৈয়ারী করিতে হয়। যেস্থানে বসিয়া পূজা করিবেন, সে দিকের ঘাটটী একটু পরিষ্কার করিয়া তৈয়ার করেন। ঐ ঘাটের সম্মুখভাগে অগ্রে শিব-দুর্গার দুই দুটী মূর্ত্তি মাটীতে অঙ্কন করিয়া তাহাদের মস্তকে একটী গেঁঠে কড়ি (১), এক খণ্ড হলুদ ও এক খানা বা এক জোড়া শাঁখা স্থাপন করেন। তার পর ঐ শিবদুর্গার পদতলে শ্রেণীবদ্ধভাবে বারটী (২) পুত্তলিকা মাটীতেই আঁকিয়া লওয়া হয়।

কেহ কেহ ঐ পুত্তল বারটীর উপর বার গাছ দূর্ব্বা স্থাপন করেন, কেহ কেহ কিছুই দেন না। পুষ্করিণীর মধ্যে একখানা বেলের ডাল ও একখণ্ড শ্বেতচন্দন পুঁতিয়া জলপূর্ণ করিয়া দিতে হয়। তারপর ব্রতধারিণী স্বয়ং বসিয়া পুষ্করিণীর জলমধ্যে, ধর্ম্ম, বরুণ ও গঙ্গাদেবীর পূজা করিয়া, সম্মুখের ঘাটের উপর অঙ্কিত শিবদুর্গাকে পূজা করেন। পূজা শেষ হইলে কিছু আতপ চাউল ও বালি একসঙ্গে মিশাইয়া ঐ অঙ্কিত দ্বাদশটী পুত্তলের পদতলে এক একটী করিয়া দ্বাদশবার স্থাপন করেন এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিম্নলিখিত ভাবে বরপ্রার্থনা করিতে থাকেন—

আমি মরে' যেন মণিষ্যি হই,
বামনকুলে জন্ম লই,

---

(১) যে কড়ি ছোট ও বেশ পিলারকমের।
(২) কেহ কেহ ১০টী পুত্তলও অঙ্কন করিয়া লন।

কুন্তীর মত সুন্দরী হই,
কলাবতীর মত লজ্জাশীলা হই,
সাবিত্রীর মত সতী হই,
অন্নপূর্ণার মত রাঁধুনী হই,
যুধিষ্ঠিরের মত ধর্ম্মশীলা হই,
কর্ণের মত দাতা হই,
কুবেরের মত দাতা হই,
রামের মত পতি পাই,
দশরথের মত শ্বশুর পাই,
শিবের মত বাপ পাই,
দুর্গার মত মা পাই,
কার্ত্তিক, লক্ষ্মীর মত ভাইবোন পাই,
লবকুশের মত পুত্র পাই,
বাদলের মত বাড়িয়া যাই। ইত্যাদি ইত্যাদি ॥*

বর প্রার্থনা শেষ হইলে পুষ্করিণী মধ্যে প্রোথিত বেলডালখানি বাম হস্তদ্বারা ধারণ করতঃ দক্ষিণহস্তে পুষ্প, চন্দন ও পুষ্করিণীর জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিতে করিতে ঐ ডালের মাথায় ক্রমাগত তিন বার ঝরা দিতে হয়—

ধর্ম্ম পুকুর পুষ্পের ঝরা।
কে পুজিল দুপ'র বেলা ॥
আমি সতী লীলাবতী।
সাত ভাইএর বোন্ ভাগ্যবতী।
পতির কোলে পুত্র দোলে।
মরণ হয় যেন আমার গঙ্গাজলে ॥

ঝরা দেওয়ার পর পুষ্করিণীমধ্যস্থ সেই চন্দনখণ্ড উঠাইয়া লইয়া নিম্নের মন্ত্রটী আবৃত্তি করিতে করিতে অঙ্কিত শিব-দুর্গা মূর্ত্তিকে বাতাস দিতে হয়।—

সিন্দুরে জগ্‌ মগ্‌ চন্দনে বাও।
কোন বর্ত্তা পূজা করে শিব-দুর্গার পাও ॥
জন্মে ২ দেখি না যেন বন্ধু লোকের মরণ।
মরণ হ'লে পাই যেন শিব-দুর্গার চরণ ॥

---

* রঙ্গপুর অঞ্চলে ইহাকে "পুণ্যপুকুর" ও "দশপুতুল" ব্রত কহিয়া থাকে এবং এই কবিতাটী মন্ত্রের ন্যায়, ব্রতধারিণী কুমারী বা অকুমারী সধবা বা বিধবা নারী মাত্রেই পাঠ করিয়া থাকেন। "দশপুতুল" পুণ্যপুকুর" ব্রত প্রতিষ্ঠা করিলে জলাশয় প্রতিষ্ঠার ফল লাভ হয়, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। সভার সম্পাদক।

ইহার পরেই ব্রতী স্বয়ং ব্রত কথাটী আবৃত্তি করিতে থাকেন। শ্রোত্রী কেহ থাকিলে ভালই হয়। না থাকিলেও কোন ক্ষতির কারণ নাই। ব্রতধারিণী একাকিনী হইলেও চলে।

ব্রত কথা

এক বুড়ী বামনী! আর বেটার বউ "ধর্ম্ম পুকুর" বর্ত্ত (১) কর্ব্বে; পুকুর (২) খুঁড়িয়া নিয়েছে, পূজার সকল জোগাড় করিয়াছে, এমন সময় বুড়ী এসে পা দিয়ে লাথি মেরে পুকুর ভাঙ্গিয়া দিল। বউ কি করে? কলার বাগানের ভিতর গিয়ে আবার পুকুর তৈয়ারী করিল, পূজার সব জোগাড় আবার করিয়া লইয়া পূজায় বসিবে, এমন সময় বুড়ী সেখানেও গিয়ে বলিল "আবাগীর বেটী ছাই কপালী আবার এখানে আসিয়াও ঐ করিতেছিস্"? বুড়ী এই না বলে' আবার পুকুর ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বউটী না গিয়ে তখন পাকের আখার(৩) পাশে আবার পুকুর খুঁড়িয়া পূজার যোগাড় করিল এবং বৈশাখ মাস গোটাল (৪) সেইখানেই বর্ত্ত করিল।

দিনক্ষণ এল, বুড়ি কিছুদিন পর মরিয়া গেল। বুড়ি এদিক ওদিক ঘুরিয়া কোন জায়গায় জল পায় না, পিপাসায় কণ্ঠা শুকাইয়া আসে, জল জল করিয়া সর্ব্বদাই ঘুরে। উপায় না পেয়ে একদিন তার ছেলেকে স্বপন (৫) দেখাল যে "দেখ্ তোর বৌ ধর্ম্ম-পুকুর বর্ত্ত করেছিল, আমি পা দিয়ে তার পুকুর ভেঙ্গে দিয়েছিলাম, তাকে বর্ত্ত কর্ত্তে দেই নাই, সেইজন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি, কোথাও জল পাই না। তুই তোর বৌকে বলিস্ যেন আবার সেই বর্ত্ত করে, আর আমার নামে সেই ঘাট উৎসর্গ করিয়া দেয়, তবেই আমি জল পাইব।" ছেলে পরের দিন ভোরে উঠিয়া তার বৌকে সব কহিল, আর পূজার সব জোগাড় করিয়া দিল। বৌটী মন দিয়া পূজা করিয়া একমনে বসিয়া কথা শুনিল ও একটী ঘাট শাশুড়ির নামে উৎসর্গ করিয়া দিল। বুড়ী সেই হইতে জল পাইতে লাগিল।

এইকথাটী শুনা হইলে ব্রতধারিণী ঐ সাতটি ঘাটের একএকটি, আত্মীয়স্বজনের ও অন্যান্য জন এবং পশুপক্ষী ইত্যাদির নামে উৎসর্গ করিয়া দেন। স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ী, বাপ ও মা, গুরুদেব, দেবদেবী পশুপক্ষী ও প্রতিবেশী এই সাত নামে সাত ঘাট জলধারা উৎসর্গ করেন। এতদঞ্চলে এই প্রথার পালন পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহন মৈত্র।

(১) ব্রত। (২) পুষ্করিণী। (৩) উনুন। (৪) সম্পূর্ণ। (৫) স্বপ্ন।

মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী।

প্রথিতযশা মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীর উপাখ্যান অবলম্বনে দ্বিজ জনার্দ্দন কর্তৃক এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভটী পয়ার ও নাচারী ছন্দে বিরচিত। এদেশে মঙ্গলচণ্ডিকার ব্রতোপলক্ষে ঘরে ঘরে ইহা পঠিত হইয়া থাকে। রচনা সৌন্দর্য্যে পুঁথিখানি রচয়িতার উৎকৃষ্ট কবিত্ব শক্তির নিদর্শন। দুঃখের বিষয় অনুসন্ধিৎসু লোকের অভাবে জাতীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের যে এইরূপ কত অমূল্যনিধি কীটের করাল কবলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? দ্বিজ জনার্দ্দনের নামের ভণিতা ছাড়া গ্রন্থে গ্রন্থকারের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়ের সংগৃহীত একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথির মধ্যে ইহার কীটদষ্ট জীর্ণপত্র কয়েকখানি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিলুপ্তির আশঙ্কায় তাঁহার কুলপুরোহিত পূজ্যতম শ্রীযুক্ত গৌরীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় উহার একখানি প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন। সেই আধুনিক হস্তলিপি খানি সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বহু অনুসন্ধানেও প্রাচীন সম্ভবতঃ কবির স্বহস্ত লিখিত উক্ত পুঁথি খানির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

অথ পাঁচালী॥ ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং
দেবীং স্বরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥
আদি দেব নারায়ণ শঙ্কর চরণ।
বন্দিয়া মঙ্গলচণ্ডী করিনু স্মরণ॥
মঙ্গলচণ্ডিকা পদে কোটি নমস্কার।
মহামায়া রূপ দেবী ধরিছে সংসার॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী দেবী গৌরবর্ণ ধরা।
পট্টবস্ত্র পরিধান সুবর্ণ মেখলা॥
মণিময় সুরচিত মুকুট শোভে শিরে।
কণককুণ্ডল তার কর্ণে শোভা করে॥
গ্রীবায় শোভা করে গজমুক্তার হার।
স্থানে স্থানে শোভা করে দিব্য অলঙ্কার॥
অভয়া বরদা দেবী সকরুণ মন।
অনুগত জনে রক্ষা করে সর্ব্বক্ষণ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেব সুরপতি।
চরণে পড়িয়া যায় নিত্য করে স্তুতি॥

সহস্র বয়ানে গুণ কহিতে না পারে।
কি কহিতে পারি আমি মনুষ্য শরীরে ॥
পৃথিবীর রম্যস্থান উজানি নগরী।
নানা গুণময় দেবী জেন সুরপুরি ॥
বিক্রমকেশরি নামে তথাতে নৃপতি।
সেহি দেশে বৈশে সাধু নামে ধনপতি ॥
লহনা খুলনা তার এ দুই যুবতী।
রূপে গুণে অনুপামা পতিব্রতা সতী ॥
বিধির ঘটনা তার সাধুর বচনে।
খুলনারে নিয়োজিল ছাগল রক্ষণে ॥
ছাগল হারাইয়া নারী ব্যাকুলিত মন।
ব্যাকুল হইয়া ফিরে কাননে কানন ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নারী হইল মূর্চ্ছিৎ।
জোগারের শব্দ কোথা সুনে আচম্বিত্ ॥
জোগার উদ্দেশে চলে খুলনা যুবতী।
দেখিলেন ব্রতিগণ ব্রাহ্মণ সন্তুতি ॥
কোন্ ব্রত কর তোমা কিবা ইহার ফল।
মোর ঠাক্রি কথা সব কহ ব্রতিগণ ॥
সাবধান হইয়া শুন কহি যে তোমারে।
মঙ্গলচণ্ডীর পূজা যতেক প্রকারে ॥
অগ্রেতে পূর্ণিত ঘট প্রতি মঙ্গলবারে।
ধুপ দিপ নৈবেদ্য আর পুষ্প তারে তারে ॥
বস্ত্র অলঙ্কার দিবে রজত কাঞ্চন।
কুঙ্কুম কস্তুরি দিবে আগর চন্দন ॥
অষ্ট তণ্ডুল দুর্ব্বা দিবে ভক্তি সুরেশ্বরী।
ভক্তিতে পূজিবে দেবী চণ্ডিকা সুন্দরী ॥
কলিঙ্গ দেশের রাজা সহস্রাক্ষ নাম্।
পুত্রবতে পালে প্রজা গুণে অনুপাম্ ॥
কালকেতু নামে ব্যাধ বৈসে সেহি দেশে।
নিত্য মৃগ মারি নিজ পরিবারে পোষে ॥
ধনুকেতে গুণ দিয়া কান্দে করি বাড়ি।
বিন্ধ্যগিরি মধ্যে গেল মৃগ দেখে বাড়ি ॥

ব্যাধ দেখিয়া ভয়ে পলাইল মৃগগণ।
মঙ্গলচণ্ডির পায় লইল স্মরণ ॥
ব্যাধ দেখিয়া কৃপা হইল মহামায়া।
দারিদ্র নাশিনী দেবী হইল সদয়া ॥
সুবর্ণ গুধিকা রূপ ধরিয়া আপনে।
ব্যাধ পথ জুড়িয়া রইল তেইখানে ॥
মৃগ না পাইয়া ব্যাধ সচিন্তিত মন।
সুবর্ণ গুধিকা সনে হৈল দরশন ॥
ধনুকের গুণ দিয়া বান্ধিল যতনে ॥
সুবর্ণ গুধিকা পায়া হরসিত হাঁটে।
সত্বরে চলিয়া গেল বাড়ির নিকটে ॥
উচ্চস্বরে ডাকে পুন গৃহিণী গৃহিণী।
সত্বরে চলিয়া আইল ব্যাধের রমণী ॥
দেখা মাত্র ঘরেতে নিয়া থুইল গুধিকা
আপনার নিজ মূর্ত্তি ধরিল চণ্ডিকা ॥
দিব্যরূপ দেখি বলে মহাকালকেতু।
আমার গৃহেতে মাও আইলা কি হেতু।
মঙ্গলচণ্ডিকা বলে শুন ব্যাধবর।
তুষ্ট হইয়া দেখা দিলাম তোমার গোচর ॥
আজি হইতে ব্যাধ তোর হৈল শুভযোগ
বহুধন দিমু তোরে কর উপভোগ ॥
বিপদ হইলে মোকে করিও স্মরণ।
তোমার বাঞ্ছিত সিদ্ধি হবে ততক্ষণ ॥
এ কথা বলিয়া দেবী ব্যাধ বিদ্যমান।
জগত জননী দেবী হইল অন্তর্দ্ধান ॥
ধনের উন্নতি তার দুশাধে জানিয়া।
রাজার গোচরে ব্যাধ বন্দি হইল গিয়া ॥
বন্ধনে পড়িল ব্যাধ ব্যাকুলিত মন।
কান্দিয়া মঙ্গলচণ্ডি করিল স্মরণ ॥

পাঁচালি দীর্ঘচ্ছন্দঃ

কান্দে ব্যাধ সকরুণ মন, তুমি মোকে দিলা ধন,
তাতে কেন বিড়ম্বন, প্রাণ রাখ হইনু কাতর।

মনে অতি বাসী ডর, বন্দন অতি গুরুতর,
মোচন চণ্ডি করহ সত্বর ॥
মুঞি না দেখিব আর, স্ত্রীপুত্র পরিবার,
কামিনী আর না লইব কোলে।
মৃগগণের সাঁপে মোর, বিধি দিল দুঃখ ঘোর,
কান্দে ব্যাধ সকরুণ স্বরে ॥
কহে দ্বিজ জনার্দ্দন, স্তুন ব্যাধের নন্দন,
কালি হইবে তোমার মোচন।

॥ পদ ॥ না কান্দ না কান্দ ব্যাধ না করিবা শোক।
প্রভাতে হইবে তোমার বিমোচন দুখ ॥
রাজায় তোমারে দিবে বহুবিধ ধন।
অমাত্য করিয়া রাখিবে ব্যাধের নন্দন ॥
এ বোল বলিয়া দেবী ব্যাধ বিস্তমান।
জগতজননী দেবী হইল অন্তর্দ্ধান ॥
সহস্রাক্ষ রাজাতে দেবী করিয়া দরশন।
কহিতে লাগিল দেবী এ সব কথন ॥
কালকেতু নামে ব্যাধ মোর গৃহে দাস।
বন্দন মোচন কর পুরাও তার আশ ॥
এ বোল বলিয়া দেবী রাজা বিস্তমান।
জগতজননী দেবী হইল অন্তর্দ্ধান ॥
প্রভাতে উঠিয়া সহস্রাক্ষ রাজন।
বন্দি করিছিনু ব্যাধ করিনু মোচন ॥
অনেক প্রসাদ দিনু আর বহুধন।
অমাত্য করিয়া রাখিনু ব্যাধের নন্দন ॥
চলহ খুলনা তুমি আপনার স্থান।
তোমাতে কহিলাম আমি ব্রতের বিধান ॥
চলিল খুলনা তবে করিয়া প্রণতি।
হারাইয়াছিল ছাগল পাইল শীঘ্রগতি ॥
ব্রতের যতেক ফল প্রত্যক্ষ হইল।
নিজগৃহে আসি খুলনা ব্রত আরম্ভিল ॥
দায় হইতে মুক্ত হইল খুলনা যুবতী।
মঙ্গল চণ্ডীর বরে বাড়িল উন্নতি ॥

বাণিজ্যে চলিলা তবে সাধু ধনপতি।
স্বামির চরণে করিল অনেক মিনতি॥
আপনে চলিল প্রভু বাণিজ্য করিতে।
ছয় মাসের গর্ভ মোর জানাই তোমাতে॥
ছয় মাসের গর্ভ হইল জানি ধনপতি।
জানিবারে পত্র দিল হরসিত মতি॥
পুত্র যদি হয়ে নাম রাখিবা শ্রীপতি।
কন্যা যদি হয়ে নাম রাখিবা শ্রীমতী॥
উষালয়ে যাত্রা করি যাও ধনপতি।
সিংহ লয়ে চলি যাও রাজার সমতি॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরা করি যাও কুতুহলে।
ঝড়ি বায়ো হইল সেহি সমুদ্রেতে গেইল॥
পাক মধ্যে ফালাইল ডিঙ্গা চৌদ্দখান।
দেখি সাধু ধনপতির উড়িলেক প্রাণ॥
চণ্ডিকার ঘট সাধু করে খান খান।
সমুদ্রে ডুবিল তার ডিঙ্গা চৌদ্দখান॥
মঙ্গল চণ্ডীর দাসী খুলনা যুবতী
তেকারণে প্রাণরক্ষা পাইল ধনপতি।
সালবান রাজার রাজ্যের ভিতর।
উঠিলেক ধনপতি হৈয়া এক থবর॥
অদ্ভুত দেখিল সাধু সেই দেশে আসি।
এক কন্যা হস্তি গিলে পদ্মপত্রে বসি॥
অদ্ভুত দেখিয়া সাধু রাজাতে কহিল।
সৈন্যসনে আসি রাজা কিছু না দেখিল॥
ক্রোধ করি বলে তবে রাজা সালবান।
বন্দি করে সাধুক করিল সন্নিধান॥
তেকারণে চণ্ডীর ঘট করিল খান্‌খান্‌।
দ্বাদশ বৎসর হৈল সাধুর বন্ধন॥
এথা খুলনার ঘরে জন্মিল কুমার।
শ্রীপতি করিয়া নাম রাখিল তাহার॥
মাণিকের মালা গলে কুমার শ্রীপতি।
সব শিশু হইতে সেই বলবন্ত অতি॥

বলে না পারিয়া তবে সব শিশুগণ।
একত্রে হইয়া গালি দিলেন তখন ॥
বাপের নিয়ম নাহি জন্মিয়াছো জারে।
তব সনে না খেলিব চলি জাও ঘরে ॥
ইহাকে শুনিয়া তবে সাধুর কুমার।
মাথায় কাপড় দিয়া করিলে শয়ন ॥
মায়ে সতমায়ে তার বুঝিয়া লক্ষণ।
সেই পত্র আনি দিল শ্রীপতির স্থান ॥
শ্রীপতি পড়িয়া চায় সেই পত্রখান।
হরিষে বলয়ে মাও সতমায়ের স্থান ॥
বাপের উদ্দেশে আমি জাইব নিশ্চয়।
আমাকে বিদায় দেও না কর বিস্ময় ॥
চলিল শ্রীপতি তবে যাত্রা করিয়া।
অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা দিল শিরেতে বান্ধিয়া ॥
নৌকায় উঠিল কুমার নানা বাদ্য বাজে।
কতদিনে গেল সেহি সমুদ্রের মাঝে ॥
অদ্ভুত দেখিল কুমার সেহি দেশে আসি।
এক কন্যা হস্তি গিলে পদ্মপত্রে বসি ॥
অদ্ভুত দেখিয়া কৌতুক হৈল মনে মনে।
রাজাতে কহিল গিয়া এ সব কথনে ॥
সৈন্য সনে চলে রাজা কুমার বচনে।
কিছু না দেখিয়া কোপ হৈল মনে মনে ॥
অতিকোপে চলে তবে রাজা সালবান।
কাটে কাটো শিশু নিয়া হৈলা সন্নিধান ॥
শঙ্কট দেখিয়া তবে সাধুর নন্দন।
কান্দিয়া মঙ্গলচণ্ডী করিল স্মরণ ॥
যেনমাত্র স্মরণ করিল শ্রীপতি।
অব্যাহতি করিতে আসিল ভগবতী ॥
সালবান রাজাকে দেবী করিয়া দরশন।
কহিতে লাগিল দেবী এ সব কথন ॥
মোর পুত্রের দাসী জানে [illegible] যুবতী।
তাহার [illegible] জান কুমার শ্রীপতি ॥

যদি প্রাণরক্ষা চাও রাজা সালবান।
অর্দ্ধেক রাজ্যসনে কন্যা শ্রীপতিক কর দান ॥
আপনার গৃহে আছে যত বন্দিগণ।
শ্রীপতির সনে সব করিমু মোচন ॥
কিছু কহিতে নারি দৈবের লিখন।
ধনপতি শ্রীপতি হৈল দরশন ॥
পিতায় পুত্রে গলাগলি পরিচয় দিয়া।
পরিচয় দিল পাও দণ্ডবৎ হইয়া ॥
নৌকায় কুমার চড়ে নানা বাদ্য বাজে।
কতদিনে গেল সেহি সমুদ্রের মাঝে ॥
ধনপতি বলে শুন শ্রীপতিকুমার।
এহিখানে চৌদ্দডিঙ্গা ডুবিছে আমার ॥
শ্রীপতি মঙ্গলচণ্ডী করিল স্মরণ।
জলহৈতে চৌদ্দ ডিঙ্গা উঠে ততক্ষণ ॥
আনন্দিত হৈল সাধু দেখি নৌকা সব।
সেইখানে পূজাদান কৈল মহোৎসব ॥
মহোৎসব করি তবে আনন্দ করিয়ে।
পুত্রসনে সাধু আইল আপনার দেশে ॥
পুত্রসনে ধনপতি আসিল শুনিয়া।
লহনা খুলনা আইল ধূপ দীপ লৈয়া ॥
দ্বাদশ বৎসরে আসিল ধনপতি।
স্ত্রী পুত্র সখি সব হরষিত মতি ॥
ইহাকে শুনিয়া রাজা বিক্রমকেশরী।
শ্রীপতিকে দিল নিয়া আপন কুমারী ॥
মঙ্গলচণ্ডীর পুথি জে ঘরেতে কহে।
অগ্নি চোর আদি করি কিছু নাহি ভয়ে ॥
বিবাহ কামনা করি জে করে ভকতি।
উত্তম পতি বর দেন ভগবতী ॥
শ্রীভ্রষ্ট হয় যেবা নিগড় বন্ধন।
এহি প্রস্তাব শুনিলে হয় দুঃখ বিমোচন ॥
মঙ্গলচণ্ডির দাস কহে জনার্দ্দন।
পাচালি প্রবন্ধে গান অদ্ভুত কথন ॥ ইতি মঙ্গলচণ্ডিকা পাচালী সমাপ্ত।

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।

রঙ্গপুরের ভাওয়াইয়া গান।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় মহাশয় রঙ্গপুরের জাগের গান সংগ্রহ করিয়া মহোপকার সাধন করিয়াছেন ও ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমিও রঙ্গপুরের 'ভাওয়াইয়া গান' গুটিকতক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি বলিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি। ভাওইয়া গান কি, তাহা মহামহোপাধ্যায় মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ গানগুলিতে অশিক্ষিতা প্রেমিকা অবলাগণের কোমলহৃদয়োত্থিত অসহায় করুণ-ক্রন্দনের একটী জীবন্ত প্রতিকৃতি দেখিতে পাইবেন। গানগুলি যেমন স্বাভাবিক, সেইরূপ কেমন যেন একটা মিষ্টতায় পরিপূর্ণ; অথচ গানগুলিতে সেরূপ কবিত্ব বা সেরূপ শব্দ-সম্পদ নাই। উন্মুক্ত প্রান্তরে নৈশনিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া দীর্ঘ করুণকণ্ঠে যখন কৃষকেরা এই সুললিত অথচ আভরণ-ভার-হীন গীতগুলি গাহিতে থাকে, সেই দূরাগত সকরুণস্বর-লহরী মৃদুহিল্লোলে কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া আনন্দ মিশ্রিত সমবেদনায় হৃদয়ের অন্তঃস্থল উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সে মধুরতা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, মুখে বলিলে শেষ হয় না। যিনি শুনিয়াছেন, তিনিই মোহিত হইয়াছেন। ধন্য কৃষক কবি! ধন্য তোমার সরল হৃদয়োত্থিত সরল গীত-সুধা! যে সুধা কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া অতি বড় সভ্যতাভিমানীকেও পাগলপারা করিয়া তোলে।

অশিক্ষিত দরিদ্র কৃষককে বুঝিতে হইলে, তাহাদের গীত-রত্নগুলিকে সাহিত্য-ভাণ্ডারে স্থান দেওয়া প্রয়োজন। তাহাদের যত কিছু প্রাণের কথা, হৃদয়ের ব্যথা—গীত ব্যতীত প্রণয়পত্রে বা আবেদনে প্রকাশ পায় না। সুতরাং তাহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে হইলে তাহাদের হৃদয়-দর্পণ-রূপ-গীতগুলির প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয়। তাই আমরা এই গীতগুলি বিশেষ আগ্রহ সহকারে সংগ্রহ করিয়া বিদ্বজ্জন-সমাজে উপস্থিত করিতে সাহস করিতেছি।

১।

নাখাই[১] তোর দুয়ারে[২],
খাই তোর পানরে,
না করো[৩] তোর বৈদেশী পিরীতিরে॥
বদেশী পিরীতি রে—
টীর কলসী রে,
ভাঙ্গি গেইলে[৪] না লাগিবে জোড়া রে॥
তুর হাতে[৫] আইল[৬] ভারী[৭],

১। নাখাই—খাইবনা। ২। দুয়া—দুয়ারি। ৩। নাকরো—করিব না। ৪। গেইলে—গেলে। ৫। হাতে—হইতে। ৬। আইল—আসিল। ৭। ভারী—ভারবহনকারী।

কথা পুছোঁ[৮] মুঞ্ এ সারাসারি[৯],
কও তারি মোর কালা কেমন আছে ॥
মোর কালা মানুষ তাল্[১০]
না বুঝে কালা সঞ্ঝাকাল্
না বুঝে একলা নারীর কাম রে ॥
ঢেঁকিকো কাটিম্ রে,
ছাইলকো[১১] পুতিম্ রে,
কেম্নি[১২] শুনিম্[১৩] মুঞ্ এ চ্যাংড়া[১৪] বন্ধুর গানরে ॥
মোর কালা খাইবে ভাত,
কোট্‌ঠে[১৫] পাইম্[১৬] মুঞ্ এ কলারপাত,
কোট্‌ঠে পাইম্ মুঞ্ এ জীয়া[১৭] মাগুর মাছরে ॥

প্রেমিকা বিদেশগত প্রেমাস্পদের জন্ম জ্বালাতন হইয়া অভিমান মিশ্রিত কাতরতায় বলিতেছে "তোর গুয়া পান খাইবনা; তোর মাটীর কলসীর ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর পিরীতে আর কাজ নাই।" লৌকিকতা হিসাবে 'পান গুয়া' খাওয়ার সম্বন্ধও আর প্রেমিকা রাখিতে চাহিতেছে না। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে—অভিমান আর কতক্ষণ রহে? যখন উত্তরস্থিত প্রেমাস্পদের নিকট হইতে ভারবহনকারী আসিল, তখন তাহার হৃদয়ের কপাট অকস্মাৎ উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং তাহাকে তাহার ঈপ্সিতের জন্ম কথার উপর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তারপর প্রেমিকার পূর্ব্বস্মৃতি মনে হইল। প্রেমিকবর সময় অসময় মানিত না, এমন কি সন্ধ্যার যখন বিষম কাজের ঝঞ্ঝাট, তখন একলা নারীর কাজের বিষয় না ভাবিয়া তাহার প্রাণ মন বিমোহনকারী মধুর গীত গাইয়া প্রেমিকাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত; ঢেঁকির শব্দে, ছেলের ক্রন্দনে সে গীত ভাল শুনা যাইত না; তখন প্রেমিকার মনে হইত, হায়! ঢেঁকিকে কাটিয়া ও ছেলেকে পুঁতিয়া ফেলে, তবুও ছোকরা বঁধুর গান শুনিয়া শ্রবণ পরিতৃপ্ত করে। যখন তাহার কালা গোপনে তাহার নিকটে আসিত, তখন যদি তাহাকে ক্ষুৎ-পিপাসাতুর দেখা যাইত, তখন প্রণয়িনীর বুক ফাটিয়া যাইত কিন্তু মুখ ফুটিতে পাইত না। মনে হইত বঁধুকে ভাত খাওয়াইবার জন্ম কলার পাত ও জীবন্ত মাগুর মাছ এখন কোথায় পায়। হায়! কি অসহায় মর্ম্মযাতনা।

২। বক[১] বইয়া পড়ে নারীর বাম রে।
যে জন বঁধুয়া হবে,

৮। পুছোঁ—জিজ্ঞাসা করি। ৯। সারাসারি—শ্রেণী শ্রেণী, রকম রকম। ১০। তাল্—তাল।
১১। ছাইলকো—ছেলেকেও। ১২। কেম্নি—কেমন করে। ১৩। শুনিম্—শুনিব।
১৪। চ্যাংড়া—ছোকরা। ১৫। কোট্‌ঠে—কোথায়। ১৬। পাইম্—পাইব। ১৭। জীয়া—জীবন্ত।
১। বক—বকফুল।

ঘাম মুছিয়া কোলে লবে,
বক্ষ বইয়া পড়ে নারীর ঘামরে ॥
শাক তোলোঁ[2] মুঞ্‌ঞ নাতারি রে[3],
শাক তোলোঁ মুঞ্‌ঞ পাতারি রে,
আজি শাক তোল মুঞ্‌ঞ বাড়ীর চতুর্দ্দিগেরে ॥
এক নোটা তুলিতে,
ফির নোটা ভরিতে,
ওরে ছিঁড়ি পইল্‌ মোর গলার চন্দ্রহার রে ॥
মাও নাই যে বলিম,
ভাই নাই যে কহিম,
আজি কে তুলিয়া দিবে গলার চন্দ্রহার রে ॥

প্রেমিকা প্রণয়প্রার্থীকে কৌশলে হৃদয়ের প্রেম জানাইতেছে এবং ঘাম মুছাইয়া চন্দ্রহার তুলিয়া দিবার ভাণ করিয়া প্রেমে প্রণয়ীর সম্মতি আছে কি না, কৌশলে জানিতে চাহিতেছে। কৌশলে ইহাও জানাইতেছে যে তাহার মা বা ভাই কেউ নাই, সে একাকিনী অতএব ভয়ের কোন কারণ নাই।

৩। প্রাণ বঁধুরে—

আসিনো কার্ত্তিকো মাসে,
গোম পরিবা ক্ষেতে ক্ষেতে,
বতর[1] গেলে কি করিমে চাষেরে ॥
উজানি[2] দুপুর বেলা,
ভোক[3] লাগে বন্ধু এলা সেলা,[4]
ভোক বাঁতি[5] গেলে না লাগে ফিরিবা ॥
তোমরা যাইবেন দূর দেশ,
না করেন বন্ধু পরার আশ,
আপন হস্তে আন্ধি[6] খান্‌ ভাত ॥
কোঁহার কড়ি সাধু না করেন ব্যয়,
পরার নারী সাধু আপন নয়,
আপন হস্তে আন্ধি খান ভাত ॥

২। তোলো—তুলিতেছি, তুলি। ৩। 'নাতারি' এবং দ্বিতীয়ের পাতারি—লতাপাতাযুক্ত। যার ঝিলে।

১। বতর—সময়। ২। উজানি—উঠ্‌তি। ৩। ভোক লাগে—ক্ষুধা পায়। ৪। এলা সেলা—এখনতখন

৫। বাঁতি গেলে—অতীত হইয়া গেলে। ৬। আন্ধি—রান্ধি, রন্ধন করিয়া।

তোম্‌রা যাইমেন পরবাস৭,
যরে উইয়া৮ বন্ধু ফুলের গাছ,
ফুলের নোতে ভোম্‌রা৯ পাক পাড়েরে॥
দাঁড়ি মাঝি যোল বন
না বলেন সাধু দুর্ব্বচন,
মুখের প্রেমে নৌকা বয়া যাবেন হে॥
পুবিয়া পচ্ছিয়া বাও,
ঘোপা১০ চা'য়া সাধু আটকান নাঁও,
মুখের প্রেমে নৌকা বয়া যাবেন হে॥
আইস্‌তে যাইতে বছর বারো,
এ যৌবন কি রাখতে পারেঁ।
থাকেন কন্যা ঈশ্বর ভাবিয়া॥

পাঠক দেখিতে পাইবেন, শিক্ষিত প্রধান কবি বঙ্কিমচন্দ্রের সূর্য্যমুখীর ন্যায় আমাদের নিরক্ষর কৃষক কবি তাঁহার নায়িকার দ্বারা নৌকায় গমনশীল স্বীয় স্বামীকে উপদেশ দিতেছে। ভরা যৌবন কালে দীর্ঘকাল স্বামী বিচ্ছেদ থাকা যে কি কষ্টকর তাহা মনে করিয়া নায়িকা বলিতেছে যে, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসেই গম শরিসা শস্যের সময়; অসময়ে চাষ দিলে কোনই ফল হইবেনা। উঠ্‌তি দুপ্রহর বেলায় যখন তখন ক্ষুধা পায়, কিন্তু ক্ষুধা মরিয়া গেলে, তৃষ্ণা পর্য্যন্ত থাকেনা। সেইরূপ ভরা যৌবনে স্বামী সম্ভোগে বঞ্চিত হইলে, বিগত যৌবনে উপভোগ লালসা সেরূপ থাকিবে না। সে কথা তাহার মনে করিতেও কষ্ট হইতেছে। আর প্রাণেশ্বরের বিপদাশঙ্কায় নায়িকা বলিতেছে—তুমি যার তার হাতে ভাত খাইও না, ও মূলধন ব্যয় করিও না, পর নারী আপন নয়, কি জানি সে যদি সর্ব্বনাশ ঘটায়। আর তোমার নৌকার সঙ্গীগণকে দুর্ব্বচন বলিও না, মিষ্ট কথায় কাজ করিয়া লইবে। পুবিয়া পশ্চিমা বাতাস দেখিলে নদীর 'ঘোনায়' নৌকা যেন অবশ্য অবশ্য বাঁধিও। বঙ্কিমের সূর্য্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া নগেন্দ্রনাথকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "দেখিও নৌকা সাবধানে লইয়া যাইও, তুফান দেখিলে লাগাইও, ঝড়ের সময় নৌকায় থাকিও না।" আমাদের কৃষক কবি এটুকু তো বলিয়াছেন, অধিকন্তু আরও নানা প্রকারে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। স্বামী গেলে নায়িকা আশঙ্কান্বিত হৃদয়ে নিজের বিষয় ভাবিতেছে—এ ভরা যৌবনে তো অনেক প্রেমিক ভ্রমরের আমদানী হইবে, তখন কি করিব? হৃদয়ের বল রাখিতে পারিব তো? এক দিন নয়, দুই দিন নয়, বার বার বৎসর স্বামী বিচ্ছেদ। হে ঈশ্বর! হে অবলা বান্ধব! আমার হৃদয় বল অটুট রাখ, আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম বজায় রাখে, আমি কাতর প্রাণে তোমারই চরণ প্রান্তে আত্ম সমর্পণ করিলাম।

৭। পরবাস—প্রবাস। ৮। উইয়া—রোপণ করিয়া। ৯। ভোম্‌রা—ভ্রমর। ১০। ঘোপাচায়া—ঘোপা দেখিয়া।

স্বামী বিচ্ছেদ ভীতা, মর্ম্মপীড়িতা, আশঙ্কিতা সাধ্বী নারীর কি উজ্জ্বল চিত্র!

৪। কুকিলার[১] কুহু কুহুরে,—
(আরে মোর) মইওরের ফ্যাকম,[২]
কোন দেশ থাকিয়া ও মোর বন্ধু দেখালু স্বপন।
বালাই দেঙ[৩] তোর পিরীতের মাথাতরে॥

ধন কাঙ্গালী সাউধের[৪] ছাইলারে[৫]—
(আরে মোর) ধনক্[৬] নাইগা[৭] মন,
ঘরে থুইয়া ও কাঞ্চা সোনা (ও মোর বন্ধু) বৈদেশে গমন।
বালাই দেঙ্ পিরীতের মাথাত রে॥

গছ মধ্যে শিমিলার[৯] গছরে[৮],
(আরে মোর) সরগে[১০] ম্যালেরে ডাল,
নারী হ'য়া এ যৌবন (ও মোর বন্ধু) রাখিম্ কতকাল।
বালাই দেঙ্ তোর পিরীতির মাথাত রে॥

কোকিল রব কুহুরিত, ময়ুর পেখম বিরাজিত কোন্ সুদৃশ্য স্বপ্নরাজ্য হইতে বঁধু স্বপন দেখাইল পোড়া পিরীতের মাথায় এখন বালাই দিতে ইচ্ছা করে। তুমি সাধুর ছেলে ধনের কাঙ্গাল বট, কিন্তু আমার ধনে মন নাই, তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন।

যদি তুমি এতই ধনের কাঙ্গাল, আমিও তো কাঁচা সোণা, ইহা কি ধন নহে? তবে এ ধন ছাড়িয়া ছার ধনের জন্য বিদেশ গিয়াছ কেন? টাকা কড়িই কি তোমার সর্ব্বস্ব আমি কি কেহই নহি? হায়! না বুঝিয়া এমন নিঠুরের সনে প্রেম করিয়াছিলাম, এখন প্রেমের মাথায় বালাই দিতে ইচ্ছা হইতেছে। বৃক্ষের মধ্যে যেমন শিমুল বৃক্ষ অত্যুচ্চ হইয়া স্বর্গের দিকে শাখা বিস্তার করে, সেইরূপ আমিও যৌবনের সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করিতেছি; আমার বাসনা বহু বিস্তৃত, কিন্তু এ যৌবন আর কতকাল রাখিতে পারিব বা থাকিবে? বিগত যৌবন হইলে বঁধু ফিরিয়া আর কি করিবে? হায় পাষাণ! অর্থোপার্জ্জনই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য, আমার কথা একবার ও ভাবিতেছ না। উঃ হঃ কি যন্ত্রণা! এমন হৃদয় হীনের সঙ্গে পিরীতি করিতে যাইয়া আমার সর্ব্বস্ব নষ্ট হইল। তাই বলিতেছিলাম, এমন পিরীতের মাথায় বলাই দিতে ইচ্ছা করে।

এমন মর্ম্মস্পর্শী বিরহগাথা যে কৃষককবি কর্ত্তৃক গ্রথিত হইয়াছে, তাহার হৃদয় ও অনু-

১। কুকিলার—কোকিলের। ২। মইওরের ফ্যাকম—ময়ুরের পেখম। ৩। দেঁঙ্—দেই।
৪। সাউধের—সাধুর। সাউকারী করে বলিয়া সাধু, সাহ পরে সাহা হইয়াছে। ৫। ছাইলা—ছেলে।
৬। ধনক্—ধনকে। ৭। নাইগা—লাগিয়া। ৮। গছ—গাছ। ৯। শিমিলার—শিমুলের।
১০। সরগে—স্বর্গে।

ধাবন শক্তি কিরূপ উচ্চ ও কিরূপ মধুর তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই সকল অমূল্য রত্ন যত্নাভাবে পল্লী অরণ্যেই বিলীন হইতেছে। কেহ তাহার খোঁজ লয় না।

৫। নদীর পাড়ত্ বটের গাছ,
ঐটৃঠে বন্ধুয়া মারে মাছ,
ওরে কিসের আঙিনা সাম্‌টিম্ মুই।
এক নজর দেখি আইসোঙ্ মুঞ্ঞ॥
বন্ধুয়া যাইবে পাকের হাট,
কিনিয়া আনিবে নাকের নত,
ওরে কিসের বিছনা করিম্ মুঞ্ঞ।
এক নজর দেখিয়া আইসোঙ্ মুঞ্ঞ॥
বন্ধুয়া যাইবে পোড়ারহাট,২
কিনিয়া আনিবে ছাপরখাট,
কিসের বারা বানিম্ মুঞ্ঞ।
ওরে এক নজর দেখিয়া আইসোঙ্ মুঞ্ঞ॥

অশ্বত্থবৃক্ষ-মূলে বঁধুয়াকে মৎস্য ধরিতে দেখিয়া প্রণয়িণী যৎপরনাস্তি চঞ্চলা হইয়া পড়িয়াছে তাহার আর গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ হইতেছে না। এক এক বার কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে, আবার ধাবিত হইয়া বঁধুয়াকে দেখিয়া আসিতেছে। প্রণয়ী হাট হইতে ছাপরখাঠ ও নাকের নত কিনিয়া আনিবে বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছিল, সেকল মনে করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছে?

প্রণয়ী দর্শনেচ্ছুকা চঞ্চলা নায়িকার একটী সুন্দর চিত্র! (ক্রমশঃ)

শ্রীহরগৌপাল-দাস কুণ্ডু।

২। উত্তরবঙ্গ রেলষ্টেসনের সৈয়দপুরের সন্নিকটে বোতলাগাড়ী গ্রামে এই হাট এখনও বসিয়া থাকে।

উত্তর বঙ্গের পুরাতত্ত্বানুসন্ধান।

১২ নং চিত্র।

দিনাজপুর, পত্নীতলা থানার নিকটে প্রাপ্ত বৌদ্ধচৈত্য।

১৩১৫, ৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা পত্রিকার ৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রথম পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা।

১৩ শ চিত্র। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক সংগৃহীত মুদ্রার চিত্র। ১৩১৪, ৩য় ভাগ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা পত্রিকায় দ্রষ্টব্য।
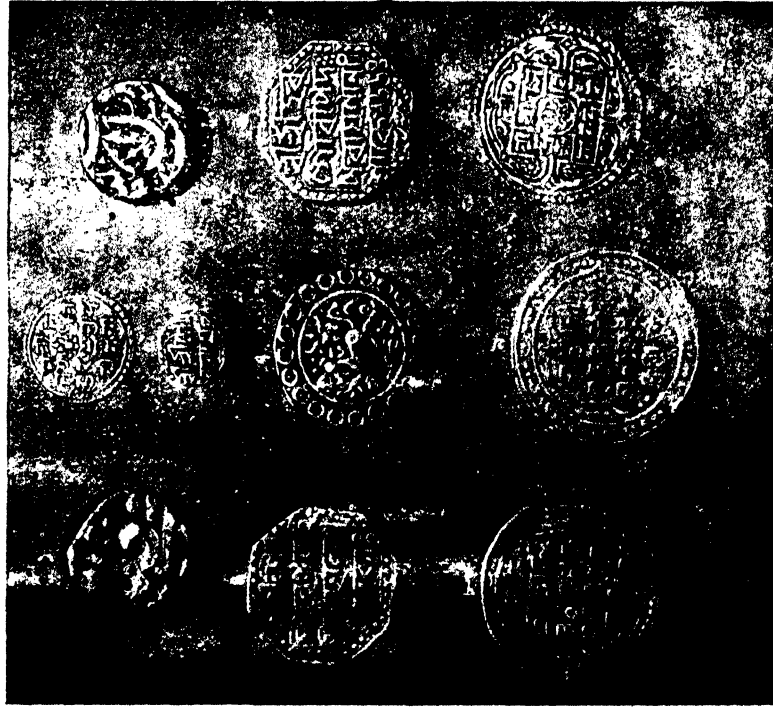
উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বানুসন্ধান।*

উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বের সঙ্গে সমগ্র বঙ্গদেশের পুরাতত্ত্বের সংস্রব;—কেবল তাহাই নহে,—সমগ্র ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাহিরের নানা দূরদেশের পুরাতত্ত্বের সংস্রব আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ অবস্থায়, উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্ব সঙ্কলন নিতান্ত অনায়াস-সাধ্য সহজ ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যাঁহারা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাঁহাদিগকেই মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

অনুসন্ধানকার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের কোন কোন স্থানে এক নূতন আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। তাহা সর্ব্বথা স্বাভাবিক হইলেও, সহসা সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। বহু বৎসর ধরিয়া, বহু লোকে বহু পথে বহু চেষ্টায় ধাবিত হইলে, কিছু কিছু পুরাতত্ত্ব সঙ্কলিত হইতে পারে। সেই আশায় উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনেই সদস্যগণ নানাস্থানের সাহিত্যিকগণের সমবেত চেষ্টা প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য একটি শুভ সংকল্পের স্বস্তিবাচন করিয়াছেন।

যাঁহারা সে শুভ সংকল্পের সহায় হইবেন, তাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ প্রবল থাকিলে, কালে অনুসন্ধানকার্য্য প্রকৃতপথে পরিচালিত হইতে পারিবে। সম্প্রতি যাহা কিছু হইতেছে তাহা বিচ্ছিন্নভাবে বিবিধ পথে বিচিত্র বিবরণ সঙ্কলনেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কোন্ পথ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-প্রণালীর সুপরিচিত প্রকৃতপথ, তাহার আলোচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্ব সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইবামাত্র অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিকযুগের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন্ যুগে উত্তরবঙ্গের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার তথ্য নির্ণয় করিতে হইলে, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিকযুগের মূলপ্রকৃতির অনুসন্ধান করিতে হইবে। তৎসম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রচলিত হইয়াছে, তাহাই একমাত্র সিদ্ধান্ত বলিয়া মানিয়া লইলে, তথ্যনির্ণয়ে বাধা উপস্থিত হইতে পারে।

একালের ন্যায় সেকালের জনসমাজের আচারব্যবহার এবং শাসনপ্রণালী এত খরবেগে পরিবর্ত্তিত হইত না; রাজা বা রাজবংশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে লোকব্যবহার বা শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইত না। কেবল ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তনে সময়ে সময়ে কর্ম্মকাণ্ডের পরিবর্ত্তন এবং তদনুরূপ লোকব্যবহারের পার্থক্য প্রচলিত হইত। কিন্তু তাহাতেও ঐতিহাসিক তথ্যের মূলপ্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইত বলিয়া বোধ হয় না। ইহাই ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের পুরাতত্ত্বের অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব। তাহা কত দিন

---

* বগুড়ার সাহিত্য-সমিতির চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত।

পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল; কোন্ সময় হইতে, কিরূপ ঘটনাসূত্রে, তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে আরম্ভ করে; তাহাই এ দেশের পুরাতত্ত্বের প্রধান কথা। তাহা স্মরণ রাখিয়াই তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

আর্য্য-বিজয়যুগে উত্তরবঙ্গের অবস্থা কিরূপ ছিল,—তৎকালে এ দেশে কাহারা কিরূপভাবে বাস করিত,—তাহাদের দেশে কিরূপ ঘটনাসূত্রে আর্য্যপ্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল,—তাহার অপ্রতিহত প্রভাবে উত্তরবঙ্গে কিরূপ সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করিয়া, জনসমাজকে কতদূর সমুন্নত করিয়া তুলিয়াছিল,—তাহার কথাই সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। তাহা অবশ্যই নিরতিশয় কৌতূহলের ব্যাপার। সে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উপায় আছে কি না, তাহার যথাযোগ্য অনুসন্ধানকার্য্য আরব্ধ হয় নাই!

সেকালের অট্টালিকাদি বর্ত্তমান থাকিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই, সেকালের পুরাতত্ত্ব সঙ্কলনের কিছুমাত্র উপকরণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই,—এরূপ সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করা যায় না। অট্টালিকাদি একমাত্র উপকরণ নহে। তাহা অল্পকালেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়;—একযুগের জনসমাজকে গঠন-গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া, অন্য যুগের জনসমাজের সম্মুখে ভূগর্ভনিহিত লোষ্ট্রখণ্ডরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে! সুতরাং তাহাকেই একমাত্র উপকরণ বলিয়া স্বীকার করিলে, মানব-সমাজের অধিককালের পুরাতত্ত্ব সঙ্কলনের সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া যায়।

ভাষার ভিতর দিয়া, সাহিত্যের ভিতর দিয়া, লোকব্যবহারের ভিতর দিয়া, শিল্পবাণিজ্যের ভিতর দিয়া, শাসনব্যবস্থার ভিতর দিয়া, নানা পুরাতত্ত্বের সন্ধান লাভ করা যায়। উত্তরবঙ্গে আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইবার কালনির্ণয় করা অসম্ভব হইলেও, সে সভ্যতার মূলপ্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহার নানা তথ্য সঙ্কলিত হইতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার যথাযোগ্য অনুসন্ধানকার্য্য আরব্ধ হয় নাই! আর কিছু না হউক, সমগ্র সংস্কৃতসাহিত্যে বঙ্গদেশের কোন্ বিভাগের কিরূপ উল্লেখ ও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে,—এ পর্য্যন্ত তাহাও একত্র সঙ্কলিত হয় নাই! *

উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিকগণের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃতশাস্ত্র-সমুদ্রের পারদর্শী বলিয়া সুপরিচিত। তাঁহারা এই সকল বিষয়ের সঙ্কলনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, অল্পায়াসে অনেক পুরাতত্ত্ব সঙ্কলিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদিগকে ইহাতে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য কেহ সমুচিত উৎসাহদান না করিলে, ফললাভ করিবার আশা নাই। বিদ্যোৎসাহী ধনাঢ্যগণ ইহার জন্য যৎকিঞ্চিৎ ত্যাগস্বীকার করিতে সম্মত হইলেই, ইহা অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে।

যখন দক্ষিণবঙ্গ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল, স্থানে স্থানে দুই চারিটি নবোদ্গত দ্বীপমাত্রই দৃষ্টিগোচর হইত, তখনও উত্তরবঙ্গে আর্য্যসভ্যতা বর্ত্তমান ছিল এবং এ দেশ একটি সমৃদ্ধ

* বৈদিকসাহিত্যে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, বৈদিকযুগের প্রারম্ভেই এ দেশে আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়া থাকিবে।

দেশ বাসীরাও সুপরিচিত ছিল। সে সমৃদ্ধির মূলে শিল্পবাণিজ্যের সংস্রব বর্ত্তমান থাকায়, তাহার কথা নানা পুরাতনগ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে এদেশে এক অনির্ব্বচনীয় স্বাতন্ত্র্য-লিপ্সা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতেই এদেশের শিক্ষা দীক্ষা এবং লোক ব্যবহার আর্য্যাবর্ত্তের শিক্ষা দীক্ষা এবং লোকব্যবহারের অনুকরণমাত্র বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। মূল সূত্রের সহিত অবিচ্ছিন্ন সংস্রব বর্ত্তমান থাকিলেও, সেকালে প্রাচীর সহিত প্রতীচির পার্থক্যের অভাব ছিল না। সেই পার্থক্যই এ দেশের বিশেষত্ব-বিজ্ঞাপক ঐতিহাসিক তথ্য। সমগ্র সংস্কৃত এবং পালি সাহিত্য হইতে তাহা একত্র সংকলিত হইলে, এ দেশের আর্য্যবিজয় যুগের পুরাতত্ত্ব সংকলনের পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে। তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।*

এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; কোন্ গ্রন্থ প্রমাণরূপে স্বীকৃত হইতে পারে, তাহারও মীমাংসাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের পুরাতন সংস্রবের কথা স্মরণ করিয়া, ভাষার ভিতর দিয়া, রচনা প্রণালীর ভিতর দিয়া, নানা তথ্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে। উত্তরবঙ্গের বিবিধ সাহিত্যসভায় ইহার কথা পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইলে, অল্পকালের মধ্যেই যথাযোগ্য অনুসন্ধান প্রণালী আবিষ্কৃত ও প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে। কেহ কি তাহাতে বিশেষ ভাবে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বৌদ্ধবিজয়যুগের ইতিহাস সংকলনের জন্যও যথাযোগ্য আয়োজন হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যে যুগের আত্মত্যাগপরায়ণ শ্রমণগণের অক্লান্ত প্রচার চেষ্টায় ভারতীয় জ্ঞান-সাম্রাজ্য নিকট হইতে দূরে—দূর হইতে সুদূরে—ভারতবর্ষের বাহিরে দেশদেশান্তরে দ্বীপদ্বীপান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে যুগের প্রচার কার্য্যের সঙ্গে বঙ্গবাসিগণের সংস্রব নিতান্ত অল্প ছিল বলিয়া বোধ হয় না। যে সকল স্থানে সমুদ্রপথে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার সহিত বঙ্গদেশের বিবিধ স্থানের সংস্রব বর্ত্তমান থাকিবার প্রমাণ পরম্পরার অভাব নাই। জলপথের ন্যায় স্থলপথেও নানা প্রাচ্যরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত করিবার আয়োজন হইয়াছিল। তাহাতেও এ দেশের লোকের সংস্রব বর্ত্তমান ছিল। তাহার বিশেষ বিবরণ সংকলিত করিতে হইলে, ভারতবর্ষের বাহিরে বিবিধ দূরদেশ গমন করিয়া, তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইতে হইবে। আপততঃ তাহা অনায়াসসাধ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না, সে পথে বাধাবিপত্তির অভাব নাই;—তাহাতে অগ্রসর হইয়া সফলকাম হইবার যোগ্যতা এখনও অনধিগত রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু উত্তরবঙ্গের বিবিধ বিভাগে বৌদ্ধবিজয়যুগের যে সকল কীর্ত্তিচিহ্ন অদ্যাপি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার আলোচনা কার্য্যেও আমরা যথাযোগ্য আগ্রহের সঙ্গে হস্তক্ষেপ করি নাই। সময়ে সময়ে নানা কীর্ত্তিচিহ্ন আবিষ্কৃত হইতেছে;—তাহা লইয়া পাশ্চাত্য সুধীসমাজে তর্ক

* পালি সাহিত্যেও প্রসঙ্গক্রমে আর্য্যবিজয় যুগের তথ্য লাভ করা যায়।

বিতর্কের সূত্রপাত হইতেছে;—আমরা তাহার সন্ধান লাভের জন্যও আগ্রহ প্রকাশ করি না!

বৌদ্ধবিজয়যুগের প্রথম উদ্যমেই উত্তরবঙ্গে নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার সূত্রপাত হয়। কিন্তু এদেশে আসিয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম সহসা বিজয় লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি, এক সময়ে এ দেশের রাজা শশাঙ্কের উৎপীড়নে বৌদ্ধগণের বোধিদ্রুম পর্য্যন্ত ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছিল। * মহারাজ চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মাশোক বোধিদ্রুম রক্ষার্থ তাহার চারিদিকে প্রস্তর প্রাচীর রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। কালে সংঘর্ষ বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল; সমগ্র উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধাচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; সকল স্থানেই চৈত্য বিহার ও সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখনও তাহার নানা ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। হিয়াঙ্‌থ্‌সাঙ্গ এই সকল বৌদ্ধকীর্ত্তি দর্শন করিবার জন্যই উত্তরবঙ্গে উপনীত হইয়াছিলেন। তৎকালে দক্ষিণবঙ্গ "সমতট" নামে পরিচিত ছিল। উত্তর বঙ্গের কোন্ কোন্ স্থানে এখনও বৌদ্ধবিজয়যুগের কীর্ত্তিচিহ্ন বর্ত্তমান আছে, তাহার একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা নিরতিশয় কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। ইহার জন্য অল্প কিছু অর্থব্যয় করিতে পারিলেই, সফলকাম হইবার সম্ভাবনা আছে। যে সকল স্থানে বৌদ্ধ কীর্ত্তিচিহ্ন বর্ত্তমান আছে, তাহা বাছিয়া বাহির করিতে পারিলে,—কোন্ পথে বৌদ্ধবিজয়রাজ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহা আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে।

সংঘর্ষের পর সামঞ্জস্য এবং সামঞ্জস্যের পর সমন্বয় প্রতিষ্ঠালাভ করায়, বৌদ্ধাচার ধীরে ধীরে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। কিরূপে এই মহাপরিবর্ত্তন সাধিত হয়, উত্তরবঙ্গে তাহারও কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। সামঞ্জস্য এবং সমন্বয় সাধিত হইবার সময়ে তাহার প্রভাব কেবল উত্তরবঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল না;—সমুদ্র পথে নানা দ্বীপ দ্বীপান্তরেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তজ্জন্য তথায় এখনও বৌদ্ধচৈত্যাদির সান্নিধ্যে শৈব মন্দিরাদি বর্ত্তমান আছে; দুই একটি খোদিত লিপিতে উত্তরবঙ্গের তৎকাল প্রচলিত লিপি প্রণালীর পরিচয় অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধ এবং শৈব প্রচারকবর্গ যে সকল মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার গঠন পারিপাট্যের মধ্যেও কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ মূর্ত্তির সহিত যবদ্বীপের বৌদ্ধ মূর্ত্তির রচনা সাদৃশ্য লক্ষ্য করিলে, তাহা সকলের নিকটেই বিস্ময়ের ব্যাপার বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

পুরাতন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি একটি সম্পন্ন জনপদ বলিয়াই সুবিখ্যাত ছিল। তাহার দক্ষিণে গঙ্গা,—(পদ্মাবতী)—উত্তরে হিমালয়,—পশ্চিমে মহানন্দা,—এবং পূর্ব্বে করতোয়া,

---

* এই নরপতির একটি মুদ্রার বিষয়ে জেনারেল কানিংহাম লিখিয়া গিয়াছেন :—Several coins of Sasangaka have also been found in Jessore, which I have been able to assign from a very fine specimen belonging to the Payne-Knight Collection in the British Museum on which the name is given at full length—Sri Sasangaka,—Archeo logical Survey Report vol III. এসিয়াটিক সোসাইটির ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের পত্রিকায় এই মুদ্রার প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইয়াছিল।

সীমারূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে ব্যতিক্রম ঘটিত ;—পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি এই সুপরিচিত সীমার বাহিরেও ব্যাপ্তি লাভ করিত। কোন্ সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি কতদূর ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল, তাহার বিবরণ সংকলন করিতে পারিলেও, নানা ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। তাহাতে কি কেহ হস্তক্ষেপ করিবেন না?

এই পুরাতন জনপদের মধ্যে নানা নদনদী প্রবাহিত ; এবং তাহার তীরেতীরেই গ্রাম নগর ও রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে সকল বৌদ্ধকীর্ত্তির সন্ধান লাভ করা যায়, তাহার অধিকাংশই এই নদীতীরে সীমাবদ্ধ। সেকালে জলপথই প্রধান বাণিজ্য-পথ ছিল। সেইপথে বাণিজ্যের সঙ্গে জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচারিত হইত। উত্তরবঙ্গের এই সকল পুরাতন বাণিজ্যস্থান কোনকালেই একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। শাসনবিবর্ত্তনের সঙ্গে স্থানের নামের পরিবর্ত্তন সাধিত হইলেও, এখনও অনেক পুরাতন স্থানই বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে বর্ত্তমান আছে। এই সকল বাণিজ্যস্থানের নিকটে,—মহানন্দা, পুনর্ভবা, আত্রেয়ী, তুলসীগঙ্গা এবং করতোয়া নদীর তীরে,—এখনও বৌদ্ধ-কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, একদা এই সকল স্থান বৌদ্ধচৈত্যে কিরূপ সুসজ্জিত ছিল, একটি পুরাতন চৈত্যের চিত্র দর্শন করিলে, তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। এই চিত্রটি এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।*

চৈত্যটি এখন আর উত্তরবঙ্গে বর্ত্তমান নাই। ইহার আদ্যন্ত প্রস্তরগঠিত ছিল। উপরিভাগের ছত্রাবলী বিলুপ্ত হইয়া গেলেও, যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাতেই সেকালের চৈত্যনির্ম্মাণ কৌশলের পরিচয় প্রকাশিত হইত। দিনাজপুরের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টার মিঃ ওয়েষ্টমেকট এই চৈত্যটি লইয়া গিয়াছেন। দিনাজপুরের অন্তর্গত পত্নীতলা থানার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছিল। চৈত্যপ্রকোষ্ঠে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি, শাক্যসিংহ নবধর্ম্ম-প্রচারকরূপে দণ্ডায়মান। পাদদেশে দুইটি খোদিতলিপি বর্ত্তমান ছিল।† মিঃ ওয়েষ্টমেকট ইহার স্থাপনকাল সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন,

* On the traces of Buddhism in Dinajpur and Bogra, by E. Vesey Westmacott B, C. S., F. R. G. S.—J. A. S. B. Vol. XLIV. p. 187. সোসাইটীর পত্রিকা হইতে চিত্রটি পুনর্মুদ্রিত হইল। মূলচিত্রে চৈত্যের আভাসমাত্রই প্রদত্ত হইয়াছিল ; তাহা যন্ত্রসাহায্যে গৃহীত হয় নাই ; সুতরাং তাহাতে চৈত্যসৌন্দর্য্য সম্যক্ বিকাশলাভ করিতে পারে নাই।

† I can not tell what may have been the original position of this little pillar, which was brought to me from the neighbourhood of Potnitala in Dinajpur. The other three sides are similarly carved to the one which I have drawn, but contain no inscription. From its size I should think that it was a votive offering, set up in a temple or in the courtyard of a temple. The Buddhism of the giver is plain, not only form curving, which represents Buddha teacheing the Law, with hand uplifted, but from the lower of the two inscriptions, which is the wel known Buddhist

তাহা সংশয়হীন বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি তাঁহার প্রবন্ধে উত্তরবঙ্গের নানা স্থানের বৌদ্ধকীর্ত্তিচিহ্নের কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি রাজকার্য্যোপলক্ষে যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে স্বাধীনভাবে তথ্যানুসন্ধানের জন্য ধারাবাহিক চেষ্টা করিবার সম্ভাবনা ছিল না। অনুসন্ধান করিলে, এখনও এরূপ অনেক কীর্ত্তিচিহ্ন আবিষ্কৃত হইতে পারে।

পত্নীতলার সান্নিধ্যে বৌদ্ধপ্রভাব বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অনতিদূরবর্ত্তী বাদাল নামক স্থানে ভট্ট গুরবের "গরুড়স্তম্ভলিপি" পালনরপালগণের প্রবলপ্রতাপের পরিচয় দান করিতেছে। নিকটে আরও পুরাতন কীর্ত্তিচিহ্নের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। মিঃ ওয়েষ্টমেকট এই অঞ্চলের কোন কোন স্থানে অনুসন্ধানকার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এখনও কোনরূপ অনুসন্ধান-কার্য্য আরব্ধ হয় নাই।

পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় নরপালগণের সাম্রাজ্য-কলহ উত্তরবঙ্গের একটি চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক ব্যাপার। তাহার সহিত বৌদ্ধাচারপ্লাবিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ্যে হিন্দুধর্ম্ম-সংস্থাপনের ঘনিষ্ট সংস্রব। উত্তরবঙ্গের সকল স্থানের অনুসন্ধানকার্য্য সমাপ্ত না হইলে, তাহার বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না।

বাঙ্গালার ইতিহাসের অভ্রান্ত উপকরণ বলিয়া যে সকল তাম্রলিপি, শিলালিপি এবং মুদ্রালিপি সমাদর লাভ করিতেছে, তাহার অধিকাংশই উত্তরবঙ্গ হইতে সংগৃহীত।* তাহা সহসা আবিষ্কৃত হইয়াছে; কোনরূপ ধারাবাহিক অনুসন্ধানকার্য্যের ফলস্বরূপ আবিষ্কৃত হয় নাই। এখন ধারাবাহিক অনুসন্ধানকার্য্যের সময় উপস্থিত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গের বিবিধ সাহিত্যসভা কি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না?

সেনরাজবংশের অধঃপতনসময়ে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে সাম্রাজ্যকলহ প্রবর্ত্তিত হইয়া, এ দেশের ইতিহাসে একটি নূতনযুগ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিল, তাহারও প্রধান প্রধান ঘটনা উত্তরবঙ্গেই সংঘটিত হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গের পুনর্ভবাতীরে—দেবকোটের সেনানিবাসে—বক্তিয়ার খিলিজির মৃত্যু; উত্তরবঙ্গের মহীসন্তোষ পরগণায়, বক্তিয়ারখিলিজির বিশ্বস্ত পার্শ্বচর মহম্মদ শেরাণের মৃত্যু; উত্তরবঙ্গের সহিত মুসলমান-বিজয়যুগের প্রথম

---

formula "ye dhamma hetu probava &c" "of all things proceeding from cause that Tathaghata explained the Causes. The great Sramana hath likewise explained the Causes of the Cesation of existence "The upper inscription I am not Sanskrit Scholar enough to read. It seems to give the name of the person who presented this stone-made pillar, but to Contain no date.——— Westmacott.

* মালদহে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন শাসনলিপি বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার পর রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোরের অনতিদূরবর্ত্তী ধানাইদহে প্রাপ্ত আর একখানি শাসনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে;—তাহা "গুপ্তরাজ্য সংবৎসরের" তাম্রশাসনীকৃত দানপত্র। এ পর্য্যন্ত তাহা অপেক্ষা অধিক পুরাতন শাসনলিপি বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই।

সংশ্রব চিরসংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন মুসলমান-মসজেদও উত্তরবঙ্গেই অবস্থিত; তাহার ধ্বংসাবশেষ, পুনর্ভবাতীরে গঙ্গারামপুরের কাঠালে, দেখিতে পাওয়া যায়।* মুসলমানগণ এদেশে আসিয়া প্রথমে যে সকল স্থানে জায়গীর লাভ করেন, তাহাও উত্তরবঙ্গে অবস্থিত। এই সকল কারণে, উত্তরবঙ্গ হিন্দুসম্রাজ্যের অস্তাচল এবং মুসলমান-সম্রাজ্যের উদয়াচল বলিয়াপরিকীর্ত্তিত হইবার যোগ্য। তাহার সমগ্র পুরাতত্ত্ব সংকলিত হইলে বাঙ্গালীর ললাটপট হইতে একটী দুরপনেয় কলঙ্ক চিহ্ন বিদূরিত হইতে পারিবে। মুসলমান কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে নবদ্বীপ অধিকৃত হইবার যে অলৌকিক-কাহিনী ঐতিহাসিক তথ্যরূপে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা যে কপোলকল্পিত উপাখ্যান-মাত্র, উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্ব সঙ্কলিত হইলে তাহা বুঝিতে কাহারও ইতস্ততঃ থাকিবে না।† এরূপ অবস্থায় যাঁহারা উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্ব সংকলনে ব্যাপৃত হইবেন, তাঁহারা বাঙ্গালীর ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবেন। তথাপি কেহ কি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না?

উত্তরবঙ্গের বিবিধ স্থানে যে সকল পরগণার নাম প্রচালিত আছে, তাহার সহিত মুসলমান-শাসন সময়ের নানা ঐতিহাসিক তথ্য চিরবিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। তাহার মূলানুসন্ধান একটী স্বতন্ত্র কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য। কোন কোন ইংরাজ রাজপুরুষ তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস সংকলনের পক্ষে তাহাই পর্য্যাপ্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। পরগণার নাম ধরিয়া অনুসন্ধান কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলে, দুই শ্রেণীর নাম দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। এক শ্রেণীর নামের সঙ্গে এখনও হিন্দু-বৌদ্ধ-শাসন সময়ের পুরাতন স্মৃতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। পরগণার ন্যায় গ্রাম নগরের নামের মধ্যেও সেই পরিচয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।

মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর, পুরাতন নামের পরিবর্ত্তে নূতন নামকরণের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে এখনও সেই নামই প্রচলিত আছে। আবার কোন স্থানে মুসলমানদত্ত নূতন নাম বিলুপ্ত করিয়া, জনসমাজ আবার চিরপরিচিত পুরাতন নাম সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। হুমায়ুঁ বাদশাহ গৌড়ের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, তাহাকে "জিন্নতাবাদ" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। সে নাম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে;— আবার সুপরিচিত গৌড় নামই পুনঃ প্রচলিত হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কোন্ ২ স্থানের নাম এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিলে, অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংকলিত হইতে পারে। এ কার্য্যে এ পর্য্যন্ত কেহই হস্তক্ষেপ করেন নাই।

---

* এই মসজেদ ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে কাইকায়ুস শাহা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

† অষ্টাদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক নবদ্বীপ অধিকারের অলৌকিক বীরত্ব-কাহিনী মিন্‌হাজ-বিরচিত "তবকাৎ-ই নাসেরী" গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। তাহাতে আদৌ নবদ্বীপের নাম নাই; "নওদিয়া" নামক একটি স্থানের নাম আছে, তাহাই নবদ্বীপ বলিয়া অনুমিত হইয়া আসিতেছে। "নওদিয়া" কোন্ স্থান, তাহার তথ্যনির্ণয়ের চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মুসলমানলিখিত ইতিহাসে নবদ্বীপ "নওদিয়া" নামে উল্লিখিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

মুসলমানগণ কোন্ সময় হইতে নূতন নামকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিবামাত্র দেখিতে পাওয়া যায়,—প্রথম যুগে এই প্রবৃত্তি অঙ্কুরিত হয় নাই। বক্তিয়ার খিলিজির পরবর্ত্তী কালেও অনেক দিন পর্য্যন্ত মুসলমান লিখিত ইতিহাসে পুরাতন হিন্দু-নামেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ্য এবং রাজধানী লক্ষ্মণাবতী নামে উল্লিখিত,—মুসলমান জায়গীরদারগণ যে সকল স্থানে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও পুরাতন নামেই উল্লিখিত। তাহাতেই এখনও দুই চারিটী পরগণার পুরাতন নাম প্রচলিত আছে।

হিন্দুবৌদ্ধ-শাসন সময়ে নগর এবং জনপদের নামকরণের সুপরিচিত নিয়ম প্রচলিত ছিল। সে নিয়ম কি, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণে এবং সাহিত্যে উল্লিখিত আছে। তৎকালের গ্রামনগরাদির নামের শেষ ভাগে "পুর, নগর, পত্তন, বতী," ইত্যাদি শব্দ লক্ষিত হইয়া থাকে। মুসলমান-শাসনসময়ে যে সকল নাম প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই ব্যক্তি বিশেষের নামের সহিত সংযুক্ত। তাহার শেষ ভাগে "শাহী, গঞ্জ, আবাদ" ইত্যাদি শব্দ লক্ষিত হইয়া থাকে। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—এক সময়ে "আবাদান্ত" নামের, অন্য সময়ে "গঞ্জান্ত" নামের প্রাদুর্ভাব। এইরূপে পুরাতন নাম পরিবর্ত্তিত হইবার সময়ে, কখন কখন হিন্দুবৌদ্ধ শাসন-সময়ের চিরপ্রচলিত পুরাতন নামের সঙ্গে ও "গঞ্জ, আবাদ" ইত্যাদি সংযুক্ত হইয়াছে; কখন বা সমগ্র নামটী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে! কেহ কি এই সকল ভৌগলিক রহস্যোদ্ঘাটনে ব্যাপৃত হইবেন না?

গ্রাম নগরের নাম যেরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, নদনদীর নাম সেরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। দুই একটী ক্ষুদ্র নদী বা নদীর অংশ বিশেষের নামমাত্রই পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু নৈসর্গিক কারণে নদনদীর গতি অনেক স্থলেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ইতিহাস সংকলন করিতে হইলে, ইহারও তথ্য নির্ণয় করিতে হইবে। বক্তিয়ার খিলিজি যে পথে তিব্বত-বিজয়ে বহির্গত হইয়া, অল্প সংখ্যক অনুচর সঙ্গে দেবকোটে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, তাহার সহিত উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বের বিশেষ সংস্রব বর্ত্তমান আছে। নদনদীর গতিবিবর্ত্তনের পুরাকাহিনীর সহিত পুরাতন রাজ-পথের বিবরণ সংকলন করিতে পারিলে, উত্তরবঙ্গ কিরূপে কত দিনে ধীরে ধীরে মুসলমান-শাসন স্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছিল, তাহারও পুরাতত্ত্ব সংকলিত হইতে পারে।*

মুসলমান-শাসন সময়ে যে সকল রাজনগর হইতে মুদ্রা প্রচলিত হইত, তাহার অনেক স্থান উত্তরবঙ্গে অবস্থিত। তাহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া, স্থাননির্ণয়ে তর্ক-

* বক্তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণাবতী এবং দেবকোটের নিকটবর্ত্তী কয়েকটি পরগণামাত্র অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায় উত্তরবঙ্গের হিন্দু সামন্ত নরপালগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিবার কথা অধ্যাপক ব্লকম্যান স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,—

The Rajas of Northern Bengal were powerful enough to preserve a semi-independence inspite of the numerous invasions from the time of Bakhtyar Khilji

বিতর্কের আবির্ভাব হইয়াছে। পুরাতন দুর্গস্থানের অবস্থাও সেইরূপ। পুরাতন রাজধানীর স্থান, বাণিজ্যস্থান, দুর্গস্থান, শিক্ষাস্থান এবং হিন্দু মুসলমানের তীর্থস্থান উত্তর বঙ্গের সকল বিভাগেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কোনরূপ ধারাবাহিক পুরাতত্ত্ব সংকলনের আয়োজন হয় নাই। উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইলে এ সকল বিষয়ে তর্কবিতর্কের অবসান হইবে না। দেশ রক্ষার্থ উত্তরবঙ্গের সকল প্রান্তেই প্রাস্তদুর্গ বর্ত্তমান ছিল;—এখনও তাহার অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দুর্গের আয়তন, রচনাপ্রণালী এবং স্থান নির্ব্বাচনের বিশেষ প্রয়োজন সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোনরূপ অনুসন্ধানচেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তাহাতে কি কেহ হস্তক্ষেপ করিবেন না? হস্তক্ষেপ করিলেই দেখিতে পাইবেন—উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ কৃষিক্ষেত্র পুরাতন সমরক্ষেত্র,—তাহার রক্তাভ মৃত্তিকা স্তর যেন রুধিরাক্ত হইয়াই অদ্যাপি রক্তাভ হইয়া রহিয়াছে।

বাঙ্গালার ইতিহাস সংকলনের উপযোগী যে সকল উপকরণ ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিতে হইলে, ভৌগোলিক তথ্যের সন্ধান লাভ করিতে হইবে। তাহার জন্য একবার অধ্যাপক ব্লকম্যান সার সংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রথম, সেই শেষ! তিনি তথ্যনির্ণয়ের যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সে পথে অধিক লোক অগ্রসর হন নাই। যাঁহারা অগ্রসর হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও উত্তরবঙ্গের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাবে, নানা হাস্যোদ্দীপক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন!

উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে জন সাধারণের মধ্যে এখনও অনেক গ্রাম্যপূজাপদ্ধতি এবং উৎসবানুষ্ঠান প্রচলিত আছে। তাহার মধ্যে নানা পুরাতত্ত্বের সন্ধান লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও, এ পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে যথাযোগ্য অনুসন্ধান কার্য্য আরব্ধ হয় নাই। ইহাতে উত্তর বঙ্গের সাহিত্যিকগণকেই হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। উত্তরবঙ্গ হইতে যে সকল পূজাপদ্ধতি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে,—যাহা ক্রমে ক্রমে নূতন ভাবে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার তথ্য সংকলন করিতে পারিলে, জনসমাজের প্রকৃত চিত্র সংকলিত হইতে পারে। এক সময়ে স্কন্দমন্দিরের প্রাদুর্ভাব ছিল, আর এক সময়ে বাসুদেব পূজার আতিশয্য ছিল;—এখনও তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কখন বৈদিক মতের, কখন বৌদ্ধ মতের, কখন তান্ত্রিক মতের প্রাধান্য লক্ষিত হইয়া থাকে। তথাপি উত্তরবঙ্গের প্রবল মত তান্ত্রিকমত;—উত্তরবঙ্গই তাহার পুরাতন লীলাক্ষেত্র।

উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে উর্দ্দু অপেক্ষা সংস্কৃত এবং প্রাকৃত শব্দের ব্যবহার কিছু অধিক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এখন বিদ্যালয়ের প্রভাবে গ্রাম্য ভাষার সংস্কার সাধিত হইতেছে। সুতরাং অল্প কালের মধ্যেই পুরাতন কথা লোকসমাজ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িবে।

পুরাতন কথার ন্যায় পুরাতন কাহিনী, প্রবচন এবং গ্রাম্যগীত ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। তাহার সঙ্গে যে সকল পুরাতত্ত্বের সংশ্রব ছিল, তাহাও সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। এখনই তাহার সংকলন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা কেবল উত্তর-বঙ্গের সাহিত্যিকগণের পক্ষেই অনায়াসসাধ্য। তাহাতে কি কেহ হস্তক্ষেপ করিবেন না?

পুরাতন তাম্রশাসনে যে সকল ভূমিদান বৃত্তান্ত উল্লিখিত আছে, তাহার আলোচনার সূত্রপাত হইলেও, সে আলোচনা এখনও একটি নির্দ্দিষ্ট পথেই ধাবিত হইতেছে। এই সকল পুরাতন ভূমিদানপত্রে চতুঃসীমা লিখিত হইলেও, ভূমির পরিমাণ লিখিত নাই। তৎপ্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় লিখিত আছে। কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাই ভূমির পরিমাণরূপে উল্লিখিত। ইহাতে ভারতবর্ষের একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান লাভ করা যায়। অতি পুরাকালে ভূমির পরিমাণের সহিত রাজকরের সংশ্রব ছিল না;—উৎপন্ন শস্যের সহিত তাহার একমাত্র সংশ্রব ছিল। তাহাও আবার প্রতি বৎসরের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করিত। যে বৎসর যাহা উৎপন্ন হইত, সেই বৎসরের জন্য তাহারই অংশ বিশেষ রাজপ্রাপ্য বলিয়া গৃহীত হইত। ইহার মূলে যে শাসন ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কোন ক্রমেই শোষণ ব্যবস্থা বলিয়া নিন্দিত হইতে পারে না। তাহাতে প্রজাই ভূস্বামী, রাজা প্রজার রক্ষক রূপে পরিকল্পিত। এই শাসন ব্যবস্থা উত্তরকালে পরিবর্ত্তিত হইবার সময় হইতেই প্রজাকে ভূমি অধিকারের জন্য কর প্রদান করিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। তখন হইতেই আর উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের দ্বারা ভূমির পরিমাণ নির্দ্দেশের প্রয়োজন তিরোহিত হইয়া গিয়াছে;—ভূমির আয়তনের দ্বারা পরিমাণ নির্দ্দেশের নূতন নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। শস্য উৎপন্ন হউক বা না হউক, তাহার উপর তখন আর রাজকর নির্ভর করে না! যখন এই নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তখনও রাজকর বিনিময়ে শস্যদানের ব্যবস্থা সহসা বিলুপ্ত হয় নাই। উত্তরবঙ্গে এই পরিবর্ত্তনের ইতিহাস বিশেষভাবে অভিব্যক্ত। দেশের লোকের প্রকৃত সুখ দুঃখের মূলকারণ এই শাসন নীতির প্রবল পার্থক্যের মধ্যেই নিহিত হইয়া রহিয়াছে!

তাম্রশাসনে যে সকল ভূমিদানের বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তাহা ধরিয়া তৎকাল প্রচলিত শস্যের মূল্য নির্ণয়ের উপায় হইতে পারে কিনা, তাহারও আলোচনা আবশ্যক। মিষ্টার ওয়েষ্টমেকট তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল একখানি তাম্র-শাসনের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে বহুসংখ্যক তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে;—তাহা লইয়া সাহিত্য সমাজে বিবিধ আলোচনারও সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা পুরাকালের এই বিবরণ সঙ্কলনের চেষ্টা যথাযোগ্যরূপে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যাঁহারা পুরাতন শাসনলিপির অনুবাদ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাঁহারও সকল স্থলের মর্ম্ম-প্রকাশের চেষ্টা করেন না। কোন্ সন তারিখের কাহার দানপত্র, তাহাই যেন একমাত্র অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

যতদিন উৎপন্ন শস্যের অংশ বিশেষ রাজকররূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল, ততদিনও সকল সময়ে ষষ্ঠাংশ মাত্র রাজকররূপে নির্দ্দিষ্ট হইত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার ব্যতিক্রমের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুসলমান শাসন-সময়ে ভূমির পরিমাণের উপর রাজকর নির্দ্ধারণের নিয়ম প্রচলিত হইবার সময়ে, প্রজাকে সম্মত করিবার জন্য, প্রচলিত পরিমাণদণ্ডের তারতম্য করিতে হইয়াছিল। তাহার জন্যই "গজের" মাপ যাহাই হউক না কেন, ভূমির পরিমাপ কার্য্যে তদপেক্ষা অধিক ধরিয়া দিতে হইত। উত্তরবঙ্গে তাহার তথ্য সংকলনে প্রবৃত্ত হইলে, এদেশের বিভিন্ন শাসন-সময়ের বিভিন্ন শাসন-নীতির প্রকৃত রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। তাহাতে কি কেহ হস্তক্ষেপ করিবেন না?

কৃষিক্ষেত্রের ন্যায় আবাসভূমির করধার্য্যব্যাপারেও নানাপরিবর্ত্তনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। এক সময়ে আবাসভূমি রক্ষা করিবার জন্য গৃহস্থমাত্র সামন্তগণের সঙ্গে সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য ছিল। তখন করপ্রদান করিতে হইত না। তাহার পর রাজসেনার খাদ্য সঞ্চয় করিয়া দিতে হইত; তখনও কর-প্রদানের প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। যখন কর প্রচালিত হইয়াছিল, তখনও বাস্তভূমির করের পরিমাণ সামান্য ছিল; ক্রমে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।* ইহার [illegible] সংগ্রহ, তাহা বাঙ্গালীর দুঃখদুর্দ্দশার ইতিহাস,—নিত্য দুর্ভিক্ষের ইতিহাস,—মহামারী এবং অকাল মৃত্যুর ইতিহাস। সে ইতিহাস সংকলন করিবার জন্য কেহ কি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন না?

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই বলিয়া, কেহ কেহ তাড়াতাড়ি ইতিহাস রচনায় অগ্রসর হইতেছেন! তাহাতে শক্তিক্ষয় না করিয়া, তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা করিলে, কালে ইতিহাস রচিত হইতে পারিবে। উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিকগণ ইতিহাস রচনার জন্য ব্যস্ত না হইয়া, তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া, ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই। তাঁহারা যাহাতে সেই কার্য্যে অধিক অনুরাগ প্রকাশিত করিতে পারেন, তাহার জন্যই এই প্রবন্ধ সংকলিত হইল। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন সেই উদ্দেশ্যেই পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়া সকলকে তাহাতে ব্যাপৃত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। সকলের সমবেত চেষ্টায় তথ্যানুসন্ধানের যথাযোগ্য প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে, তাহা উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনকে গৌরবদান করিতে পারিবে।

উত্তরবঙ্গের মধ্যে মালদহ, দিনাজপুর, রাজসাহী, বগুড়া এবং রঙ্গপুরে এখনও অনেক পুরাতন কীর্ত্তিচিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারা গিয়াছে

---

* এক সময়ে উত্তরবঙ্গে উত্তরদ্বারী আবাসবাটীর কর গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না। এখনও তাহার জনশ্রুতি বিলুপ্ত হয় নাই। "পকতরা" নামক বাণিজ্য শুল্কেই রাজকোষ পরিপূর্ণ হইত; সুতরাং ভূমির উপর কর ধার্য্যের সময়ে শোষণনীতি প্রকাশিত হইত না। গোচর, গোপথ প্রভৃতি সাধারণের ব্যবহারার্থ করধার্য্যের অযোগ্য বলিয়াই বিবেচিত হইত।

তাহাই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। এই সকল স্থান পুরাকালে সকল সময়ে এক রাজ্যের বা এক রাজবংশের অধীন ছিল না। রাষ্ট্রবিপ্লবে, ধর্ম্মবিপ্লবে, এবং কাল-বিপ্লবে পুরাতন কীর্ত্তিচিহ্ন নানারূপ উৎপীড়ন সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছে। কত বৌদ্ধ-মন্দির শৈবমন্দিরে পরিণত হইয়াছে, কত শৈবমন্দির মুসলমানের মস্‌জিদে বা সমাধি-মন্দিরে পরিণত হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারে? জেনারেল কানিংহাম যতদূর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া ছিলেন, তাহাতে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল—উত্তরবঙ্গের মুসলমান পীরস্থানগুলি বৌদ্ধ বা হিন্দু মন্দিরের পুরাতন স্থান। কোন কোন পীরস্থান যে সত্য সত্যই এইরূপ, তাহা মুসলমান লিখিত ইতিহাসেও উল্লিখিত আছে। এরূপ অবস্থায় পুরাতন বৌদ্ধ বা হিন্দুকীর্ত্তির অনুসন্ধান করিতে হইলে, বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। উত্তরবঙ্গের কত স্থানে এইরূপে হিন্দুবৌদ্ধের মহাশ্মশানের উপর মুসলমানের মস্‌জেদ বা সমাধিমন্দির দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহা সমুচিত সতর্ক দৃষ্টিতে আবিষ্কৃত করিতে হইবে। সে পথে বাধাবিঘ্নের অভাব নাই।

যাঁহারা এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন বা নবোৎসাহে ব্যাপৃত হইবার আয়োজন করিতেছেন, তাঁহাদের অনুসন্ধান ফল একত্র সংকলিত না হইলে, বিচার কার্য্য আরব্ধ হইতে পারে না। উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনই তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র। যাহাতে আগামী বর্ষে সেই ক্ষেত্রে এ সকল বিষয়ের যথোপযুক্ত আলোচনা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, এখন হইতেই তাহার আয়োজন করা কর্ত্তব্য। কোন্ পথে এই সকল অনুসন্ধান কার্য্য পরিচালিত করিতে হইবে, এই প্রবন্ধে তাহার আভাস মাত্রই প্রদত্ত হইল।

রাজসাহী ভাদ্র। ১৩১৫। শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

প্রাচীন মুদ্রা।*

কিঞ্চিদূর্দ্ধ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই উত্তরবঙ্গেরই উপকণ্ঠে যে স্থানে হিন্দু স্বাধীনতার সূক্ষ্ম স্পন্দন সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়াছিল,—বিরাট ব্রিটিশবাহিনীর সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যে স্থান সর্ব্বশেষে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল,—তন্ত্রোক্ত সেই পুণ্যক্ষেত্রের—মহাশক্তির লীলাভূমির চিতাভস্মোকৃত কয়েকটি অলন্ত স্মারকচিহ্ন অদ্য আপনাদিগের সম্মুখে ধরিতেছি।

যে রাজ্যের পরিচয় আজ দিতেছি তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত আর নাই, তাহার সুরম্য হর্ম্যাবলী

* রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষদের চতুর্থ বার্ষিক চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত।

পরিশোভিত জনসঙ্কুল রাজধানী ধরণীগর্ভে বিলীন হইয়াছে,—রাজধানীস্থ মহাদেবীর পূজাস্থান বিজেতৃগণের দৃপ্ত পদস্পৃষ্ট হইতেছে, আর তাহার প্রতিষ্ঠাতৃগণ অতি উর্দ্ধ হইতে দীননেত্রে স্বীয় পুরীর এবম্বিধ দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া উত্তপ্ত চক্ষু জলে সমগ্র হিন্দুজাতিকে নিয়ত অভিশপ্ত ও সন্তপ্ত করিতেছে। সেই হিন্দুস্বাধীনতা-শ্মশানের পূত চিতাক্ষেত্র হইতে কর্ম্মকুশল বৈদেশিক প্রত্নতত্ত্ববিদ যে সকল অমূল্য নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, আত্মগৌরব-জ্ঞান রহিত তন্দ্রিত আমরা, অনুসন্ধিৎসা ও কর্ম্মকুশলতার অভাবে তাহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিবার অবসর পর্য্যন্ত আজও পাই নাই। তথাপি আমরা হিন্দুত্বের—আর্য্যত্বের গৌরবে স্ফীতবক্ষ।

ব্রহ্মপুত্র ও ভাগীরথীর পূতধারার ন্যায় পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় প্রান্ত হইতেই আর্য্যস্রোত ভারতভূমি প্লাবিত করিয়াছিল; ব্রহ্মপুত্র ও ভাগীরথীর মিলনক্ষেত্র বাঙ্গলা যেরূপ শস্যসম্ভারে সমৃদ্ধ ও লোভনীয়, দ্বিধা বিভক্ত আর্য্যশক্তির সমন্বয়ে ভারতে কামরূপও তদ্রূপ মহাশক্তির লীলাভূমি। বিচ্ছিন্ন আর্য্য শাখাদ্বয় দেশ ও কালগত বৈষম্য বিমুক্ত হইয়া এই পুণ্যক্ষেত্রে সখ্যালিঙ্গনে পুনঃ বদ্ধ হওয়াতেই ইহা তন্ত্রাদিতে সুরবাঞ্ছিত ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ কারণপরম্পরা অনুসন্ধান করিলে কামরূপের কমনীয় শাসনদণ্ডগ্রাহী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বিবিধ জাতিকে, অনভিজ্ঞ বৈদেশিক ইতিবেত্তাদিগের প্রতিপাদিত অনার্য্য আখ্যায় আখ্যাত করিতে পারা যায় না। তবে সময়ে সময়ে সংমিশ্রিত-শোণিত কোন কোন সঙ্কর জাতি কামরূপাধিপত্য গ্রহণ করিয়া থাকিবে। আর্য্য অনার্য্যের এরূপ মিশ্রণ আসিয়াখণ্ডের বহুস্থলেই ঘটিয়াছে।

আদি আর্য্যভূম ভারত হইতে পূর্ব্বগামী আর্য্যশাখা হিমগিরির উত্তরভাগ দিয়া সমগ্র চীন দেশ ও পূর্ব্বউপদ্বীপে উপনিবিষ্ট হয়। তথা হইতে তাঁহারা সুমাত্রা, যব, বালি প্রভৃতি দক্ষিণ সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জেও বাণিজ্য ব্যপদেশে গিয়া বিজয়নিশান প্রোথিত করেন। সুমাত্রাদ্বীপের পরে যব, তৎপরে বালি, বালির পরে লম্বকদ্বীপ। এই সমস্ত দ্বীপেই আর্য্য কীর্ত্তি ও হিন্দুর বিজয়স্তম্ভ বর্ত্তমান রহিয়াছে। শেষোক্ত লম্বকদ্বীপে এখনও হিন্দুরাজা ও প্রাচীন হিন্দুস্মৃতির অনুশাসন প্রবর্ত্তিত। যবদ্বীপের পূর্ব্বাংশে শঙ্খ নামক একটী দ্বীপের উল্লেখ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে, বিষ্ণুপুরাণে উহা সৌম্য নামে খ্যাত। বর্ত্তমানে তাহাই সুন্দরদ্বীপপুঞ্জ অভিধান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার পরে বরণীয় (বোর্ণিও) বা বিষ্ণুপুরাণ ও রামায়ণোক্ত বারুণ দ্বীপ। পুরাকালে ইহা অন্নম্ (আনাম) রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল। এই অন্নম্ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অঙ্গদ্বীপ নামে কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অঙ্গদ্বীপের বিবরণ যথা,—

অঙ্গদ্বীপং নিবোধ তং নানা জনপদাকুলম্।
নানা ম্লেচ্ছগণাকীর্ণং তদ্দ্বীপং বহুবিস্তরম্॥
হেমদ্রুমসুসম্পূর্ণং নানা রত্নাকরং হি তৎ।
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রং সন্নিভং লবণাম্ভসা॥" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫৩ অঃ)

এই অঙ্গদ্বীপবাসীগণ তদ্দক্ষিণাংশকে চম্পা বলিত। পদ্মপুরাণোক্ত চাঁদসওদাগরের চম্পা-যাত্রার সহিত এই চম্পার কোন সম্পর্ক আছে কিনা তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রতিপাদনের বিষয় বটে। অঙ্গদ্বীপে প্রাপ্ত শিলালিপি ও অনুশাসনাদি সংস্কৃত ও চম্ (চম্পা) ভাষায় লিখিত, তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত লিপিগুলি বয়োবৃদ্ধ। অন্নম্ রাজ্যের সন্নিহিত কাম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক স্থাপিত কম্বোজদেশ এক্ষণে কাম্বোডিয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই কাম্বোজের নিকটেই শ্যামদেশ। তদ্দেশবাসীগণ অধুনা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও পূর্ব্বে হিন্দুদেবদেবীর নিকটে নতশীর্ষ ছিল ইহার প্রমাণ বিরল নহে।*

"প্রাচীন কামরূপ" প্রবন্ধে আমরা প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপরাজ্যের অবস্থানাদির বিষয় ও উহার আদি আর্য্যনরপতিগণের উল্লেখ করিয়াছি। পরবর্ত্তী কালে উহা আহোম্-জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হইয়া "আসাম" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা ইতিবেত্তাদিগের মতে শানবংশীয় ও শ্যামদেশবাসীর সহিত এক জাতীয়। এই আহোমজাতির আদি বৃত্তান্ত অনুধাবন করিলে জানিতে পারা যায় যে তাহারা বৈদিকমার্গী আর্য্যগণের ঋক্‌স্তুত পূর্ব্ব-দিগধিপতি ইন্দ্রবংশসম্ভূত। পুরুষপরম্পরাগত, সুরক্ষিত ও হস্তলিখিত বহু প্রাচীন আহোম্ ইতিবৃত্তে এ বিষয় দুইটী বিভিন্ন প্রকারে বিবরণ লিখিত হইলেও তাহারা যে ইন্দ্রবংশসম্ভূত তাহা তুল্যরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। সেই বিবরণদ্বয় এ স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।†

প্রথম বিবরণ—লেংদান বা ইন্দ্র তৎপুত্র থেনথামকে পৃথিবীতে এক রাজত্ব স্থাপন করিতে আদেশ করিলে তিনি স্বর্গচ্যুতি আশঙ্কায় তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ইহাতে থেনথাম্ পুত্র খুনলাং ও খুনলাইকে তৎপরিবর্ত্তে মর্ত্ত্যে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। আগমন কালে দেবরাজ থেনথাম্ পুত্রদ্বয়কে, বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত সোমদেব (আসামীভাষায় চোমদেব) যন্ত্র বিশেষ, হেংদান (খড়্গ), ঢক্কাদ্বয় ও কুক্কুট চতুষ্টয় প্রদানপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ খুনলাং রাজা ও খুনলাই তাঁহার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন এরূপ আদেশ করিলেন। এইরূপে আদিষ্ট হইয়া ভ্রাতৃযুগল স্বর্ণশৃঙ্খল ধারণ করিয়া ধরা পৃষ্ঠে ৪৯০ শকে মুঙ্গরিম্‌মুঙ্গরাম নামক এক অরাজক রাজ্যে অবতীর্ণ হইলেন। আগমনকালে ব্যস্ততা প্রযুক্ত ইন্দ্রপ্রদত্ত দ্রব্যাদি সঙ্গে করিয়া আনিতে উভয়েই বিস্মৃত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদের বড়ই অসুখের কারণ হইল। লেঙ্গ নামক এক ব্যক্তি ঐ সকল পরিত্যক্ত দ্রব্য স্বর্গ হইতে আনিয়া "পেহ" অর্থাৎ চীনরাজ্য সহ দেবরাজ প্রদত্ত অসি (হেংদান) প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্রপৌত্রদ্বয় মুঙ্গরিমমুঙ্গরামে একটী নগর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পূর্ব্বনির্দ্দেশ মত যথাক্রমে রাজ্য ও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৌশল পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ খুনলাঙ্গের হস্ত হইতে রাজত্ব গ্রহণ

---

* বিশ্বকোষ ২য় ভলিউম "উপনিবেশ" শব্দ ৪১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† আসাম বুরঞ্জী—(গুণাভিরামের) ২য় ভাগ ষষ্ঠঅধ্যায় ৯৪ পৃষ্ঠা এবং E. A. Gait এর আসাম ইতিহাসের ৩য় অধ্যায় ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

করিলে তিনি অভিসম্পাৎ প্রদান পূর্ব্বক সোমদেবকে লইয়া বৃহত্তর মুংখুংমুংজাও—(বৃহদ্দেশ) নামক স্থানে গিয়া রাজত্বস্থাপন পূর্ব্বক ৪০ বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজ্যভোগ করিয়া ৫৩১ শকে সশরীরে স্বর্গগামী হইলেন। ইঁহার সাতপুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ সোমদেব সহ মুংকং অর্থাৎ ঢক্কানাদিত দেশের রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরবর্ত্তী চারিপুত্র খুনফাক, খুনস্থক, খুনলাক, খুন্তাক, যথাক্রমে দক্ষিণদেশ, লামং অর্থাৎ জিউত্রাদেশ, মুংকলাদেশ, আবা অর্থাৎ মান বা ব্রহ্মদেশ এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ খুঙ্কুক পৈতৃক মুংখুংমুংজাও রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। এই শেষোক্ত রাজ্যে তিনজন রাজা পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়া স্বর্গগামী হইলে ৫৯০শকে ত্যাওখপ্পন রাজা হইলেন।

প্রবঞ্চক খুন্‌লাই ৭০ বৎসর মুঙ্গরিম্‌মুঙ্গরামে রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র তেওআইজাপ ৪০ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া অপুত্রক অবস্থায় জীবনলীলা শেষ করিলেন। মন্ত্রিগণ পূর্ব্বোক্ত খুনলাও বংশের ত্যাওখপ্পনের এক পুত্র খাম্পংফরকে খুনলাই অধিকৃত সিংহাসন প্রদান করিয়া ইন্দ্রদেবের অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন। ইনি এবং ইঁহার পরবর্ত্তী একাদশজন ভূপতি ৩৫৭ বৎসর ঐ রাজত্ব ভোগ করিলে সর্ব্বশেষ নরপতি অপুত্রক হওয়ায় খুনলুঙপুত্র খুঙ্কুরাজবংশীয় তেত্তআইলং রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন। ইঁহার পরে আরও একজন রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র চতুষ্টয় মধ্যে স্থকাফা রাজা মুংকং দেশ হইতে সোমদেবকে অপহরণ করিয়া আনিয়া আহোম্ মতের ৫৯০ শকের ১৫ অগ্রহায়ণ অর্থাৎ প্রচলিত ১১৫০ শকে বা ১২২৮ খৃঃঅব্দে আসাম দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। স্থকাফাই আসামের আদি আহোমরাজ। মুংকং নামক একটী নগর উত্তরব্রহ্মদেশে আজও রহিয়াছে। ব্রহ্মদেশের রাজারা অদ্যাপিও আহোমরাজগণকে ভাইরাজা বলিয়া থাকেন। এই বিবরণ দ্বারা আহোমরাজগণের সহিত ব্রহ্মরাজের জ্ঞাতীত্ব সূচিত হইতেছে।

দ্বিতীয় বিবরণ—সৌমার পীঠের পূর্ব্বদেশে স্বর্ণাদ্রি ও হিরকূট পর্ব্বতের মধ্যে বিহগাদ্রি নামক এক পর্ব্বতে মহর্ষি বশিষ্ঠের এক আশ্রম ছিল, তৎসমীপবর্ত্তী রত্নভূমি নামক স্থানে ইন্দ্র স্বর্গীয় অপ্সরা ও শচীসহ [illegible] মহর্ষির তপঃ পীড়া উপস্থিত করিতেন। ইহাতে তিনি ক্রোধভরে ইন্দ্রকে "অন্ত্যজগামী হও" বলিয়া অভিসম্পাৎ প্রদানপূর্ব্বক সন্ধ্যাচল পর্ব্বতে গিয়া এক আশ্রম নির্ম্মাণ করেন। তদ্বাক্যে ইন্দ্রের দেবত্ব ঘুচিয়া কোন হীনবর্ণা স্ত্রীর সহিত আসক্তি হয়। সেই স্ত্রীর গর্ভে ইন্দ্রের ঔরসে যে পুত্র জন্মে, তদ্বংশীয়েরাই আহোম নামে খ্যাতিলাভ করিয়া বিস্তৃত সৌমারখণ্ডের আধিপত্য লাভ করেন। যোগিনীতন্ত্রে এই আহোমেরা সৌমারদেশবাসী এবং সৌমার বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের উত্তরখণ্ডকে তৎকালে সৌমার বলা হইত। তাহার সীমা নিম্নোক্তরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে;—

পূর্ব্বে স্বর্ণনদীং যাবৎ করতোয়া চ পশ্চিমে।
দক্ষিণে মন্দশৈলশ্চ উত্তরে বিহগাচলঃ॥

প্রস্তারে চৈব ব্যাসার্দ্ধং যোজনানাঞ্চ পঞ্চকং।
অযুতত্রয়ঞ্চ ত্রিস্রোতঃ পঞ্চোদ্ভব তথা দশ ॥
অষ্টকোণঞ্চ সৌমারং যত্র দিক্করবাসিনী।

যোগিনীতন্ত্র ১৪শ পটল।

এই সৌমারগণের উৎপত্তির বিবরণ যোগিনী তন্ত্রের ২য় অধ্যায় ১৪শ পটলে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে একদা দেবরাজ ইন্দ্র, কৌশাঙ্গীসহ অমরনর্ত্তকীগণের নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন। কাঙ্কতীনাম্নী নর্ত্তকীর নৃত্যকৌশলে কৌশাঙ্গীর মন বিচলিত হওয়ায় তাঁহাকে মানবীরূপে ধরায় জন্মগ্রহণ করিবার শাপ প্রদত্ত হয়। এই কাঙ্কতী তৎফলে কৌরববধূ হইলেন। যখন কুরুক্ষেত্র সমরানলে কুরুবীরগণের সহিত কৌরববধূগণ একে একে প্রাণাহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন কাঙ্কতী চন্দ্রচূড় পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক পুনরায় ইন্দ্রসহ মিলিত হইয়া ইন্দ্রের ঔরসে এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। তদ্বংশীয়েরাই ইন্দ্রবরে সৌমার দেশের আধিপত্য লাভ করেন।

যোগিনীতন্ত্রে এই সৌমার ব্যতীত যবন, প্লব ও কুবাচ (কোচ) এই তিনটী জাতিরও কামরূপ আধিপত্য গ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী লিখিত হইয়াছে।* সৌমার ইন্দ্রবংশসম্ভূত ও কুবাচ শিববংশোদ্ভব তাহা স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। তন্ত্রের এই আখ্যায়িকার সহিত আহোমগণের হিন্দু সংসর্গে আসিবার বহু পূর্ব্বের রক্ষিত আখ্যায়িকার এরূপ চমৎকার সামঞ্জস্য সত্ত্বেও কিরূপে তাহারা অনার্য্য আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ তাহারা শ্যামদেশবাসীর সহিত এক জাতীয় বলিয়াই যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও আহোমগণের সৌমারখণ্ডে আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতে যে তথায় আর্য্যগণের বসতি হইয়াছিল তাহার প্রমাণের অভাব নাই। তবে দেশভেদে ভারতীয় আর্য্যগণের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মাদির সহিত শ্যামদেশবাসীর ও তদ্বংশীয় ঔপনিবেশিকগণের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মাদির প্রকারভেদ ঘটিয়াছিল ইহা অসম্ভব নহে। সৌমারগণ সোমদেবের উপাসনা করিত বলিয়া যে তাহারা অনার্য্য বা অহিন্দু ছিল এ সিদ্ধান্ত যুক্তির নিকটে কিছুতেই আসন পাইতে পারে না। বেদেও সোমের প্রয়োগ বিরল নহে। "ত্বম্‌সোম" এই ঋক্‌মন্ত্র বস্ত্রকামীর সূর্য্যাস্তের পরে জপনীয়। এইরূপে সোমের অর্চ্চনা বৈদিক ঋষিগণের অনুমোদিত ধর্ম্মানুষ্ঠান। দুর্ভাগ্যবশতঃ সৌমারগণের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তৎপূজিত সোমদেবেরও সমাধি হইয়াছে। তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে এই ইন্দ্রপ্রদত্ত সোমযন্ত্র বেদানুমোদিত কিনা তাহা নিরাকরণের উপায় হইত। সৌমারগণ কিরূপে আহোম এবং তাঁহাদিগের অধ্যুষিত ভূখণ্ড কিরূপে আসাম আখ্যা প্রাপ্ত হইল তাহা এ পর্য্যন্ত সঠিক কেহই নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই নব-উপনিবিষ্ট জাতি সৌমার খণ্ডে তাহাদিগের সমকক্ষ আর কোন জাতি নাই এরূপ জ্ঞান করিয়া আপনাদিগকে অসম

* কেহ কেহ অনুমান করেন বর্ত্তমান পলিয়া জাতির আদি এই প্লব হইতেই।

বা অসামী ভাষায় আহোম্ আখ্যা প্রদান করেন। ভিন্ন মত এই যে তাঁহারা যে দেশে উপনিবিষ্ট হন তাহা বন্ধুর হওয়াতেই অসম অভিধান প্রদান করা হয় ও তদ্দেশবাসীগণ আহোম্ নামে খ্যাতি লাভ করে। আবার অন্য মত এই যে সোমদেবের অর্চ্চনা করিত বলিয়া সৌমারগণ সোম বা আসমীয়াভাষায় চোম্ বা হোম্ নামে প্রসিদ্ধ হয়, সেই হোম্ হইতেই আহোম্ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ নাম যে সংস্কৃতমূলক তাহাতে সন্দেহ নাই। আহোম্ আরাধিত সোম হইতে সৌমার নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ আহোমগণ যে স্থানেরই অধিবাসী হউন না কেন, তাঁহাদের ধমনীতে যে আর্য্য শোণিত প্রবাহিত হইতেছে ইহাই প্রতিপাদনের নিমিত্ত আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলির অবতারণা করিতে হইল।

যাঁহারা অনার্য্যের অতি ঘৃণিত ও নিম্নস্তর হইতে আহোমগণের ভারত সংসর্গে আসিয়া সহসা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অতি উচ্চস্তরে—দ্বিজত্বে—ক্ষত্রিয়ত্বে আরোহণ, বীতস্পৃহ বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কলঙ্ক বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, যাঁহারা যোগিনীতন্ত্রোক্ত কুবাচ, সৌমার প্রভৃতির উৎপত্তির বিবরণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দিহান হইয়াও আসাম ইতিবৃত্তের ভিত্তি অবিচলিত চিত্তে আবার তদুপরিই স্থাপন করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা এতৎসম্বন্ধে এখানে কি সিদ্ধান্ত করিবেন জানি না। আমরা কিন্তু ইন্দ্রবংশোদ্ভব আহোমরাজদিগকে ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃত রক্ষক ও পরিপালকরূপেই গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতে গৌরব বোধ করিতেছি।

হিমালয়ের পূর্ব্বভাগ হইতে আহোমরাজ সুকাফা সৌমারখণ্ডের পূর্ব্ব প্রান্তে, ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আসিয়া পাটকাই প্রদেশের নাগা জাতির তপ্তশোণিতোপরি একটী নবরাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই নৃশংস শোণিত-তর্পণেই তাঁহার বিজয় অনায়াসসাধ্য করিয়া দিতে লাগিল। তিনিও উত্তরোত্তর বিজয়লিপ্সু হইয়া ব্রহ্মপুত্রের গমনপথ অনুসরণপূর্ব্বক দিক্করবাসিনীর দ্বারদেশে দীক্ষুনদীর মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থান হইতে লিংরিগাঁও শিমুলগুড়ী উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে কর্ষণোপযোগী উন্নত ভূমিতে আগমনপূর্ব্বক চেরাই দও নামক স্থানে বিজয়োল্লাসে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া একটী সুবৃহৎ নগরীর প্রতিষ্ঠা দ্বারা স্বীয় বিজয়লিপ্সার নিবৃত্তি করিলেন। এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ভিত্তি বিজিত মোরান, বড়াই প্রভৃতি জাতির সহিত সৌহার্দ্দ্য, স্বার্থসমন্বয় ও নির্ভরতায় অটল হইল। জেতাবিজেতাদিগের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা একটী শক্তিমান্ নবজাতি অল্পকালের মধ্যে গড়িয়া উঠিল। পৈত্রিকভূমির স্ববর্গীয় ভূমিপগণকে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণরৌপ্যাদি প্রদানে বশীভূত করিয়া রাজ্যটিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ করিতেও তিনি ত্রুটী করিলেন না। এইরূপে এই আহোম্ রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা নাগাশোণিত-রঞ্জিত কলুষিতহস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক আদর্শ রাষ্ট্রীয় গৌরবমণ্ডিত হইয়া ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হইলেন। অনেক

সভ্যতাভিমানী জাতিও ইঁহার এই রাষ্ট্রনীতি নতশীর্ষে অনুকরণ করিবেন, সন্দেহ নাই। ইহা সম্পূর্ণ আর্য্যজনোচিত। ইঁহার পুত্র সুতেফা ও তৎপরে পৌত্র সুবিন্‌ফা যথাক্রমে ত্রয়োদশ ও দ্বাদশ বর্ষ নির্ব্বিবাদে রাজ্যসুখ উপভোগ করিয়া ১২৮১ ও ১২৯৩ খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। পরে সুবিন্‌ফা পুত্র সুখাংফা রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। সুদীর্ঘ প্রকৃতিগত-শাসন-প্রসূত শান্তিবারিসিক্ত আহোম্ জাতি এক্ষণে ব্রহ্মপুত্রবিধৌত বিভাগে ধনে জনে ও বলে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিল। প্রাচীন বিক্রান্ত কামতা তাহাদিগের এই অর্জ্জিত বল পরীক্ষার প্রথম ক্ষেত্র হইল। কিছু দিন ধরিয়া এই দুই রাজ্যে বিষম সংঘর্ষ চলিল। অবশেষে কামতারাজ স্বীয় কন্যা রজনীর বিনিময়ে নববলদৃপ্ত আহোমরাজের প্রসাদ লাভ করিলেন। ৩৯ বর্ষ রাজ্য ভোগের পর সুখাংফা ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে বিগত জীবন হইলে তাঁহার পুত্র চতুষ্টয় মধ্যে জ্যেষ্ঠ সুখরাংফা সিংহাসনারোহণ করিলেন। কিন্তু তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের অনুরাগভাজন হইতে পারেন নাই। ৩২ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হইলে তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা সুতুফা রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরকূলবাসী চুটিয়া জাতির সহিত আহোমগণের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। অতঃপর চুটিয়ারাজের প্রতারণায় সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে গিয়া অনুচরবিহীন আহোমরাজ তরণী মধ্যে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত হন। ইহার পরে, রাজবংশীয় উপযুক্ত কোনও ব্যক্তি না থাকায় ১৩৭৬ হইতে ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যের প্রধান অধিনায়ক বড় গোস্বামী ও বুদ্ধ গোস্বামী শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। অতঃপর রাজা ব্যতীত রাজ্যশাসন অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তাঁহারা সুখরাংফার তৃতীয়পুত্র ত্যাওখামটীকে রাজ্যভার প্রদান করিলেন। চুটীয়াদিগের উপরে ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ গ্রহণই ইঁহার প্রথম কার্য্য হইল। চুটিয়া দমন ব্যপদেশে রাজধানী হইতে দূরে থাকা কালীন তাঁহার কনিষ্ঠ মহিষী রাজ্যভারপ্রাপ্তা জ্যেষ্ঠার কৌশলে নির্ব্বাসিতা হইলেন। বিজয় লাভ করিয়া রাজা রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই নিদারুণ সংবাদ অবগত হইলেন, কিন্তু প্রধানা মহিষীর সর্ব্ববিষয়ে করতলগত ছিলেন বলিয়া কোনও প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না। বস্তুতঃ এই রাজ্ঞী রাজা বর্ত্তমানেও যদৃচ্ছা রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ইহাতে জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া রাজাকে হত্যা করে এবং উপযুক্ত কোন উত্তরাধিকারীর অভাবে আবার ১৩৮৯-১৩৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্বকথিত অধিনায়কদ্বয় কর্ত্তৃক রাজ্য শাসিত হইতে লাগিল।

অতঃপর নির্ব্বাসিতারাজ্ঞীর হাবুঙ্গীয়া ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত সুদং নামক সন্তান সযত্নে আনীত হইয়া সুদংফা নাম ধারণ পূর্ব্বক ১৩৯৭ খৃঃ অব্দে রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন। অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে এই রাজার সময়ে আহোমগণ উত্তরপূর্ব্ববঙ্গের করতোয়া পর্য্যন্ত ভূভাগ আপন অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন।* কামতারাজদুহিতা ভাজনী ইঁহার বিজয়লব্ধ পত্নী। প্রতিপালক ব্রাহ্মণকে তিনি মন্ত্রিত্ব, তাহার সন্তানদিগকে উচ্চ রাজ-

* এসিয়াটিক সোসাইটীর জারনাল ১৮৭৩ খৃঃ ২৩৪ পৃষ্ঠা।

কার্য্যে নিযুক্ত এবং রাজ্য মধ্যে বিবিধ হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ধামনী কুঁওর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহার সময়ে দিহিং নদীর তীরে চরগুয়া নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সুজংফা ও তাহার পুত্র সুসেন্‌ফা,* তৎপুত্র সুহেন্‌ফা, তৎপুত্র সুপিংফা ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সুপিম্‌ফাপুত্র সুহাংমু চরগুয়াতে আড়ম্বরের সহিত অভিষিক্ত হইয়া স্বর্গ-নারায়ণ নাম ধারণ করেন। আহোমগণ ভারতে আসিয়া, বাঙ্গলার সান্নিধ্যে থাকিয়া ভারতীয় আর্য্যদের অনুকরণ করিয়াও এপর্য্যন্ত যেন ব্যবধানেই ছিলেন। এক্ষণে এই দেবভাষা-মূলক নামগ্রহণে সে দূরত্ব ঘুচিয়া গেল। ইহা তাহাদের হিন্দুত্বে দীক্ষার পরিচয় নহে, ভারতীয় আর্য্যগণের সহিত সর্ব্ব-বিষয়ে মিলনের স্ফুটতর প্রমাণ মাত্র। সমগ্র চুটীয়া রাজ্য, ধনশ্রী-ধৌত ভূভাগের নিম্নাংশ এবং বর্ত্তমান নওগাঁও বিভাগের অধিকাংশস্থল ইঁহার সময়ে আহোমরাজ্য-ভুক্ত হয়। যে আগ্নেয়অস্ত্র প্রভাবে সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্যজাতিসকল অধুনা দিগ্বি-জয়ী, তাহার ব্যবহার এই হিন্দুরাজন্য আসামের কান্তারে বসিয়াও অবগত হইয়াছিলেন, ইহা পাশ্চাত্য ইতিবেত্তারাই স্বীকার করিয়াছেন†। শক্তিসেবক কামরূপরাজগণের উষর হৃদয় শঙ্করপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রেম-বন্যায় সরস হইয়া সন্নিহিত শক্তির সঙ্ঘাতে এই সময় হইতেই ভাঙ্গিয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। স্বীয় পুত্রের হস্তে এই স্বনামধন্য ভূপতি জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। ব্রহ্ম-পুত্রের স্রোতরাশি পশ্চিমভারতের মাতৃহত্যার পাপ একবার ধৌত করিয়া যে স্থান পুণ্যময় করিয়া তুলিয়াছিল, সেই স্থান এই পিতৃহত্যার পাপেই আবার শ্মশান হইল। বঙ্গেও পিতৃব্যহত্যার পাপে উদীয়মান একটী হিন্দুরাজ্য এইরূপে ধ্বংশ হইয়াছিল। এরূপ পাপ ধৌত করিবার মত স্রোতরাশি ভারতে আর নাই! পিতৃহন্তা সুক্লেনমুং গড়গাঁয়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া ১৫৩৯ হইতে ১৫৫২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত আহোম সিংহাসন কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে আর একটী হিন্দুশক্তি কোচবিহারে মস্তক উত্তোলন করেন। কুবাচরাজ নরনারায়ণ স্বীয় ভ্রাতা শুক্লধ্বজের সৈন্যাপত্যে প্রবল মহাম্মদীয় শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া, সমগ্র আসাম ও বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী গৌড়দ্বারে হিন্দু বৈজয়ন্তী প্রোথিত করেন। এই দুইটী শক্তির সমবায়ে বাঙ্গলার—এমন কি ভারতের ইতিহাসের রূপান্তরসাধিত হইত, কিন্তু বিধাতৃনির্দ্দেশ ভিন্নরূপ বলিয়া এরূপ সঞ্চিতশক্তি বিরোধ মুখেই ব্যয়িত ও পরিশেষে লয় প্রাপ্ত হইল। আজ আমরা তাহারই চিতামূলে কয়েকটী স্মরণচিহ্নদর্শন ব্যপদেশে ভারতের ব্যষ্টিগত ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের এই আর একটী কাহিনীর অবতারণা করিলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

---

* সুসেন্‌ফা রাজার সময়ে বড়দোবার কুসুম্বর গোস্বামীর ঘরে আসামের প্রধান বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক শঙ্করদেব ১৩৭১শকে জন্মগ্রহণ করেন।

† Tuo use of firearms were introduced, E. A. Gait, History of Assam, p 95.

প্রাচীন পুথির বিবরণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৭৮। শ্রীমদ্ভাগবত।

উপেন্দ্রনাথ মিত্র বিরচিত পদ্যানুবাদ দ্বাদশ স্কন্ধে সমাপ্ত। ইতিপূর্ব্বে এই গ্রন্থখানির উল্লেখ করিয়াছিলাম মাত্র। অনুসন্ধানে সমগ্র গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছে। খণ্ডিত পুস্তকে গ্রন্থকর্ত্তার আত্মপরিচয় সেবারে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। কবি বিশদভাবে আত্মপরিচয় তাঁহার অনুবাদে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন কেবল গ্রন্থ রচনার সময় নির্দ্দেশ করেন নাই। তবে বঙ্গের কায়স্থকুলের বংশ পর্য্যালোচনা করিয়া কবির সময় স্থির করিতে সহজে পারা যায়। কবি নিম্নলিখিত ভাবে আত্মপরিচয় দিতেছেন যথা:—

(১)

সূর্য্যবংশ জাত যেই বিশ্বামিত্র কুল।
প্রকাশিতে এ ভারত কায়স্থ সঙ্কুল॥
বল্লালের মান্যমত বঙ্গের কুলীন।
বঁড়িষা সমাজে খ্যাত কালিদাস দীন॥
তাঁহার বংশীয় বাস কুমার নগর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তথা অতি শোভাকর॥
চণ্ডীর চরণ নাম চণ্ডীর সেবনে।
পিতামহ পিতা তিনি জ্ঞাত সর্ব্ব জনে॥
কালিদাস পুত্র নাম উমেশ তাঁহার।
তাঁহার ঔরসে দাস দেখিল সংসার॥
প্রথম স্কন্ধের কথা উপেন্দ্র রচিল।
হরি পদে দেও মন তাজিয়া পড়িল॥

(২)

বিশ্বামিত্র কুলে জাত কায়স্থ সন্তান।
পিতৃকুল খ্যাতি মিত্র স্মৃতির বিধান॥
তাহাতে জন্মিল দাস উমেশ নন্দন।
কালিদাস তাঁর পিতা স্বর্গীয় সুজন॥
তাঁহার পিতার নাম চণ্ডীর চরণ।
ভাগবত সেই পুণ্য করিনু কীর্ত্তন॥

(৩)

ভারতে সর্ব্বত্র খ্যাত সুরধনী তীর।
কুমারনগর আছে তাতে যত ধীর॥
বিশ্বামিত্র কুলে জাত পিতৃলোক মোর।
হরিপদে সবে রত হইয়া বিভোর॥
শুভক্ষণে জন্ম চণ্ডী হরির কৃপায়।
তাঁর পুত্র কালিদাস হরিগুণ গায়॥
তাঁহার ঔরসে জন্ম উমেশ নন্দন।
এ দাস জন্মিল তাঁরে করিতে সেবন॥
হরিনাম করি সার শিখি শাস্ত্রাচার।
করিলাম ভাগবতে পদ্য ব্যবহার॥
মাধব চৈতন্য স্বামী মহাযোগীবর।
গুরু রূপে দিলা জ্ঞান কহি হরিপদ॥
সেই জ্ঞানে প্রকাশিল এ হরির বাণী।
শুনিলে বিমুক্ত হবে জগতের প্রাণী॥
হরিনাম সার কর এ ভব সাগরে।
উপেন্দ্রের বাণী মুক্তি পাবে ভক্তি জোরে॥

কবির মন্ত্রগুরুর নাম দেখিয়া মনে হয় যে সময়ে চৈতন্যধর্ম্ম বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, যে সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অজ্ঞানান্ধকার, বিদ্যার উষালোকে ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া আপামর সাধারণ শাস্ত্রালোচনার অধিকার প্রাপ্ত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে কবি ভাগবতে এই পদ্য ব্যবহার করিয়াছেন। মাধব চৈতন্য স্বামী ষোড়শ শতাব্দীর লোক। বটতলার

রূপার গ্রন্থখানি আজিও জীবিত আছে। কবি পরাণচন্দ্র দাস নামক অপর একজন কবির সাহায্য লইয়া আপন গ্রন্থ সমাধা করিয়াছেন। শেষের সমুদয় রচনাই পরাণচন্দ্রের। তাহা দেখিয়া মনে হয় কবি গোপালবলি দশম স্কন্ধের নন্দাদি গোপগণের বৃন্দাবন গমনের পূর্ব্বাধ্যায় পর্য্যন্ত লিখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন, পরে পরাণচন্দ্র "অনুবাদ শেষ করিয়াছেন। এই পরাণচন্দ্র দাস কে তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। পরাণচন্দ্র আপন অনুবাদে আত্মপরিচয় জ্ঞাপক কোনও কথা বলেন নাই। আমরা অনুমানে বোধ করি এই "পরাণচন্দ্র দাস" কবির কোনও আত্মীয় হইবেন। পরাণচন্দ্র দশমস্কন্ধের নন্দাদি গোপগণের বৃন্দাবন গমন হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশস্কন্ধের শেষ পর্য্যন্ত পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। পরাণচন্দ্র কেবল এক স্থানে মাত্র "পরাণচন্দ্র দাস মধুকর" বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন। আর সকল অধ্যায় শেষে "দাস ভাষে হরি কথা তরিতে শমন" "দাস বিরচিল গীত হরিপদ সার" ইত্যাদি ভণিতা আছে। আমরা ছাপার বহি দৃষ্টে উপরোক্ত বিবরণ সংগ্রহ করিলাম। বহিখানা "বাঙ্গালী যন্ত্রে" ১২৪২ সনে কলিকাতায় ছাপা হইয়াছিল। রচনা প্রসাদগুণ বিশিষ্ট নহে। দূরান্বয় দোষে, দুরূহ শব্দাদি বাহুল্যে সাধারণ পাঠকের দুর্ব্বোধ্য। তবে এই বিরাট অনুবাদ বহু কষ্ট ও সময় সাধ্য, অনুবাদকের অসাধারণ অধ্যবসায় সাপেক্ষ। এই সকল অনুবাদই সংস্কৃত জ্ঞানহীন বাঙ্গালীর শাস্ত্রে প্রবেশাধিকারের দ্বারস্বরূপ বলিয়া ইহার মূল্য নাই।

৭৯। পুরাণের নাম ও শ্লোক সংখ্যা।

খোসালচন্দ্র দাস বিরচিত। পত্রসংখ্যা ৩। নকলের তারিখ ২২শে মাঘ ১২৩৯ সন। পুরাতন বাঙ্গালা কাগজে লেখা। স্বাক্ষর শ্রীমোহনচন্দ্র দাসস্য সাং নিশ্চিন্তপুর থানা সাদুল্যাপুর জেলা রঙ্গপুর। গ্রন্থখানির আরম্ভ এইরূপ—

এইগণে কহি আমি সেই সব তত্ত্ব॥
ব্রহ্মপুরাণে দশ সহস্র শ্লোক হয়।
পদ্মপুরাণে পঞ্চাশৎ সহস্র নির্ণয়॥
বিষ্ণুপুরাণে শ্লোক তের হাজার জানিবে।
চতুর্ব্বিংশ সহস্র শিব পুরাণে শুনিবে॥
ভাগবতে অষ্টাদশ সহস্র নির্ণয়।
নারদ পুরাণে পঞ্চদশ সহস্র হয়॥
মার্কণ্ডেতে নয় হাজার যে কথিত।
অগ্নিতে চারিশত সহস্র যে লিখিত॥
চারি হাজার পঞ্চশৎ ভবিষ্য পুরাণে।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে অষ্টাদশ সহস্র কথনে॥
২৪ হাজার লিঙ্গপুরাণেতে হয়।
বরাহপুরাণে উক্ত জানিতে নিশ্চয়॥
এক শতাধিক একাশী বামনে।
দশ হাজার শ্লোক হয় কূর্ম্ম পুরাণে॥
চৌদ্দ হাজার মৎস্য পুরাণেতে।
গরুড়ে উনিশ হাজার কহি যে তোমাতে॥
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে শ্লোক হয় যে দ্বাদশ।
সর্ব্ব পুরাণে চারিলক্ষ শ্লোকের প্রকাশ॥
তার মধ্যে ভাগবতে আঠার হাজার।
শুন কহি মুনি সবে প্রকাশ তাহার॥
ইত্যাদি

৮০। জঙ্গনামা।

সেখ দোস্ত মহম্মদ বিরচিত। মুসলমান সম্প্রদায় এ "জঙ্গনামের" গীত সাগ্রহে শুনিয়া থাকেন। নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানগণের মধ্যেই এই গীত প্রচলিত

আছে। আজ কাল মুসলমানগণ গীত-বাদ্যের বিরোধী জন্য অনেক স্থানে ইহা লোপ পাইয়াছে। এই গ্রন্থে মুসলমান-ধর্ম্মের বিজয়কাহিনী অতি সুললিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে খয়র, আলি, হামির, আমির ইত্যাদি মুসলমান ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের বিজয়বার্ত্তার বর্ণনা আছে। সেখ দোস্তমহমদ আপন গ্রন্থের কোনও স্থানে আত্মপরিচয় দেন নাই আমরা অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে কবির বাসস্থান এই রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত পীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাগডুয়ার গ্রামে ছিল। কবি একজন পারস্যভাষায় সুপণ্ডিত মৌলবী ছিলেন। সেখানে এখনও তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা বসবাস করিতেছে। আমরা সমগ্র গ্রন্থ-খানি পাই নাই। কাব্যখানি অতি বৃহৎ। আমরা ৯ হইতে ২০৬ পাতা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। লেখকের নাম সন তারিখ ইত্যাদি জানিতে পারা যায় নাই। গ্রন্থ-খানি চাপিগাছের ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার মীর সাফাতালীর নিকটে পাইয়াছিলাম। ইঁহার পিতার নিকটে গ্রন্থকর্ত্তা কবির পরিচয় জানিতে পারিয়াছি। আজকাল মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা যেরূপ প্রাচীন ধর্ম্মনীতির বিরোধী হইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় সত্বরই জঙ্গনামা বিলুপ্ত হইবে। গ্রন্থ মধ্যে স্থানে স্থানে কবি নিম্নলিখিত ভণিতায় আত্মনাম প্রকাশ করিয়াছেন—

(১)

জঙ্গের সাজান বাদশা সাজিতে লাগিল।
জঙ্গনামা দোস্ত মহমদ বিরচিল॥

(২)

দেখিতে দেখিতে রাত্র গোজরিয়া যায়।
দোস্তমহমদ পুথি বিরচিয়া গায়॥

(৩)

কেতাব দেখিয়া দোস্ত মহমদ বলে।

(৪)

এখানে বসিয়া দোস্ত মহমদ ভণে॥

এই গীত ৮।১০ জন লোকে বেহালা ও ঢোলক বাদ্য সহকারে গান করিয়া থাকে। শীতকালে এই গান অধিক পরিমাণ গীত হইয়া থাকে।

৮১। চণ্ডীবিজয় পুস্তক।

দেবীমঙ্গল শ্রীহরিশ্চন্দ্র বসু প্রণীত। গ্রন্থের প্রথম সর্ব্বদেবদেবীর প্রণাম ও সর্ব্ব তীর্থের প্রণাম করিয়া কবি গ্রন্থের সূচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রথমে একটী করিয়া গান আছে, কবি তাহার নাম "মালী" দিয়াছেন। গ্রন্থখানি পড়িয়া আমাদের দ্বিজ কালিদাসের "কালীবিলাস" গ্রন্থের কথা মনে পড়ে। উভয়ের মধ্যে কে কাহার অনুকরণ করিয়াছেন সে কথা স্থির করা এখন দুরূহ। "কালীবিলাসেও" প্রথম একটী গান তৎপর দেবীমাহাত্ম্য লেখা হইয়াছে। দুর্গোৎসবে যে চণ্ডী পাঠ হয়, এই গ্রন্থ তাহারই ছায়া অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। চণ্ডীর বাহিরের অনেক কথাও উহাতে স্থান পাইয়াছে। এই বসু কবির দেবীমঙ্গল অপেক্ষা কালীবিলাস কবিত্ব সম্পদে অনেক উচ্চ। এই দেবীমঙ্গল এখন লোপ পাইয়াছে, তবে লিপিকরের সন তারিখ দেখিয়া বোধ হয় ১২০৯ সনের পরেও রঙ্গপুর জেলায় এই গ্রন্থের প্রচার ছিল। কবি গ্রন্থ মধ্যে গ্রন্থসমাপনের সন তারিখ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে বোধ হয় কালিদাস ও কবি এক সময়ের লোক। কবি গ্রন্থ শেষে এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

কালিয়াতে বসতি ছিল অতি সুখানন্দ।
তাহাতে বঞ্চিত হৈল দেবের নির্ব্বন্ধ॥
সর্ব্ব গুণে স্থান মায়তীন নদী তীর।
সরিতে স্নানের গুণ দগধে শরীর॥
বিধাতা রক্ষিত কার্য্য না যায় খণ্ডন।
তথা হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরে আগমন॥
বুৎদন্ত রায় সপ্ত লোকের সংহতি।
গঙ্গাদিয়া গ্রামেতে হৈল অবস্থিতি॥
রাজধানী আসল কালিয়া নামে পুর।
যার নামসৌরভে ব্যাপিত অতি দূর॥
চিরকাল শাসিত তাহাতে এক পুর।
রাজকার্য্য অনুরোধে তথা বাস করি॥
সেই বাসে হইল দেবীর মঙ্গল রচনা।
পদ বন্ধ দৃষ্টিতে করিবে বিবেচনা॥
সপ্তসতী গ্রন্থ দেববাণীর ভাসিত।
কিঞ্চিৎ আভাসে ইএ রহে প্রকাশিত॥
শ্লোক অর্থ বিশেষ পদেত জান সবে।
গদাধর টীকাতে দৃষ্টি হবে॥
ক্রমাগত শ্লোক পদাবলিতে না রবে।
এমত শ্রম অবশ্য তাথে নাহি হবে॥
শ্লোকাধিক যতেক দেখিবে পদাবলী।
শ্রুতিসুখ নিমিত্ত জানিবে সে সকলি॥
বিদ্বানে দেখয় যদি মূর্খের কবিতা।
নিজ গুণ দিয়া দোষ করে আংসাদিতা।
সেই অনুসারে করিয় অবধান।
যত দোষ খণ্ডিত করিবা মতিমান॥
শক্ষভূৎ রিতু চন্দ্র সকের বিশেষে।
বৈশাখের চতুর্ব্বিংশতি দিবসে॥
সিত বর্দ্ধতর পক্ষ তিথি সপ্তমীতে।
ভূমি সুত দিগত তপন অষ্টমীতে॥
মস্তকে বন্দিয়া গুরুর চরণ যুগল।
রচিল পুস্তক নামে দেবি মঙ্গল॥

অথ চণ্ডী-বিজয় পুস্তক সমাপ্ত। রোজ রবিবার বেলা এক দণ্ড মাহে পৌষ সন ১২৩৯ সন মোকাম পাকুরিয়া মৌজে কৃষ্ণপুর পরগণে কোণ্ডরপুর সরকার ঘোড়াঘাট হিস্তা নয় আনা পুস্তক লিখাতে গোলকচন্দ্র দাস আইচ মোস্তালক থানা সাহুল্লাপুর জেলা রঙ্গপুর সন ১৮৩১ ইংরাজী পক্ষ শুক্লতিথি পূর্ণমাসি। স্বাক্ষর শ্রীকৃষ্ণনাথ দাস সাং আকুরিয়া। কবি অন্য স্থানে বলিয়াছেন—

চন্দ্রদ্বীপ স্থানে মুখ্য কায়েস্থ সমাজ।
বসুবংশে প্রতাপ আদিত্য মহারাজ॥
সেই চন্দ্রদ্বীপ সর্ব্ব জগত প্রকাশ।
তথাতে আছিল পূর্ব্ব পুরুষ নিবাস॥
দৈবযোগে পিতামহ বাস বঙ্গে আসি।
যোগ সন্ধ্যা সাধি হইলা স্বর্গবাসী॥
সেই বসু বংশেতে আমার উপাদান।

* * * *

হরিশ্চন্দ্র বলে মন তোমাতে মিনতি।
জিবন মরণে দেবির পদেত ভকতি॥

"শক্ষভূৎ রীতুচন্দ্র শকের বিশেষ" কথায় ১৬৫৫ শক পাওয়া যায়। এই শকে কবি তাঁহার গ্রন্থ সমাধা করেন। ইংরাজী ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ সমাধানের তারিখ ধরিলে কবি অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কবি যে কালিয়া রাজধানীর নাম করিয়াছেন সে স্থানের রাজার কোনও উল্লেখ না থাকায় তাহার অবস্থিতির সম্বন্ধে কিছুই বলা যাইতে পারে না। কবির বাস গঙ্গাদিয়া গ্রামে ছিল। গঙ্গাদিয়া কোথায় তাহাও ঠিক করা সুকঠিন। কালিয়াগ্রাম রঙ্গপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত। ইহার নিকট দানেশনগর নামে গ্রাম এখন জঙ্গলময় হইয়া আছে। এই দানেশনগরে মহারাজ দানেশনগরের রাজধানী ছিল। বাগ-দুয়ারের ভবচন্দ্র রাজার অধিষ্ঠাত্রী বাগদেবী এখন মহারাজ দানেশনগরের সেবা। মহারাজ দানেশনগর এখন

বাঁকুড়া জেলায় বাস করেন। এই স্থানে বসুবংশজ বঙ্গজ কায়স্থের বাস নাই। কবি আপন বংশ পরিচয় কিছুই গ্রন্থ মধ্যে দেন নাই।

৮২। কবি মৈত্র জীবনের মনসার ভাষান।

প্রকাণ্ড গ্রন্থ ১৮৭ পাত। গ্রন্থ শেষে আছে ইতি সমাপ্ত স্বাক্ষর শ্রীরামচন্দ্র দাস সাং পরগণে মুক্তিপুর ঘোড়াবান্ধা নিবাস সন ১২৬০ তাং ১৩ আশ্বিন রোজ বুধবার দিবা দেড় প্রহর থাকিতে সমাধা যথাদৃষ্টং ইত্যাদি কবির নাম মৈত্র জীবন নয়, তাঁহার নাম জীবনকৃষ্ণ মৈত্র। গ্রন্থের মধ্যে ভণিতায় তাঁহার এই পুরা নাম পাওয়া গিয়াছে। কবি গ্রন্থ মধ্যে আত্ম-পরিচয় অতি বিশদভাবে দিয়াছেন। তিনি একাকী গ্রন্থ রচনা করেন নাই। গ্রন্থ মধ্যে শ্রীগৌড়কিশোর নামে অপর এক জন কবির ভণিতাও পাওয়া যায়। গৌড়কিশোর গ্রন্থ মধ্যে আত্মপরিচয় কিছুই লিখেন নাই। ভণিতা দৃষ্টে বোধ হয় তিনি কোনও বড়লোকের "ভাণ্ডার-নবিশ" বা "ভাণ্ডার রক্ষক" ছিলেন যথা—

"শ্রীগৌরকিশোরের দুঃখ কপালে লিখন।
ভাণ্ডারে বসিয়া পুথি করিল রচন॥"

কবি মৈত্র জীবন স্বাধীনভাবে আপন কাব্য রচনা করিলেও তিনি কবি জগজ্জীবন ঘোষালের গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে জগজ্জীবন ঘোষালের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রচনা একবারে স্থান পাইয়াছে। কবি তাঁহার কাব্য মধ্যে নানা পৌরাণিক উপাখ্যানের স্থান দিয়াছেন—যথা "বাণযুদ্ধ" "মণিহরণ" "সম্বর বধ" ইত্যাদি। কবি আত্মপরিচয়ে আত্ম অবস্থার কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সরলতা সম্যক্ বুঝিতে পারা যায়। তিনি আত্মপরিচয় এইরূপে দিয়াছেন—

(১)

মহারাজা রামকান্ত ভুবনে বিক্ষাত।
তাঁহার জামাতা বটে রাজা রঘুনাথ॥
তাঁহার রাজ্যেতে থাকি ভিক্ষা করি খাই।
ভিক্ষুকের কার্য্যদোষ নিন্দয় গোসাঞি॥
শ্রীবংসি বদন মৈত্র জান মহাশয়।
চৌধুরী অনন্তরাম তাহার তনয়॥
অনন্ত নন্দন কবি শ্রীমৈত্র জীবন।
লাড়ি পাড়ায় বাস বারিন্দ্র ব্রাহ্মণ॥

(২)

শ্রীবংসিবদন মৈত্র জান মহাশয়।
চৌধুরী অনন্তরাম তাহার তনয়॥
অনন্তনন্দন কবি শ্রীমৈত্র জীবন।
লাহিড়িপাড়াতে বাস বারিন্দ্র ব্রাহ্মণ॥
পদ্মার আদেশে কবি মোর দোষ নাই।
বিনে দোষে নিন্দ কেহ ধর্ম্মের দোহাই॥
মহারাজা রামকান্ত ভুবন বিখ্যাত।
তাহার জামতা বটে রাজা রঘুনাথ॥
তাহার দম্পতি বটে তারা ঠাকুরাণী।
আপনি পৃথিবীশ্বরি তাঁহার জননী॥
সতি অতি পুণ্যবতি শ্রীরাণী ভবানী।
মহারাণীর নিজার্থে ভুবনে বাখানি॥
তাহার রাজ্যেতে বাস চাকলা ভাতুরিয়া।
পরগণে প্রতাপবাজু তরফ নাতসি মানিয়া॥
নাড়িপাড়া গ্রাম খানি কবির নিবাস।
কহে কবি জীবনমৈত্র করিয়া প্রকাশ॥

(৩)

শ্রীমৈত্র জীবন কবি ঘরে বসি কৈল।
একদিন লিখিতে ভাড়ির তৈল ফুরাইল॥

(৪)

উজানির যত নারি, দেখে সবে সারি সারি
জীবন কৃষ্ণ মৈত্র কবি গায়॥

কবির পিতামহ দ্বিজবংশীবদনও এক জন বিখ্যাত কবি ছিলেন। এখনও তাঁহার বিরচিত সত্যনারায়ণের পাঁচালী বঙ্গবাসী হিন্দুর গৃহে সত্যনারায়ণ সেবা-কালে পূজার অঙ্গস্বরূপ পঠিত হইয়া থাকে। এই পাঁচালীর রচনা অতি সরল ও সুখপাঠ্য। চৌধুরী অনন্তরাম কবির পিতা ছিলেন। নবাবী আমলে "চৌধুরী" জমিদারের খেতাব বা উপাধি। ইহাতে বোধ হয় কবির পিতা নবাব সরকার হইতে কোন উচ্চ পদের জন্য এই উপাধি লাভ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কবির দৈন্য দশা দেখিয়া আমাদের এই অনুমান যে ঠিক তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ দৈব বিড়ম্বনায় কবি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া থাকিবেন। তাঁহার সতীর্থ গৌড়কিশোর, কাঁহার ভাণ্ডারে বসিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন নাই কিম্বা ভণিতায় অতিরিক্ত আত্মপরিচয়ও কিছু দেন নাই সুতরাং আজ তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা দুরূহ ব্যাপার।

কবি রাজা রঘুনাথের রাজ্যে বাস করিয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, পরন্তু রাত্রে আলো জ্বালিবার তৈলেরও তাঁহার অভাব ছিল। রঘুনাথ কোন দিন রাজা ছিলেন না। তাঁহার আবাস রাজসাহী খাজুরা গ্রামে ছিল। তিনি বরেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের এক জন শ্রেষ্ঠ কুলীন ছিলেন। রাণী ভবানী স্বীয়া কন্যা তারার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া দান যৌতুকে তাঁহাকে রাজার অধিক সম্পত্তি দিয়াছিলেন। এই রঘুনাথের মৃত্যুর পর রাণী ভবানী হতাশ হইয়া মহারাজা রামকৃষ্ণকে দত্তক গ্রহণ করেন। দিঘাপতিয়া রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় তাঁহার মোহনলাল উপন্যাসে যেভাবে মুরশিদাবাদে এক চটীতে রঘুনাথের সহিত মহারাজ রামকৃষ্ণের কথোপকথনের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে বুঝিতে পারা যায় রঘুনাথের সহিত নাটোর রাজ-পরিবারের সদ্ভাব ছিল না। উপন্যাসে সকলই শোভা পায়।

মহারাজা রামকান্ত রাজা রাজীব-লোচনের দত্তকপুত্র। দেওয়ান দয়ারাম স্বয়ং বিবাহ সম্বন্ধের পত্র দস্তখত করিয়া ইঁহার সহিত রাণী ভবানীর বিবাহ দেন। রাণী ভবানীর পিতৃভবন রাজসাহীর ছাতিয়ান গ্রামে ছিল। রামজীবন তাঁহার ভ্রাতা রঘুনন্দনের বুদ্ধি প্রভাবে রাজসাহী, ভাতুরিয়া প্রভৃতি পরগণার জমিদারী লাভ করেন। রঘুনন্দন পুঁঠিয়া-রাজ দর্পনারায়ণের উকীল স্বরূপ মুরশিদা-বাদে মুরশীদকুলী খাঁ নবাবের দরবারে থাকিয়া, নবাবের নিকাশী কাগজ পত্র প্রস্তুতের সাহায্য করায় তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া বাদসাহ সরকার হইতে জমি-দারী সনদ আনাইয়া দিয়াছিলেন। নাটোররাজগণ মৈত্রবংশসম্ভূত। রঘু-নন্দনের পিতা কামদেব পুঁঠিয়ারাজের বারুইহাটি প্রদেশের তহশীলদার ছিলেন। রঘুনন্দনের পুত্র দেবীপ্রসাদ চৌধুরী নাটোর রাজ্যে পিতার মৃত্যুর পর স্থান পান না। দেওয়ান-দয়ারামের বুদ্ধি কৌশলে মহারাজ রামকান্তকে অপসারিত করিয়া তিনি কিছুকাল নাটোর গদিতে বসিয়াছিলেন, পরে আবার দয়ারামের চক্রে, রামকান্তকে নাটোর রাজসিংহাসন প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন।

ভাতুরিয়া পরগণায় প্রাচীন সাঁতোল রাজগণের রাজ্য ছিল। রাজা রামকৃষ্ণ এই

বংশের শেষ রাজা। রাণী সর্ব্বাণী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর ন্যায় পুণ্যবতী ছিলেন। রাণী সর্ব্বাণীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা বলরাম বাতুলতাহেতু রাজকার্য্যে অসমর্থ এই হেতুবাদে রঘুনন্দনের প্রার্থনানুসারে মুরশিদকুলী খাঁ বাদসাহ সরকার হইতে ভাতুরিয়া জমিদারীর সনন্দ রামজীবনের নামে আনাইয়া ছিলেন। এই ভাবে নাটোর রাজবংশ এক কালে বাঙ্গালার এক তৃতীয়াংশ ভূভাগের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাই কবি রাণী ভবানীকে পৃথিবী ঈশ্বরী বলিয়া পূজা করিয়াছেন।

কবি গ্রন্থ মধ্যে কাব্য সমাপনের তারিখ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই অংশগুলি অতিশয় প্রহেলিকাময়, অর্থবোধ সহজে হয় না। আমরা তাহার অনেক স্থানেরই অর্থ করিতে পারি নাই। সেই অংশগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

(১)

মহী পৃষ্ঠে শশী দিয়া, বাণ বিধি সমর্পিয়া,
বুঝহ সনের পরিমাণ।
ঝাড়িদহ পাড়াতে স্থিতি, দ্বিজকুলে উৎপত্তি
শ্রীমৈত্র জীবন কবি গান॥

(২)

অম্বুজের পৃষ্ঠে রস কিম্বা রিপু জান।
এই শকে শ্রীমৈত্র জীবন রচে গান॥

(৩)

নিরনিধি সুত পৃষ্ঠে মহি আরোপিয়া।
বিরোচন সুতের সুক তাহাতে স্থাপিয়া॥
কোকনদ বন্ধু তার পৃষ্ঠে অধিষ্ঠান।
এই সনে শ্রীমৈত্র জীবন রচে গান॥

ইহার প্রথমটীর অর্থ আমরা ১১৫৩ বুঝিয়াছি। দ্বিতীয়টীর অর্থ ঠিক করিতে পারা যায় না তৃতীয়টীর অর্থ অতি দুর্ব্বোধ্য। কবি পলাশী যুদ্ধের নয় দশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। সাময়িক কোন ঘটনার উল্লেখ কবির কাব্যে স্থান পায় নাই। ১২৭০ সালেও এই কাব্য লিখিত ও পঠিত হইত বলিয়া লিপিকরের তারিখ দেখিয়া জানিতে পারা যায়।

৮৩। মনসার কথা।

অতি পুরাতন জীর্ণ বহি। গ্রন্থ খানির সকল পত্রগুলি নাই। মধ্যে মধ্যে অনেক নষ্ট হইয়াছে অনেকগুলি পাতা কেতাবকীটে এরূপ ভাবে কাটিয়াছে যে পাঠ উদ্ধার অসম্ভব হইয়াছে। লেখাও অতিশয় জটিল পাঠ করা সহজসাধ্য নহে। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ খানি মনসাপূজার আদি গ্রন্থ হইবে। কবির নাম বিজয়গুপ্ত। গ্রন্থ মধ্যে এক স্থানে তাঁহার আত্মপরিচয় দেওয়া আছে। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে কবির নিবাস পূর্ব্ব বঙ্গে চট্টগ্রাম প্রদেশের ফুলশ্রীগ্রামে ছিল। কবি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি এই ভাবে আত্মজন্মভূমির পরিচয় ও সঙ্গীত সমাপনের তারিখাদির উল্লেখ করিয়াছেন। কবির রচনা অতিশয় ভাবময়ী ও কৃত্তিবাসের রচনার ন্যায় প্রসাদগুণ বিশিষ্ট।

হরিনারায়ণ স্মরি নির্ম্মল কৈল চিত।
রচিতে আরম্ভ কৈল মনসার গীত॥
সেই মতে পদ্মাবতী করিল সংবিধান।
সেই মতে করে সবে গীতের নির্ম্মাণ॥
ছায়াশূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সনাতন হোসেন সাহ নৃপতি তিলক॥
উত্তরে অর্জ্জুন রাজা প্রতাপেতে যম।
মুলুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গালার সীম॥

পশ্চিমে দামোদর নদী পূর্ব্বে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুলশ্রীগ্রাম পণ্ডিত নগর॥
চারি বেদাধ্যায়ী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্যজাতি বৈসে তথা শাস্ত্রেতে কুশল॥
কায়স্থ জাতি বৈসে তথা লিখিতে প্রচুর।
আর যত জাতি নিজ শাস্ত্রেতে চতুর॥
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুলশ্রীগ্রামে নিবসে বিজয়॥

কবি হোসেন শাহ বাদশাহের রাজত্বকালে ১৪০০ (ছায়া শূন্য বেদশশী পরিমিত শকে) শকে আপন কাব্য রচনা শেষ করিয়াছেন। মনসাদেবীর আদেশে কবি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কবির সময় দেখিয়া বোধ হয় পরাগলী মহাভারতের কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহার সমসাময়িক। এই উভয় কবিকে আমরা কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী কবি বলিয়া মনে করি। এই কাব্য খানি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মনসার কথা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ভিন্ন ভিন্ন কবির হস্তে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে প্রচারিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। কাল সহকারে কবিত্বশক্তিতে পশ্চিমবঙ্গের কবিদ্বয় ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস প্রভৃতিকে পরাজয় করিয়া কালের পাষাণ বক্ষে আপনাদের নাম অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। কবি কায়স্থগণের যে গুণগান প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে সেই স্মরণাতীত যুগে "লিখিতে প্রচুর" এক মাত্র কায়স্থ জাতিই ছিল। সে সময়েও ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যায়ী ছিলেন। বৈদ্যগণ শাস্ত্রকুশল ছিল। আর আর জাতিরা নিজ নিজ জাতিগত ব্যবসায় সুচতুর ছিল। হিন্দুসমাজের এ হেন আলেখ্য আর কোন কবি রাখিয়া যান নাই।

৮৪। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা কিছু বলিয়াছি। এবার আমরা সমগ্র রামায়ণ পাইয়াছি। এই বিরাট গ্রন্থ পলাশবাড়ী থানার অন্তর্গত ঘোড়াবান্ধা গ্রামে (রঙ্গপুর জেলায়) ডাক্তার সতীশচন্দ্র তালুকদারের বাড়ীতে অখণ্ডিত অবস্থাতে আছে। তালুকদার মহাশয়ের খুড়া কিছুতেই এই গ্রন্থ হস্তান্তর করিতে স্বীকার করেন না। এমন কি মূল্য দিয়া ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাহাতে রাজি হন নাই। গ্রন্থ শেষে লেখা আছে ইতি ১১৪৩ সাল বাঙ্গালা লিখিতার নাম শ্রীস্বরূপকিশোর দাস সাকিন বন্ধনকুঠী হাল মোকাম ঘোড়াবান্ধা পরগণে মুক্তিপুর সরকার ঘোড়াঘাট হিঃ ॥৴ নয় আনা সমাপ্ত তারিখ ২ ভাদ্র রোজ শনিবার বেলা চারি দণ্ড ও দান শুক্লাদ্বিতীয়া পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র এর সমাপ্ত ইতি।

আমরা অনেকগুলি অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ হইতে কবির আত্মপরিচয় সংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে কবি সপ্তদশ শতাব্দির লোক। তাঁহার বাসস্থান সেরপাবাদ সরকারের সোনাবাজু প্রদেশের বড়বাড়ী গ্রামে ছিল। উপরোক্ত ১১৪৩ সনের নকল হইতে ইহা অবশ্যই অনুমান আইসে যে, গ্রন্থ রচনা হইয়া চারি দিকে প্রচার হইতে অন্ততঃ কম ২৫ বৎসর সময়ের দরকার সেকালে ছিল। কবি অবশ্যই পরিণত বয়সেই আপন কাব্য লিখিয়া থাকিবেন। আমরা এখানে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের গ্রন্থ হইতে কবির আত্ম-পরিচয় উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম—

(১)

সেরশাবাদ সরকার সোনাবাজু গ্রাম।
অদ্ভুত ক্ষাত্তা নাম সে যে অনুপাম ॥
আত্রাইর তীর সেহি কুরুক্ষেত্র সমান।
মহাপুণ্য স্থান সেই পুরাণে বাখান ॥
করতোয়া পশ্চিমভাগে জাহ্নবীর সীমা।
হেন পুণ্যস্থান সেই নাহিত উপমা ॥
করতোয়া পশ্চিমে আত্রাই উত্তর কুলে।
মহাপুণ্য স্থান সেই পুরাণেতে বলে ॥
অমৃতকুণ্ডা গ্রাম নাম অধিকারী তার।
ভূমে ব্যাসাচার্য্য ঋষির সদাচার ॥
তাহার ঘরে জন্মিল এ চারি কুমার।
মেনকা উদরে চারি ব্যাস অবতার ॥
জ্যেষ্ঠ চারিজন অতি বিচক্ষণমস্ত।
অতি মূর্খ আছিল কনিষ্ঠ নিত্যানন্দ ॥
সপ্তম বর্ষের শিশু কিছুই না জানে।
খেলাতে ফিরে সব রাখালের সনে ॥
[১১১ সনের নকল পুথি হইতে]

(২)

মিথিলা নগরে তবে বড়বাড়ী গ্রাম।
শুভক্ষণে জন্মিল দৈবকী নন্দন নাম ॥
* * * *
* * পক্ষে একাদশী তিথি।
দ্বিজরূপে দেখা দিল রঘুপতি।
প্রভুর কৃপায় করিল রচিত রামায়ণ।
অদ্ভুত নাম হৈল সেইসে কারণ।
* * * *
তপোবনে হৈল তার এ তিন কুমার।
জয় বিজয় হৈল আর শিবানন্দ ॥
এ তিনকে বর দিল রামচন্দ্র।
গুরু তত্ত্ব হৈল গুরু সদানন্দ ॥
যাহার প্রসাদে লোকে শুনে রামায়ণ ॥
ইত্যাদি।
[১১৭০ সনের নকল পুথি হইতে]

(৩)

সেরশাবাদ সরকার সোনাবাজু গ্রাম।
অমৃতকুণ্ড নাম সে যে অতি অনুপম ॥
আত্রাইর তীর সেহি কুরুক্ষেত্র সম।
করতিয়ার পশ্চিম ভাগ জাহ্নবীর সম ॥
করতিয়ার পশ্চিমে আত্রাই উত্তর কুলে।
মহাপুণ্য স্থান সেই পুরাণেতে বলে।
অমৃতকুণ্ডা গ্রাম নাম অধিকারী তার ॥
ভূমে ব্যাসাচার্য্য ঋষির সদাচার।
তার ঘরে জনমিল এ চারি কুমার ॥
মেনকা উদরে চারি ব্যাস অবতার।
জেষ্ঠ তিন জন তার অতি বিচক্ষণ ॥
অতি মূর্খ আছিল কনিষ্ঠ নিত্যানন্দ।
ইত্যাদি
[সন ১১৪৩ সনের নকল পুথি হইতে]

অপর একখানা পুথি রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ আফিসে প্রেরণ করিয়াছি। তাহাতেও উপরোক্ত মত আত্মপরিচয় আছে সে পুথিখানা ১১৫৭ সনের লেখা। লেখক দুইজন মুসলমান। রাজা রঘুনাথের রাজত্বের সময়ে জয়ানন্দ পরগণার পবনপুর গ্রামে নাটোর জেলায় লেখক দ্বয়ের বাস ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। নাটোর জেলা অবশ্য পলাশী যুদ্ধের পর স্থাপিত হইয়াছিল। এই রাজা রঘুনাথ রায় রাণী ভবানীর জামাতা ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। কারণ ঠিক এই সময়েই কবি কৃষ্ণজীবন মৈত্র তাঁহার মনসার ভাসান কাব্যে রাজা রঘুনাথের উল্লেখ করিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অষ্টাদশ শতাব্দির বাঙ্গালার ইতিহাসে যে মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সেরসাবাদ সরকারের নাম দৃষ্ট হয়। সেই মানচিত্রে সেরসাবাদ সরকারের উত্তর রুকণপুর, পূর্ব্বে ভাতুরিয়া পশ্চিম ধরমপুর দক্ষিণ সীমায় আকবরনগর ও মুরশীদাবাদ। এই অবস্থিতি অনুসারে দেখা যায় গৌড়নগর এই

সরকারের রাজধানী ছিল। আইন-ই-আকবরীর মতে সেরসাবাদ সরকার নাই। "সোনাবাজু" পরগণা আইন-ই-আকবরীতে সরকার "বাজুহা" ভুক্ত দেখা যায়। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী রাজস্ব বন্দোবস্তে এই পরগণা এই নূতন সরকার ভুক্ত হইয়া থাকিবে। সোনাবাজু ভাতুরিয়া জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। কোন কোন রামায়ণে এই স্থলের পাঠ "সোনা রাজ্যে বড়বাড়ী গ্রাম" লেখা আছে। এখন উপরোক্ত পাঠ গুলির সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রমাণ হইবে লিপিকর প্রমাদ বশতঃ "সোনাবাজু" "সোনারাজ্যে" পরিণত হইয়া অদ্ভুতাচার্য্যের জন্মস্থান লইয়া এক বিষম সমস্যার উৎপত্তি করিয়াছে। কবি আপন জন্মস্থানের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রাচীন সাঁতোল রাজ্যের রাজধানীর অবস্থানের সহিত মিলে। উপরোক্ত ইতিহাসেও আত্রেয়ী ও করতোয়া নদীর সঙ্গম স্থলে ইহার অবস্থিতি ছিল বলিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন। সাঁতোল রাজধানীর এখন আর কোনও চিহ্ন নাই কেবল "মা কালীর" একটী প্রাচীন মন্দির সেই অতীত যুগের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই মন্দিরের নিকট ৩।৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে বরবরিয়া, অমৃত কুণ্ডা, নোমগ্রাম নামে গ্রামও আছে। কাল সহকারে "বড়বাড়ী" বরবরিয়াতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এখানে কয়েকঘর লগ্নাচার্য্য ব্রাহ্মণেরও বাস আছে। ভিন্ন ভিন্ন লিপিকরের পুস্তক হইতে যতদূর জানিতে পারা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় এই স্থানেই কবির জন্ম হইয়াছিল। সাঁতোলের "কালীবাড়ী" পীঠ স্থান বলিয়া খ্যাত এবং নিকটবর্ত্তী হিন্দুগণের একটী প্রধান তীর্থস্থান।

পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই রামায়ণের ভাষা বিচার করিয়া অদ্ভুতাচার্য্য মালদহবাসী ছিলেন বলিয়া কলিকাতার পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। ভাতুরিয়া ও মালদহ জেলা এক সরকারের অন্তর্গত হওয়ায় উভয় প্রদেশের লোকের সহিত একত্র সংমিশ্রণে এই ভাষাগত মিল হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এমন প্রাদেশিক একার্থ বাচক শব্দ এই স্থান ব্যাপিয়া আজও অনেক প্রচলিত আছে। কবির নাম নিত্যানন্দ "অদ্ভুতাচার্য্য" তাঁহার অদ্ভুত কীর্ত্তির উপাধি মাত্র।

৮৫। কাশীরামদাসের মহাভারত।

আমরা এই মহাভারতের মাত্র সভাপর্ব্ব পাইয়াছি। পত্র সংখ্যা ৬৩। গ্রন্থ শেষে কবির আত্মপরিচয় আছে। সমাপ্ত সন ১২৪৩ সাল তারিখ ১৭ই ফাল্গুন স্বাক্ষর শ্রীভৈরবচন্দ্র বক্সী সাকিন কৃষ্ণপুর পঃ কোণ্ডরপুর। কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিংগী গ্রাম।
প্রিয়াকর দাস পুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসাগ্রজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥"

*　*　*　*

"কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনোপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস।"

কাশীরাম দাসের মহাভারত বঙ্গের প্রত্যেক পল্লীতে প্রতি ঘরে ঘরে আবাল বৃদ্ধ বনিতায় পাঠ করিয়া থাকে। বঙ্গভাষা যতদিন থাকিবে ততদিন বঙ্গবাসীর

নিকট কাশীরাম পূজা পাইবেন। কবিবর মাইকেল চতুর্দ্দশ পদাবলী কবিতায় কাশী-রামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশী কবীশদলে তুমি পুণ্যবান॥"

কাশীরাম প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে এ ভণিতা দিয়াছেন—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥"

কৃত্তিবাসের ভণিতা গর্ব্ব পূর্ণ। কাশী-রাম দাস বিনীত। তিনি "আমি তব কৃষ্ণ পদে এই অভিলাষ" করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সভাপর্ব্ব কাব্য সম্পদে বড়ই রমণীয়। এই পর্ব্বে কাশীরাম দুর্য্যোধনের অপমান ভ্রান্তিমান অলঙ্কার ছটায় লিখিয়া সাধারণ পাঠকের মনে ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া সেই স্মরণাতীত যুগের কারুকার্য্য শোভিত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের যে সভা ময়দানবকে দিয়া গড়াইয়া লইয়া-ছেন তাহা যথার্থই আধুনিক এঞ্জিনিয়ার গণেরও বিস্ময়কর। কাশীরামের এক দানপত্র পাওয়া গিয়াছে তদ্দ্বারা তাঁহার সময়ও সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে অবধারিত হই-য়াছে। কাশীরামের বাস্তুভিটায় কেবল একটী পুষ্করিণী "কাশীপুকুর" নাম লইয়া আজিও তথায় কবিকে জীবিত রাখিয়াছে। এই বিরাট গ্রন্থেও জয়গোপালী হাত পড়িয়া আধুনিক আকারে পরিণত হই-য়াছে। রঙ্গপুর জেলায় কেবল আজ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে কাশীরাম দাসের মহা-ভারতের এই সভাপর্ব্ব খানি আমরা পাইয়াছি তাহাও অতিশয় আধুনিক কালের। বটতলার কৃপায় এই বিরাট গ্রন্থ ছাপা হইয়া বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে।

নারায়ণ দেবের পাঁচালী

আমরা এই পাঁচালী সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারিয়াছিলাম ইতিপূর্ব্বে সে সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিয়াছি। সম্প্রতি ঘোড়াঘাটের এক সাহা বাড়ীতে এই গ্রন্থের সন্ধান পাইয়া তথায় যাইয়া পুথি খানি এক বার দেখিয়া লইয়াছি মালিক পুথি খানি পূজা করিয়া থাকেন, কিছুতেই হস্তচ্যুত করিতে চাহেন না*। গ্রন্থ খানি ভূর্জ্জ পত্রে লেখা। পত্র সংখ্যা ৩০৫। সে কালের জড়া লেখা পাঠ করা সহজসাধ্য নহে। সচরাচর নারা-য়ণ দেবের যে সকল পাঁচালী দেখিতে পাওয়া যায় এখানিও তাহাই বলিয়া বোধ হইল, তবে স্থানে স্থানে অতিরিক্ত বর্ণনা ও পরিচ্ছেদ আছে। ইহার মধ্যে আমরা "সুকবি বল্লভেই কয়" বলিয়া ভণিতার সংখ্যা অতি অল্পই দেখিয়াছি। নারায়ণ দেবের পাঁচালীর মধ্যে "নরসিংহ সুতের" অতিরিক্ত পরিচয় পূর্ব্বে আমরা পাই নাই। এই পুথিতে আমরা নারায়ণ দেবের আত্মপরিচয় পাইয়াছি। প্রচ-লিত পুথি আদিতে এই আত্মপরিচয় না দেখিয়া আমাদের মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত করিয়া দিয়াছে। লিপিকরেরা আপন ইচ্ছা মত লিপি করিয়া থাকেন। কেহ বা কোন অংশ বাদ দেন, কেহ বা কোনও অংশের যোজনা করেন ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া আমাদের সন্দেহের মাত্রা অনেক হ্রাস হইয়াছে। অনুসন্ধান জন্য এবং নারায়ণ দেবের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য

* আসাম, গোয়ালপাড়ার ঘড়িয়ালডাঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয় রঙ্গপুর পরিষৎ-সভায় একখানি নারায়ণ দেবের পাঁচালীর হাতে লেখা পুথি উপহার দিয়াছেন। প, স,

সেই "আত্মপরিচয়" আমরা যে ভাবে পাইয়াছি তাহাই এখানে প্রকাশ করিলাম। কলিকাতার পরিষৎ-পত্রিকায় এই পাঁচালী সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে প্রবন্ধ রচয়িতা এই পাঁচালী ন্যূনাধিক দশজন লেখকের রচনা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে নারায়ণ দেবের উপাধি "কবিবল্লভ" ছিল। কবিবল্লভ" পাদপূরণের অনুরোধে "সুকবিবল্লভ" হইয়াছে। এই পাঁচালী যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের লেখা সে কথার প্রমাণ করা সহজ সাধ্য নহে।

"নারায়ণ দেবে কহে জন্ম মাগধ।
বিপ্র পণ্ডিত নহি ভট্ট বিশারদ॥
শূদ্রকুলে জন্ম মোর সদ কায়স্থ ঘর।
মদগুল্য গোত্র মোর গায়ণ গুণাকর॥
পিতামহ উদ্ধব মোর নরসিংহ পিতা।
মতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥
পূর্ব্ব পুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি।
রাঢ় ত্যজিয়া বোর গ্রামে বসতি॥"

এই বোরগ্রাম ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত। কবি রাঢ়দেশের মাগধ নামে গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই তাঁহার বসতবাটী রাঢ়দেশে স্থাপন করেন কিম্বা পূর্ব্ব পুরুষের সহিত বোরগ্রামে শৈশবে আসিয়াছিলেন তাহা বুঝা যায় না। কবির উপাধি দেব। তিনি আপনাকে মদগল্য গোত্রজ সচ্ছূদ্র কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা বোধ হয় বংশ পরম্পরা গায়ণ গুণাকর উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। গায়ণ গুণাকর কথা দেখিয়া আমাদের নটজাতির কথা মনে পড়ে। "নাটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এবচ"— (মনু অঃ ১০।২২ শ্লোক)। এই নটজাতির লোকেরা "সচ্ছূদ্র" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে এবং ইহাদের জাতীয় ব্যবসায় গীতবাদ্য। সচরাচর কায়স্থেরা আপনাদিগকে কখনও শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেন না। এরূপ স্থলে কবি গীতবাদ্য ব্যবসায়ী জাতি ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।

*

এই গ্রন্থ খানির লিপিকরের সন তারিখ পাঠ করিতে পারি নাই। কেবল স্বাক্ষর শ্রীরোধন দাসস্য পাঠ করিয়াছি মাত্র। পুথি খানির বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া এবং ভূর্জ্জপত্রের লেখা দেখিয়া অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। উহার এক পাশে ইন্দুরে কাটিয়া ফেলিয়াছে স্থানে স্থানে চন্দনাদিতে ঢাকিয়াছে। আর কিছু দিন পরে ইহার অস্তিত্ব থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

রঙ্গপুরের ভাওয়াইয়া গান।

মাঠে শ্রমক্লিষ্ট কৃষকের বা গোষ্ঠপ্রত্যাবর্ত্তিত রাখালের গান অনেকেই শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। এই সকল গান এদেশে সাধারণতঃ ভাওয়াইয়া গান নামে অভিহিত। এই আদিরসাত্মক সঙ্গীতগুলি নিরক্ষর গ্রাম্য কৃষকের রচিত ও আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ অশ্লীলতা দোষ দুষ্ট হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। বরং দুই একটী গীতের রচয়িতা ভাবপ্রবণতা এবং স্বাভাবিক বর্ণনা বৈচিত্র্য গুণে অনেক উচ্চশিক্ষিত কবিকেও পরাস্ত করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহাসিক তত্ত্বোদ্‌ঘাটনে বা জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টিকল্পে এ গান গুলির উপযোগিতা অল্প নহে। এ সকল গান এতাবৎকাল মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছে; ইহা সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ না হইলে, কাল সহকারে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা। এদেশে তেলঙ্গী ও বাদীয়ারজাতীয়া কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদের মুখেও পত্নবিরহ বিষয়ক অতি সুন্দর সুন্দর গান শুনিতে পাওয়া যায়। সে গুলিও সংগ্রহ হওয়া আবশ্যক। আমি এ বিষয় পরিষদকে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি। সম্প্রতি এই শ্রেণীর নিম্নোক্ত গানটী আমার হস্তগত হইয়াছে। রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব্ব ষ্টেসন মাষ্টার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ সরকার মহাশয় কতিপয় কৃষকের মুখে শুনিয়া ইহা সংগ্রহ করেন। প্রবাদ, পূর্ণ গর্ভবতী রমণী নিরূপিত সময়ে প্রসূতা না হইলে, তাহাকে এই গানটী সম্পূর্ণ শুনাইলে সুপ্রসব হয়।

কন্যা-বারমাসী।

রামরে রামরে হরি রাম নারায়ণ।
দেবের দুর্লভ হরি কমললোচন॥
প্রথম অগ্রহায়ণ মাসে নয়া[১] হেউতির[২] ধান।
কেও কাটে কেও মারে কেহ করে নবান[৩]॥
যার ঘরে আছে অন্ন আধে বারে[৪] খায়।
যার ঘরে নাই অন্ন পরার[৫] মুখ চায়॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল পৌষ মাস॥
পৌষ না মাসেতে কন্যা লোকে খায় আলোয়া[৬]।
ডাল ফুল ফুটিয়াছে কেকিটা? কমলা॥

১। নয়া—নব; ২। হেউতি—হৈমন্তিক; কেও—কেউ। ৩। নবান—নবান্ন; ৪ আধেবারে—রাঁধেবাড়ে। ৫। পরার—পরের; ৬। আলোয়া—তামাকপাতা।

কেকিটী কমলা ফুটে আরো ফুটে মালী।
তরুণ বয়সের বেলা ছাড়িল সোয়ামী ॥
এই মাস গেল না কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল মাঘ মাস ॥
মাঘ না মাসেতে কন্যা করুয়া৭ পড়ে শীত।
তলে পাটী পাড়ে কন্যা শিওরে বালিশ ॥
সাধু সাধু বলিয়া বালিশে দিলাম কোল।
হতভাগা তুলার বালিশ না বোলে একবোল ॥
পোড়া দেও তোর তুলার বালিশ গগণে উঠুক ধুঁয়া।
কতদিনে ফিরবে অভাগিনীর চন্দ্রমুঁয়া ॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল ফাল্গুন মাস ॥
ফাল্গুনমাসেতে হে কন্যা ফাগুয়া খেলায় রাজা।
ডালমূল ভাঙ্গিয়া যখন কুহুনী৮ তোলায় ভাসা ॥
তোলাওরে খোলাওরে কুহুনী পাড়িয়া মারিম ছাও।
আমার দেশে নাই সাধু সাধুর দেশে যাও ॥
গাছে পড়ি পঞ্চ কথা সাধুরে বুঝাও ॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল চৈত্র মাস ॥
চৈত্র না মাসেতে কন্যা পচিয়া৯ বয় বাও।
হেটে তালু শুকায় কন্যার মুখে না আসে রাও১০।
মুখে না আসে রাও হে কন্যা চক্ষে না ধরে নিন্দ।
হাতে হাতে চন্দ্র দিয়া হারাইলাম গোবিন্দ ॥
এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল বৈশাখ মাস ॥
বৈশাখ মাসেতে হে কন্যা সুশাগ১১ ললিতা।
সব সখী খায় শাগ অভাগীর মুখে তিতা ॥
আঁধিয়া বাড়িয়া অন্ন শোঙ্গরাইলাম ১২ পাতে।
আমার ঘরে নাই সাধু পশিয়া১৩ দিব কাকে ?

৭। করুয়া—কম। ৮। কুহুনী—কোকিল; ৯। পচিয়া—পশ্চিমা—পশ্চিম দিগ হইতে।
১০। রাও—রব—কথা, ১১। সুশাগ—সুশাক; ১২। শোঙ্গরাইলাম—বাড়িয়া দিলাম।
১৩। পশিয়া—পরিবেশন করিয়া।

এহ মাস গেল কন্যা না পুরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি আসিল জৈষ্ঠ মাস ॥
জ্যৈষ্ঠ না মাস হে কন্যা জেটুয়া ১৪ পাকে আম।

* * * *

আম খাইলাম কাঁটাল হে খাইলাম আরও গাভীর দুধ।
কতদিনে খণ্ডিবে অভাগীর মনের দুখ ॥
এহ মাস গেল কন্যা না পুরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল আষাঢ় মাস ॥
আষাঢ় মাসেতে হে কন্যা কিস্‌সানে ১৫ কাটে ধান।
কোঁড়া ১৬ পাখির কান্দনেতে শরীর কম্পমান ॥
হঁওয়া পাখির কান্দনেতে পাঁজার কৈলে শেষ।
ডউকির ১৭ কান্দনেতে মুঞ্ঞ ছাড়িমু বাপের দেশ ॥
এহ মাস গেল কন্যা না পুরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল শ্রাবণ মাস ॥
শ্রাবণ মাসেতে কন্যা কিস্‌সানে ওয় ১৮ ওয়া ১৯।
হাড়ি কোণে ২০ করিছে মেঘ গগণে বর্ষে দেওয়া২১ ॥
বর্ষেক্ রে বর্ষেক্ রে দেওয়া বর্ষেক পঞ্চ ধারে।
আমার ঘরে নাই সাধু ফিরিয়া আসুক ঘরে ॥
এহ মাস গেল কন্যা না পুরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল ভাদ্র মাস ॥
ভাদ্র না মাসেতে হে কন্যা পাকিয়া পড়ে তাল।
জুগীর জুগাণী লইয়া হস্তে লব তাল ॥
হস্তে লব তাল হে প্রিয় মাগিয়া খাব দেশে।
দুই কাণে দুই কুণ্ডল পিন্দিয়া* যাব সাধুর দেশে ॥
এহ মাস গেল কন্যা না পুরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল আশ্বিন মাস ॥
আশ্বিন মাসে হে কন্যা দুর্গা অষ্টমী।
ধানে দুর্ব্বায় করে পূজা বিধবা ব্রাহ্মণী ॥

১৪। জেটুয়া—জ্যৈষ্ঠ সম্বন্ধীয়। ১৫। কিস্‌সান—কৃষাণ—কৃষক; ১৬। কোঁড়া—জলচর পক্ষীবিশেষ।
১৭। ডাউকী—ডাহুকী; ১৮। ওয়—রোয়—রোপণ করে; ১৯। ওয়া—রোয়া—রোপা—বীজধান্যগাছ;
২০ হাড়িকোণ—উত্তরপশ্চিম কোণ। ২১। দেওয়া—দেবতা—মেঘ; * পিন্দিয়া—পরিয়া।

পূজুক পূজুক পূজা মাগিয়া লব বর।
আমার সাধু ফিরলে দিব লক্ষ ছাগল॥
এহ মাস গেল কন্যা না পুরিল আশ।
লহরী যৌবন ধরি নামিল কার্ত্তিক মাস॥
কার্ত্তিক মাসে হে কন্যা তুলসির গোড়ে বাতি।
ঘুরি আসে তোমার সাধু কান্ধে লয়া ছাতি॥
আসুক আসুক সাধু বসুক আমার পাশে।
এলঙ্গ ২২ সুপারী দিব নাটুয়ার বেশে॥
বার মাসী তের পদ নেও বইন গণিয়া।
এই পদ ভুলিয়া গেছে জয়ধর বাণিয়া॥
জয়ধর বাণিয়ার বাপ নামে প্রজাপতি।
দোপায়ায় ২৩ ভুলাইছে পদ কন্যা বারমাসী॥
এক মনে এক চিতে শুনে গর্ভবতী নারী।
তাহার ছাইলা হইলে হবে লঙ্কার অধিকারী॥
জয়ধর বাণিয়া২৪ যে পদ্মাবতীর বাপ।
যেবা গায় যেবা শুনে তার খণ্ডে পাপ॥

২

দক্ষিণ হাওয়াতে নৌকার হা'ল ছিঁড়িছে,
আরে ও মাঝি খবরদার,
দণ্ডে দণ্ডে প্রেমের নদী হয় সাঁতার॥
ঢেউ দিয়া চলাব নৌকা কদমতলার ঘাটে
চেঙ্গড়া* বঁধুক তুলিয়া লব নৌকাতে।
ঢেউ লাগি কলসী ভাঙ্গিল কাদা র'ল কাঁকেতে॥
কোন বিধি চড়ালে আমায় প্রেম গাছে।
এখন নামালে সেন† প্রাণ বাঁচে॥

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ

২২। এলঙ্গ—এলাচী। ২৩। দোপায়া—দ্বিপদী—পয়ার—ছন্দবিশেষ। ২৪। বাণিয়া—বণিক।
* চেঙ্গড়া—যুবা। † সেন—সে—তবে।

মেয়েলী-সাহিত্য

কৃষ্ণকালী

(জনৈক ভদ্রমহিলার মুখে শুনিয়া সংগৃহীত)

শুন সবে এক মনে এই নিবেদন করি
যে মতে গোকুলে কৃষ্ণ হয়েছিলেন কালী ॥
পেয়ারীর প্রেমে মত্ত, শ্যামের তত্ত্ব, বৃন্দাকল্লেন আসি।
হেনকালে, কদম্বতলে, বাজ্‌ল মোহন বাঁশী ॥
মনেতে আকুল হ'য়ে, চল্ল ধেয়ে, কৃষ্ণ দরশনে।
সূর্য্যপূজার ছল করিয়ে গিয়াছেন বিয়ানে* ॥
গিয়া শ্যামকে পেল, আচ্ছা হ'ল, দৈবে ঘটায় দোষ।
হেনকালে বাথান হ'তে এল আয়ান ঘোষ ॥
মাকে জিজ্ঞাসিল, কোথা গেল, বৃকভানু কুমারী।
কেন গো মাতা, কওনা কথা, মন করেছ ভারি ॥
কুটীলা বল্‌ছে বাণি, কলঙ্কিনী, নাইগো কুলের ভয়।
নন্দের ব্যাটা, সঙ্গে ঘ্যাটা, সর্ব্বলোকে কয় ॥
শুনিয়া লাগে ধন্দ, তোমার মন্দ, আমার সর্ব্বনাশ।
মরব লাজে, গোপ সমাজে, করবে উপহাস ॥
সেত গরুর রাখাল কানাই, গুণ কিছু নাই, তাই লেগেছে মনে ॥
দিবসে নিত্য আসি, বাজায় বাঁশী, ঘোল নষ্ট করে।
সে যে ননি চোরা, মহৎ মারা, পালেয়া ফেরে ডরে ॥
এক দিন ঘাটে, ক'রেছে বটে, গোপীর বসন চুরী।
আজ গোকুলে, নাগাল পেলে, ভাঙ্‌ব কারি কুরি ॥
মারব ঝাঁটার বাড়ি, গোকুল ছাড়ি, কাল পালায়ে যাবে।
সাধ করেছে কেমন ব্যাটা মাখন লুটে খাবে ॥
শুনিয়া মার্‌ মার্‌ মার্‌, শব্দ তার, শুনিয়া কমলিনী।
কাঁপছে ডরে, বঁধুর তরে, বল্‌ছে বিনয় বাণি ॥
শ্যামরায় উপায় বল, আয়ান এল, বাকি নাহি আর।
শরম ভরম উভয় চরণ, ঐ রাঙ্গা চরণ, করেছি সার ॥

---

* বিয়ানে—বিহানে—প্রাতঃকালে।

শ্যাম লুকিয়ে থাক্‌ব কোথা, থান নাই হেথা, বল বংশীধারী।
আজ কেমনে, এই সময়ে, বাঁচ্‌বে তোমার প্যারী॥
তখন কৃষ্ণ বলে, কদমতলে, আমি হব কালী।
কে মারবে, কে ধরবে, কে দিবে তোমায় গালী॥
হাতে বাঁশী ছিল, অসি হল, হলেন বামা ছন্দ।
ভুবন ভুলান রূপ দেখিয়া লাগে ধন্দ॥
পায়েতে সোনার নুপুর, বাজ্‌ছে মধুর, বাঁকপাতামল সাজে।
তাড় কঙ্কন চাঁপকলিকে কট্‌কে ঘুঙুর বাজে॥
কালাচাঁদ হল কালী, দেখ্‌তে ভালি, কর্ণে জবার ফুল।
গুণ্‌গুণ্‌গুন্‌ রব করিয়ে ফির্‌ছে অলিকুল॥
তখন আয়ান বলে, কদমতলে, মা এসেছেন বটে।
ধন্য ধন্য কমলিনী কে কলঙ্ক রটে॥
যশোদা তত্ত্ব পেয়ে, এলেন ধেয়ে, ভক্তিভাবে মনে॥
ওগো মা শমনতরা, বিপদহরা, জয় শিবশঙ্করী।
শমনদূতে ঘিরল এসে বাঁচি কিম্বা মরি॥
ওগো মা কংসের দূত, অবিরত, ফির্‌ছে কংসের দূত।
দৃষ্টি দিয়ে মা তুমি রেখ নন্দসুত॥
তারামায়ের গুণজাহিরী তবে সে বুঝা যাবে॥
ব্রজের রাখাল সবে, বল্‌ছে তবে, হেঁট করিয়ে মাথা।
আজ কেন আনন্দময়ী মা এসেছেন হেথা॥
ব্রজের ধন্য লতা তমালপাতা ধন্য বৃন্দাবন।
ধন্য ধন্য রাধাকৃষ্ণের এক খানে মিলন॥

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।

রঙ্গপুরের জাগের গান।*

রঙ্গপুরের সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে তিন প্রকার গান প্রচলিত। জুগীর গান, ভাওয়াইয়া গান ও জাগগান। এই তিন প্রকারের গান, রঙ্গপুরের নিজস্ব; অন্য স্থানে এ গানের প্রচলন

---

* জাগগান শুধু রঙ্গপুরের নহে। রঙ্গপুর, ধুবড়ী, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ী প্রভৃতিতে শুনা যায়। মদন চতুর্দ্দশী উৎসব উপলক্ষেই জাগগান রচিত। জাগগান মুখে মুখেই প্রায় শিখিয়া থাকে ও কেহ কেহ লিখিয়াও লইয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই একটা ভয়ানক সঙ্কট—

নাই। রাজা মাণিকচন্দ্রের পত্নী মীনাবতী (ময়নাবতী) হাড়িপা শ্রেণীর কোন সিদ্ধ যোগীর নিকটে শিষ্যত্বগ্রহণ করেন। মীনাবতীর পুত্র গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রকেও সেই সিদ্ধ পুরুষের শিষ্য হইবার জন্য রাজ্ঞী মীনাবতীর আদেশ ও সেই আদেশে রাজা গোপীচন্দ্র সেই সিদ্ধ পুরুষের শিষ্য হইবার জন্য প্রস্থান করেন।, সিদ্ধপুরুষকর্ত্তৃক গোপীচন্দ্রের নানা প্রকার পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয় লইয়াই জুগীর গানের সৃষ্টি। রঙ্গপুরের এক সম্প্রদায় জুগী আছে, তাহারা চুণ বিক্রয় করে, শঙ্খ প্রস্তুত করে ও বস্ত্রবয়ন করে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তিনটী লোকে একটী সম্প্রদায় প্রস্তুত করিয়া উপরি উক্ত জুগীর গান করিয়া ভিক্ষা করে।

কৃষকেরা হলবহনের, ধান্যক্ষেত্র হইতে ঘাস উন্মোচনের ও ধান্য কর্ত্তনের সময়ে দলবদ্ধ হইয়া উচ্চকণ্ঠে "ভাওয়াইয়া" গান করিয়া থাকে। "অবিকারত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া" এই 'ভাব' শব্দ হইতেই বোধ হয় ভাওয়াইয়া শব্দের উৎপত্তি। রঙ্গপুরে রাজবংশী জাতিদিগের ভাষায় অনেক খাঁটি সংস্কৃতশব্দ, প্রাকৃতশব্দ ও পালী শব্দ আছে। প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে অধিকাংশ সংস্কৃত শব্দের বকার স্থানে ওকার আদেশ হয়। দেব শব্দের প্রাকৃত 'দেও' রাজবংশী শব্দও 'দেও'। ভাওয়াইয়া গানের অধিকাংশই পূর্ব্বরাগ লইয়া রচিত। বোধ করি পূর্ব্বরাগ লইয়াই প্রথমে ভাওয়াইয়া

অক্ষর দ্বারা উচ্চারণ প্রকাশ করা। বর্ণমালায় যে কয়টী বর্ণ আছে তাহা ঐ বর্ণগুলির আবিষ্কার সময়ের উচ্চারণ বুঝাইবার নিমিত্ত বৈদিকসময়েও বর্ণমালার অক্ষরগুলি ব্যতীত অন্যান্য সঙ্কেত দ্বারা শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ বুঝান হইত। এক একটী বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ প্রকটিত হইত। কিন্তু কালে বৈদিক সঙ্কেত গুলি লোপ পাইল। পুরাণাদির হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ ভিন্ন অন্য ভেদ রহিল না। তৎপর এখন সে ভেদ টুকুও বড় নাই। এখন আর পাঠের সময় হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ করিয়া পাঠ করা হয় না। সুতরাং বলিবার সময় উচ্চারণের যে ভেদ থাকে লিখিবার সময় সে ভেদ রাখা বড় কঠিন। উচ্চারণগুলি যিনি অবগত আছেন, তিনি লিখন দেখিয়া বুঝিয়া লইতে পারেন। উচ্চারণানভিজ্ঞ লিখন দেখিয়া উচ্চারণ বুঝিতে সমর্থ হইয়া উঠেন না। এই জন্যই ভিন্ন প্রদেশবাসী যাহারা লিখন দেখিয়া সংস্কৃত, বাঙ্গালা, আসামী, হিন্দুস্থানী বা মারাঠী ভাষা বুঝিতে পারেন, তাঁহারও আসামী, হিন্দুস্থানী, বা মারাঠী উচ্চারণ বুঝিতে পারে না। অর্থাৎ কথার প্রকৃত উচ্চারণ করিতে হইলে; বর্ণবিন্যাস দেখিয়া অভ্যাসের সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হয়। এই জন্যই কথ্য ভাষা উচ্চারণ বর্ণ বিন্যাস দ্বারা যথাযথরূপে প্রতিবর্ণিত হয় না।

জাগের গান রঙ্গপুরাদি স্থানের অথবা কমতাবিহারী ভাষায় গান। কমতাবিহারী ভাষার উচ্চারণ অপর স্থানের উচ্চারণ হইতে অল্প বিস্তর পৃথক্‌। অথচ বর্ণমালা এক। সুতরাং বর্ণমালার অক্ষর দ্বারা উচ্চারণ বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। তজ্জন্য প্রকৃত উচ্চারণ বুঝাইতে হইলে কতকগুলি সঙ্কেতের দরকার। সঙ্কেতগুলি এখনও স্থির নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই। যতদূর পারা গিয়াছে সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা দ্বারাও উচ্চারণ সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বারান্তরে এ বিষয় বিশেষ আলোচনা করা যাইবে। শ্রীপঞ্চানন সরকার—পত্রিকা-সম্পাদক।

গানের সৃষ্টি হইয়াছে; সেই জন্য 'ভাব' শব্দের প্রাকৃত 'ভাও' ও রাজবংশী ভাষায় 'ভাওয়াইয়া' নামে গানের নামকরণ হইয়াছে। পরে যাত্রা গানের মত এই গানে বিরহ প্রভৃতিও স্থান পাইয়াছে। রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব্ব জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, আমাদিগের প্রিয় ছাত্র ও বন্ধু ডাক্তার গ্রীয়ারসন্, রঙ্গপুরে অবস্থানের সময়ে ইতর শ্রেণীর অনেক গান সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে জুগীর গান ও অনেক ভাওয়াইয়া গান ছিল। কিন্তু তিনি বহু চেষ্টাতেও জাগের গান সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, আমিও এ পর্য্যন্ত পারি নাই। জাগগায়কেরা রাজপুরুষের নিকটে বা পূজনীয় ব্যক্তির নিকটে এই অশ্লীলতাদুষ্ট গান গাহিতে বা বলিতে একান্ত অসম্মত ছিল; সম্প্রতি আমি কোন কার্য্যব্যপদেশে আমার জন্মভূমি ইটাকুমারী গ্রামে গিয়াছিলাম; কতকগুলি গায়ককে আনাইয়া বহু যত্ন ও বহু চেষ্টায় জাগের গানের কিয়দংশ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। সেই সংগৃহীত জাগের গান, আজ আমি রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদ্‌কে উপহার প্রদান করিতেছি।

চৈত্র মাসের শুক্লত্রয়োদশী তিথিতে কামদেবের পূজা করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের মূলে কামদেবের পূজা করিতে ও তাঁহাকে চামর বা ব্যজন দ্বারা ব্যজন করিতে হয়; শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা। রঙ্গপুরে বহির্বাটীতে ভদ্রলোকেরা দুই তিনটী বংশখণ্ড প্রোথিত করেন ও দুইটী বা তিনটী দীর্ঘ বস্ত্রজড়িত বংশখণ্ডের অগ্রভাগে চামর দিয়া, সেই প্রোথিত বংশখণ্ডে আবদ্ধ করেন; তাহাতেই কামদেবের পূজা হয়। রাজবংশী জাতীয়েরা পল্লী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, কোন প্রান্তরে এইভাবে কামদেবের পূজা করেন; সেই পূজোৎসবে গায়কগণ কর্ত্তৃক এই জাগগান উদ্গীত হইয়া থাকে। রামায়ণ, কবিকঙ্কণ, পদ্মাপুরাণ গানে যেমন মূল গায়ক হস্তে চামর গ্রহণ করিয়া গান গায় ও দোয়ারেরা মন্দিরা বাজাইয়া ধুয়া ধরে; জাগগানেও মূল গায়ক ও উপগায়কেরা সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। এই গায়কদিগের মধ্যে একজন উপস্থিত কবি থাকে, তাহাকে মতিহারী বা ডাকালিকোবা বলে। মতিহারীর এক হস্তে একটী কাঠের হাতুড়ী অন্য হস্তে একটী স্থূল কাষ্ঠখণ্ড বা ডাকালি থাকে। গান গাহিবার সময় মধ্যে মধ্যে সেই মতিহারী অগ্রসর হইয়া হস্তস্থিত ডাকলিতে বা কাষ্ঠখণ্ডে হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করিয়া সময়োপযোগী (তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত করিয়া) দুই চরণের একটী কবিতা বলে। কোন কোন দলে মতিহারীর সঙ্গে ঠক্কর দিবার জন্য স্ত্রীবেশধারী এক এক জন পুরুষ থাকে, তাহারা মতিহারীর সহিত উপস্থিত কবিতার লড়াই করে। এই গানদ্বারা কামকে জাগ্রত করা হয় বলিয়া বোধ হয় এ গানের নাম 'জাগগান' হইয়াছে। জাগগান দ্বিধাবিভক্ত—কাণাইধামালী ও মোটাজাগ। মোটাজাগ অত্যন্ত অশ্লীল বলিয়া, প্রান্তরে ভিন্ন কাহারও বাটীতে কখন হয় না। কাণাইধামালী অনেক সময় অনেক ভদ্রলোকের বাটীতেও হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাবে, যেমন অমূর্ত্তের দেবদেবীর পূজা অন্তর্হিত হইতেছে, সেইরূপ রাজবংশী জাতির মধ্যে আর কামদেবের পূজার প্রাদুর্ভাব নাই। কামপূজার সঙ্গে সঙ্গে

জাগগানেরও অন্তর্দ্ধান দেখিতেছি। জুগীর গান, ভাওইয়া গান ও জাগের গান কোন দিন লিখিত ছিল না; এক্ষণেও সমস্ত জুগীর গান, সমস্ত ভাওয়াইয়া গান ও জাগের গান কেহ লেখেন নাই।* যদি এখন এই সকল গান সংগ্রহ করিয়া লেখা না যায়, তবে এই সকল দুর্ল্লভ গানের সত্তা আর পৃথিবীতে থাকিবে না। এই প্রাচীন গানগুলি না থাকিলে বঙ্গভাষার ক্রমোন্নেষ ও বঙ্গসাহিত্যের ক্রমোন্নতি বুঝিতে পারা যাইবে না; প্রাচীন আচার-ব্যবহার বুঝিতে পারা যাইবে না; পরাধীনতার মধ্যেও যে একরূপ স্বাধীনতা ছিল, বুঝিতে পারা যাইবে না; ইতর শ্রেণীর লোকের মধ্যেও যে নির্ভীকতা, সৎসাহসিকতা ছিল, বুঝিতে পারা যাইবে না; আর বুঝিতে পারা যাইবে না, তাহাদির ধর্ম্মভাব, তাহাদিগের যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্টি।

আমরা যেমন বিলাসিতায় উন্মত্ত হইয়াছি, আমাদিগের যেমন পাশ্চাত্য বায়ু-সংস্পর্শে ও চাকচিক্যময় বস্তুর প্রলোভনে প্রবৃত্তি কলুষিত হইয়াছে, তাহাদিগের তাহা ছিল না। আমরা যেমন বর পছন্দ করিতে যাইয়া একটী নধর চেহারার 'কফ্' 'কলার্' সংযুক্ত জামা দ্বারা আবৃত রমণীজনোচিত কমনীয় দেহ ও সুচিক্কণ সুবর্ণ-দণ্ড-মণ্ডিত চশমা ধারী যুবককে পছন্দ করি, তাঁহারা কিন্তু তাহা করিতেন না। প্রাচীন সাহিত্য হইতে এই সকল ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিবার জন্যও কীট-দষ্ট প্রাচীন সাহিত্যের আদর করিতে হয়। এই আদর করিতেছেন বলিয়াই সাহিত্য-পরিষদের উপরে আমাদিগের একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা। সেই মহান্ কার্য্যের সহায়তা কল্পে যদি কিছু করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আত্মপ্রসাদ জন্মে। এই জাগ গানের কিয়দংশ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি বলিয়াই, আমারও তাই আত্মপ্রসাদ। আমি জাগের যতটুকু সংগ্রহ করিয়াছি, তদ্ভিন্ন আরও অনেক আছে বলিয়া আমি অনুমান করি। আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে কাণাইধামালীর চারিটী পালা আছে, ও মোটা জাগের একটী পালা আছে। মোটা জাগের দীর্ঘ পালাটীকে তিন চারি খণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে। রচয়িতা সেইরূপ বিভাগ করেন নাই। তিনি একেবারে শেষে তাঁহার নিজের নামের ভণিতা দিয়াছেন বলিয়া আমি তাহাকে এক পালা বলিলাম। গ্রন্থকারের নাম রতিরাম দাস। তিনি তাঁহার আত্ম পরিচয়ে জাতি ও নিবাস ভূমির উল্লেখ করিয়াছেন। জাতিতে তিনি রাজবংশী ছিলেন। রঙ্গপুরের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ ইটাকুমারী গ্রাম তাঁহার নিবাস ভূমি। কোন্ সময়ে তিনি এই গানের রচনা করিয়াছেন, তাহার সন তারিখ দেন নাই। না দিলেও সন তারিখ সংগ্রহ করিতে আমাদিগের কষ্ট হয় না। তিনি ইটাকুমারীর খ্যাতনামা ভূমাধিকারী শিবচন্দ্ররায়ের সম-সাময়িক ব্যক্তি। শিবচন্দ্রকে কোম্পানির ইজারদার, ইতিহাস প্রসিদ্ধ অত্যাচারী দেবীসিংহ

* কল্যাণভাজন রঙ্গপুর-শাখা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীমান্ হরগোপাল দাস কুণ্ডু ও শ্রীমান্ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ ভাওয়াইয়া গান সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং কতকগুলি সংগ্রহও করিয়াছেন, সে জন্য বঙ্গবাসীর বিশেষতঃ রংপুরবাসীর আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

কারারুদ্ধ করেন,—কবি রতিরাম তাঁহার রচিত জাগের গানে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। বাগ্মি-প্রবর মহাত্মা এডমান বার্ক পার্লিয়ামেণ্টে দেবীসিংহের অত্যাচার কাহিনী বলিতে যাইয়া দুইশত 'লেডীকে' অচৈতন্য করিয়াছিলেন, আর কবি রতিরাম গায়ককে চামরহস্তে দিয়া তাঁহার সহজ গ্রাম্য ভাষায় দেবীসিংহের অকথ্য অত্যাচারের ও মন্বন্তরের বর্ণন গাওয়াইয়া আজিও সামাজিকবর্গকে—শ্রোতৃবর্গকে অশ্রুসিক্ত ও উত্তেজিত করিতেছেন। নবদ্বীপ-রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইয়া, সম্মানিত হইয়া, সংস্কৃত বিশুদ্ধ ভদ্র ভাষায় বঙ্গকবি ভারতচন্দ্র, বঙ্গের মহাকবি ভারতচন্দ্র, তাঁহার অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর লিখিয়া রাজা ও পণ্ডিতসমাজ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছিলেন, আর ঠিক সেই সময়ে হিমালয়ের পাদদেশে রঙ্গপুরের একটী প্রসিদ্ধ পল্লীতে খ্যাতনামা শিবচন্দ্রের অধিকারে বাস করিয়া রঙ্গপুর প্রচলিত সহজ ভাষায় কবি রতিরাম কাণাইধামালী পালা রচনা করিয়া সে সময়ের অর্দ্ধ-নবদ্বীপ ইটাকুমারীর পণ্ডিতমণ্ডলী ও ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছিলেন কি না জানি না। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, রতিরাম প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। তিনি তাঁহার রচনায় রসের উচ্ছ্বাস, ভাবের সৌন্দর্য্য, অলঙ্কারের চাতুরী প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কাহারো অনুকরণে এই গানের রচনা করেন নাই। এই গানে যেমন স্বাভাবিকতা আছে, পল্লীচিত্র আছে, সেইরূপ নূতন ভাবের অলঙ্কারের সন্নিবেশ আছে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধিকার পরস্পর উক্তিতে তাহা পরিব্যক্ত। কালিদাসের "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশু-র্মহাভুজঃ" যেমন পুরুষোচিত পুরুষের বর্ণনা, কবি রতিরামেরও সেইরূপে পুরুষোচিত পুরুষের বর্ণনা, শ্রোতৃবর্গ ক্রমে শুনিবেন—

"মাঠের মতন, কেমন ওসার পাটার মতন বুক।
সে কঠিন বুক, দেখি শাত্রুর শুকাইয়া যায় মুখ॥"

* * * * *

মোটা মোটা তার, হাত দুইখানি, লোহা দিয়া যেন গড়া।
ডানা দুইখানি, লোহার মতন, হাড়ে মাংসে রগে জড়া॥
সিদা যদি করে, বাইমের মতন, মাঝত মাঝত ফুলে।
জোরেতে নগুলে, টিপা যদি যায়, খাল নাহি পড়ে মূলে॥

আর মহাকবি ভারতচন্দ্রের পুরুষের রূপ বর্ণন—

"বাহু সুললিত কামের কনক আশা॥"

—"ত্রিবলী বন্ধন, দেখয়ে যেজন, তার কি মোচন আর॥"

পদ—সুললিত অর্থ সুকোমল। আবার পুরুষের ত্রিবলী! পুরুষের ত্রিবলী বর্ণন করিয়া ভারতচন্দ্র বাহোবা লইয়াছেন। সুললিত বাহুর বর্ণন করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ধন্যবাদ পাইয়াছেন, আর কবি রতিরাম নায়কের বাহুতে বাইম মাছের মত মধ্যে মধ্যে উচ্চ স্থান (Muscle) সন্নিবেশ করিয়া, লৌহনির্ম্মিত ভুজ দণ্ডের বর্ণনা করিয়া, নির্ভিক সাহসী দেবী-

সিংহের প্রতিফলদাতা শিবচন্দ্রের নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন কিনা জানিনা। রসের আলয় বক্ষঃস্থল বলিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার মহাকবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। আর কবি রতিরাম মাঠের মত প্রশস্ত বক্ষঃস্থলের উল্লেখ করিয়া,শিলাপট্টের মত দৃঢ়তর বক্ষঃস্থলের বর্ণনা করিয়া কিঞ্চিৎ কবিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন কি না জানি না। ভীরু, তপস্বী নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় নবদ্বীপের কুম্ভকারেরা দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে একটী খেলার বালকোচিত-মৃদুল বংশ নির্ম্মিত ধনুঃ প্রদান করিয়া, পুষ্পময় ধনুঃ প্রদান করিয়া, রতিপতির সাজে সাজাইয়া বাঙ্গালী ধনী জমিদারের একটী বিলাসী পুত্রের সৃষ্টি করিয়াছে! আর যত কিছু বীরত্ব, যত কিছু শৌর্য্য, যত কিছু কার্কশ্য সমস্ত মহিষাসুরের উপর অর্পণ করিয়া অলঙ্কৃত করা হইয়াছে। ভদ্রলোকের যেন অনাবৃতবক্ষঃ কমনীয় নারীমূর্ত্তি হইতেই হয়। বীরোচিত মূর্ত্তি যেন ছোট লোকের। বীর অর্থ 'চোয়াড়' ইহা নবদ্বীপাধিপতির অভিধানে প্রদর্শিত শব্দ। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বেও রাজবংশী জাতি ক্ষাত্রতেজ ভুলে নাই। আর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। রাজবংশীয়েরা শৌর্য্যবীর্য্য ভুলে নাই বলিয়াই, এই রঙ্গপুর, বঙ্গদেশের ভাবী কল্যাণকর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে পারিয়াছে। আজ বীর কবি রতিরামের লেখনী হইতে আর্য্যকুল ললনা অসূর্য্যম্পশ্যা রাজমহিষী "জয়দুর্গার" শৌর্য্যবীর্য্য পরিস্ফুট হইয়াছে—আর পরিস্ফুট হইয়াছে অত্যাচারিত, অপমানিত শিবচন্দ্রের বীরত্ব গাথা। অপ্রতিগ্রাহী ব্রহ্মণ্যনিষ্ঠ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এক দিন রাখী পূর্ণিমার দিবস, বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান বৈদ্যজাতীয় মহারাজ রাজবল্লভের হস্তে রাখী বন্ধন করিয়া, রাখীর দক্ষিণাস্বরূপ, ভোজনের দক্ষিণাস্বরূপ বাকী দেয় রাজস্ব ভিক্ষা লইয়াছিলেন; অনেক বার পুত্রের সহিত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াও নবাব দরবারে আবার চাটুকারের কার্য্য করিয়াছিলেন। আর রতিরামের শিবচন্দ্র একবার মাত্র কয়েক দিনের জন্য বা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কারাদণ্ডের অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাহার ফলে বঙ্গের উত্তর প্রান্ত হইতে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দেবীসিংহকে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছে। যদিও এ গুলি ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু সেই চিত্র যথাযথ ভাবে অঙ্কিত করিয়া একজন নিরক্ষর শ্রেণীর রাজবংশী জাতীয় কবি এরূপ ভাবে দেখাইয়াছেন, মাননীয় শাখা পরিষদের সভাগণ শুনিলে লোমাঞ্চিত হইবেন। বেণীসংহারে ভীমকর্ত্তৃক দুঃশাসনের বিদীর্ণ বক্ষঃস্থল হইতে প্রবাহিত উষ্ণ শোণিত পানের অভিনয় দেখিয়া বা শুনিয়া যেমন সামাজিকবর্গ পরম প্রীত হয়েন, আজ আপনারাও সেই প্রীতি অনুভব করিবেন। রতিরাম কেবল আদি রসের কবি নহেন; বীর রৌদ্ররসেরও কবি। দুর্ভাগ্যবশতঃ এত দিন তিনি ও তাঁহার সুধাময় কবিতা হিমালয়ের অন্ধ তমসাচ্ছন্ন গুহায় লুক্কায়িত ছিল, আজ আমি তাহার কিয়দংশ সংগ্রহ করিয়া একশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। বঙ্গে বুঝি আর এমন কবি জন্মে নাই। তাঁহার মধুর কল্পনায় একবার প্রেমের চিত্র দেখুন—

"জনম ভ'রিয়া, বন্ধুয়ার রূপ দেখিছোঁ মিটে না আশ।
দেখিতে দেখিতে, তেঁওতো মিটে না, আরো বাড়ে হাবিলাশ॥
চোকের কখন, আলিস হয় না, পড়ে না চোকের পাতা।
সে রূপের সনে, মিছামিছি কেনে দেখাইম লতাপাতা॥
বন্ধুয়ার রূপ, বন্ধুয়ার মত, আর নাই সে রূপের মত।
কালা মাণিকের, রঙ্গও হার মানে, তোমাকে বুজা'মো কত॥"

যদি কেহ প্রণয়ে পড়িয়া থাকেন, তবে অবশ্যই বুঝিবেন "তেঁওতো মিটে না আশ" কত দূর সত্য। দেখিয়া দেখিয়া আরও দেখ, কখনই অভিলাষ পূর্ণ হইবে না, আরও দেখিতে ইচ্ছা হইবে। চক্ষের দেখাতেও আশা মিটিবে না, চক্ষের আলস্য হইবে না, চক্ষের পলকও পড়িবে না। যোগীন্দ্রের নির্নিমেষ নয়নে আরাধ্য দেবতার দর্শনের ন্যায় দর্শন পিপাসা আরও বর্দ্ধিত হইবে। তাহার সহিত চন্দ্রের তুলনা হয় না, সুরভি পুষ্পের তুলনা হয় না; পল্লবিত পুষ্পিত লতিকার তুলনা হয় না। সে গুলিকে একবার দুইবার দেখিলে, আর দেখিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, ইহা খাঁটি সত্য। মহাকবি কালিদাস "নবমিন্দুকলাং লোকে কেন ভাবেন দৃশ্যতে" কেন যে বলেন—বুঝি না। তাই রতিরাম বলিতেছেন, "মিছামিছি কেনে দেখাইম লতাপাতা।" ভ্রূর বর্ণনা অনেক কবিতায় দেখিয়াছি, অনেক কবিতায় শুনিয়াছি।

"—ভুরু দুটী তার কাল পিপিড়ার সা'র।
কাণের ছেন্দা হাতে বাহির হইছে কি মধু খাইতে তার॥"

শর্করার লোভে পিপীলিকার শ্রেণী রন্ধ্র হইতে বহির্গত হয়। কবি বলিতেছেন, নায়কের ভ্রূযুগের বর্ণনায় বলিতেছেন,—কর্ণরন্ধ্র হইতে কৃষ্ণবর্ণের পিপীলিকার শ্রেণী প্রিয়তমের কাদৃশ মধু খাইবার জন্য প্রধাবিত হইতেছে?—সম্পূর্ণ নূতন ইহাতে মাধুর্য্য আছে, ব্যঙ্গার্থ আছে, নূতনত্ব আছে। আবার নায়িকার চক্ষু বর্ণনে, ভ্রূযুগলের বর্ণনে কবি বলিয়াছেন, উড়ন্ত খঞ্জন পাখী দুটীকে মদন রাজা ভ্রূ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিয়াছেন। সামাজিক বর্গের মধ্যে কেহ কি বলিতে পারেন এরূপ ভাবের কোন কবিতা শুনিয়াছেন? রূপের তরঙ্গে দুইটী পদ্মপুষ্প ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, আর ভ্রমর শ্রেণী তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। কই আমরা তো সংস্কৃত সাহিত্যে, বঙ্গ-সাহিত্যে এমন নূতন ভাব তো পাই না? চন্দ্রকর্তৃক তাড়িত, পাতালে পলায়িত অন্ধকার রাশি নায়িকাকে চন্দ্র ভাবিয়া, তাহার পশ্চাৎভাগের ভূমি বিদীর্ণ করিয়া, পশ্চাৎভাগে অকস্মাৎ নায়িকাকে আক্রমণ করিতেছে এগুলি আর কিছু নহে—নায়িকার উন্মুক্ত কেশদাম। ইহা কি কখনো দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন? আমরা তো দেখি নাই, শুনি নাই। ধন্য কবি রতিরাম তোমার অপূর্ব্ব কল্পনা! সমুদয় জমিদারদিগকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, সকলের ধনরাশি অপহরণ করিয়া, যেমন দেবীসিংহ ও হরেরাম কঠিন, স্থূল, উন্নত ও বর্দ্ধিত হইয়া-

ছিল; সেই রূপ নায়িকার কুচযুগ—সমস্ত অঙ্গকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহাদিগের সার গ্রহণ করিয়া কঠিন, স্থূল, উন্নত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্তও নূতন। নিতম্ব ও স্তনমণ্ডল দুইদিকে মধ্যদেশ হইতে সার গ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃশ করিয়া ফেলিয়াছে। রঙ্গপুরের ব্রাহ্মণডাঙ্গা ও মন্থনায় যেমন ফতেপুরের দুই অংশ গিয়াছে বলিয়া, ফতেপুর জমিদারী ক্ষীণ হইয়াছে। তাহার উপর আবার পঙ্কসনা নামধেয় কাগজের গাদি—ত্রিবলীর সহিত তাহার তুলনা। নিতম্ব ও শ্রোণীবিম্বকে কামরাজার দুর্গ বর্ণন করিতে যাইয়া, কবি হেমময় মেখলাকে তাহার পরিখা করিয়াছেন; আর করিয়াছেন উরু হইতে পদদ্বয়কে দুইটী প্রকাণ্ড (রাজপ্রাসাদের নিকট) স্থূল, বহির্দ্দিকে ক্রমে কৃশ দুইটী সুবর্ণময় রাজপথ। আমরা এই কবিতার যখন যে অংশকে পাঠ করি, তখনই মোহিত হই। বঙ্গ-সাহিত্যের দুর্ভাগ্য এত দিন এ অমূল্য কবিতা বঙ্গ সাহিত্যে প্রচারিত হয় নাই।

১। রাধার শাক তোলা।

খুঁরিয়া ১ বতুয়া ২ শাকে খেত ৩ গেইছে ৪ ভরি।
রাধা যায় শাক, তুলিতে নয়া ৫ ডালি ধরি॥
সরু কাপড়া ৬ প'রছে রাধা কেবল নয়া খোপ।
নচপচা ৭ শাক দেখিয়া রাধার হইল লোভ॥
বাছের ৮ বাছ তোলে রাধা ক্ষেতের ভিতর যা'য়া।
কোচা ৯ ভরিয়া তুলি শাক থোয় ডালি ভরিয়া॥
দেওয়ানীয়া ১০ ভাল বাসে খুঁরিয়া শাকের ভাজা।
শাক তু'লতে তু'লতে মোক কইল্লে ১১ ভাজা ভাজা॥
লাজ নাই লজ্জা নাই গাবুর ১২ বউরী ১৩।
শাক তুলিতে এমন বউকে দেয় কেমন করি॥
ঐ যে আইসে নন্দের বেটা জুয়া'ন গাওয়ান কানু।
কেনে আইসে আইলে আইলে বুঝিবার না পানু॥
কেমন করি চৌকে চায় গিলিয়া যেমন খায়।
জুয়ান বউরী দেখি এই ভিতি ১৪ ধায়॥
চিটুল ১৫ চাউনি তার মুখে মুচ্‌কি হাসি।
রাস্তায় ঘাটায় ১৬ পাইলে আগে আঞ্চল ধরে আসি॥

১। খুঁরিয়া—নটেশাক, ২। বতুয়া—বাস্তুকশাক, ৩। ক্ষেত—ক্ষেত্র, ৪। গেইছে—গিয়াছে, ৫। নয়া—নব, নূতন, ৬। কাপড়া—কাপড়, সংস্কৃত কর্পট, ৭। নচপচা—নধর ৮। বাছের বাছ—সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ৯। কোচা—কোঁচড়, ১০। দেওয়ানীয়া—বাড়ীর কর্ত্তা, ১১। কইল্লে—করিল ১২। গাবুর—যুবতী, ১৩। বউরি—বউ, ১৪। ভিতি—দিকে, ১৫। চিটুল—চটুল, চঞ্চল, ১৬। ঘাটায়—রাস্তায়; ঘট্টা পথ' হইতে উৎপত্তি।

কোন দিকে যাই এখন এ বড় বালাই।
যে দিকে পালাই এখন সেই দিকে কাণাই ॥
বজ্জর আটুনি ফস্কা গিরো ঘরে মোর তালা।
যেটেসেটে ১৭ পটেয়া দেয় ১৮ রাস্তায় পায় কালা ॥
কালার জ্বালায় মোর অঙ্গ হৈল কালী।
পালাইতে পারিলে বাঁচোঙ্ ১৯ থাকুক পড়ি ডালি ॥
আলুর ক্ষেতে যায়া রাধা হৈল আলু থালু।
যে দিকেতে যায় রাধা সে দিকে যায় কানু ॥
রাধা কয় উহু উহু পায়েঁ লাগিল কাটা।
এমন ভাঙ্গা কপাল মোর কপালে মারোঁ ২০ ঝাঁটা ॥
পাঁও ২১ পাতিতে পারোঁ না মুই কেমন করি যাইম্ ২২।
নিচ্চয় ২৩ ননদীর মুই ঝাঁটা নাত্তি ২৪ খাইম্ ২৫ ॥
খুড়িয়া খুড়িয়া ২৬ আসু খুরমায় বন হাতে ২৭।
আর তো পারোঁনা মুই এত পন্থ ২৮ যাইতে ॥
কে আছে এমন বন্ধু কাঁটা খুলিয়া দেয়।
জনমের মত বিনা মুলে রাধাক কিনি নেয় ॥
বাঁশী থুইয়া হাঁসি হাঁসি রাধার কাছে আসি।
ক্ষেতের মাঝত ২৯ বসি কাণাই সুকুখে যায় ভাসি ॥
কোমল করে কোমল চরণ বুকে ধরে তুলি।
রাধার চরণ ধরিয়া কাণাই সব যায় ভুলি ॥
কাণাই বলে ওগো মামী তোমার পায়ের কাটা।
দাত দিয়া তুলিম মুই নন্দ রাজার বেটা ॥
কোন ভয় নাই মামী আমি আছি কাচে।
রাধা কয় শীগ্গির ৩০ তোল কেউবা দেখে পাচে ॥
রাধার রং কাঁচা সোণা লাল পায়ের তলা।
দেখিয়া দেখিয়া কাণাই হয়া গেল ভোলা ॥
কানু কয় মামী তোমার কাঁটা কই পাও ৩১।
যেমনকার তেমনি ৩২ তোমার আছে মামী পাঁও ॥ ৩৩ ॥

১৭। যেটেসেটে—যেখানে সেখানে, ১৮। পটেয়া—পাঠাইয়া, ১৯। বাঁচোঙ্—বাঁচি, ২০। মারোঁ—মারি, ২১। পাঁও—পা; ২২। যাইম—যাইব, ২৩। নিচ্চয়—নিশ্চয়, ২৪। নাত্তি—লাথি, ২৫। খাইম্—খাইব, ২৬। খুড়িয়া খুড়িয়া—খঞ্জের ন্যায়, ২৭। হাতে—হইতে ২৮। পন্থ—পথ ২৯। মাঝত—মধ্যে, ৩০। শীগ্গির—শীঘ্র ৩১। পাও—পাই, ৩২। যেমনকার তেমনি—যেমন তেমনি, ৩৩। পাঁও—পদ।

কি কাঁটা ফুটিছে তোমার বুঝিতে নারি আমি।
হৃদের কাঁটা তুল্‌তে পারও যদি কও মামী ॥
চুড়িয়া চুড়িয়া ৩৪ দেখনু খুরিয়ার কাটা নাই।
এমন চরণ পাইলাও যদি হৃদে রাখ্‌তে চাই ॥
রাধা কয় ওরে কাণাই একে কাঁটার জ্বালা।
পচ্ছিয়া বাতাসে ৩৫ আরো চৌকে পড়িল বালা ৩৬ ॥
পাঁও ঘাড়ে রাখিয়া কানু চৌকে দিল ফুক।
এ পালা হইল সারা রাধার কত সুখ ॥

২। কৃষ্ণের ধোরে মাছ মারা।

আষাঢ় মাসে ভর বরিষা ৩৭ উজাই নাগিল ৩৮ মাচ ॥
মাচ ধরিতে যায় রাধা কাণাই নাগিল্‌ পাচ ॥
বড় দিঘির বড় ধোরে ৩৯ বড় দিচে নেটা ৪০।
নন্দের বেটার সঙ্গে রাধার সেই খানেতে নেটা ৪১ ॥
কাণাই বলে মেগে ৪২ বর্ষে কেমন জলের ধার ॥
আকাশ হাতে ৪৩ পরে যেমন রূপার শতেক তার ৪৪ ॥
দেওয়া চিল্‌কে ৪৫ মাটিত্‌ প'ড় ডাকে ঐ দেওয়া ৪৬।
ধরাশ্‌ করি চম্‌কি উঠে আমার কোমল হিয়া ॥
তরাশে ৪৭ কাঁপিছে হিয়া হাতাশ ৪৮ খানু ৪৯ মামী।
বুকে চাপি ধরো আসি তবে বাঁচি মানি ॥
ফাঁক নাই ফুক নাই ৫০ প'রছে জলের ধারা।
আকাশে পাতাল ঢাক্‌ছে মেগে চাঁন সুরুজ ৫১ তারা ॥
খাল বিল দিঘী নদী সব একাকার।
তবে কেনে করেন মামী সম্বন্ধ বিচার ॥

৩৪। চুড়িয়া চুড়িয়া—খুজিয়া খুজিয়া, ৩৫। পচ্ছিয়া বাতাসে—পশ্চিম বায়ুতে, ৩৬। বালা—বালুকা। ৩৭। ভরবরিষা—পূর্ণবর্ষা ৩৮। উজাই নাগিল—উজাইয়া মৎস্যের যাওয়া, ৩৯। ধোরে—পুষ্করিণীতে জলের প্রবেশ নির্গম পথ ৪০। নেটা—মৎস্য ধরিবার জন্য প্রস্তুত কর্দ্দমযুক্ত স্থান; উল্লম্ফন দ্বারা পতিত মৎস্য কর্দ্দমালিপ্ত হইয়া আর যাইতে পারে না; সুতরাং ধরা পড়ে, ৪১। নেটা—লেঠা, প্রতিবন্ধ, সঙ্গ ৪২। মেগে—মেঘে ৪৩। হাতে—হইতে ৪৪। শতেকতার—শত শত তার ৪৫। দেওয়া চিল্‌কে—মেঘ বা মেঘাবৃত আকাশে বিদ্যুৎ খেলাইতেছে, ৪৬। দেওয়া—মেঘাবৃত আকাশ, ৪৭। তরাশে—ত্রাসে ৪৮। হাতাশ—হতাশ, ভয় ৪৯। খানু—এ স্থলে পাইনু ৫০। ফাঁক নাই ফুক নাই—নিরবচ্ছিন্ন ৫১। সুরুজ—সূর্য্য।

রাধা কয় কিবা কইস ৫২ নন্দের ছাওয়াল ৫৩।
মাছ মারিতে আসিয়া কেনে ঘটাই'স জঞ্জাল ॥
ধোরের ধারে যায়া রাধা ভাবে সাত পাঁচ।
হাতের বাঁশী ভুমে থুইয়া কাণাই মারে মাচ॥
রাধার মুখের দিগে কাণাই এক দৃষ্টে চায়।
ডাঙ্গর ডুঙ্গর চক্ষু দুটী পলক নাহি তায় ॥
হাঁসিয়া কইছে রাধা এ কেমন চাউনি।
এমন চাউনিতে সাপে ধরয়ে পক্ষিনী ॥
চক্ষু দিয়া দংশ কেনে তুমি কালা সাপ।
নারীক দংশিয়া কেনে কর মহাপাপ ॥
কাল সাপের বিষে আমার অঙ্গ জর জর।
কোন মতে দাঁড়ায়া আছি অঙ্গে দিয়া ভর॥
যমুনার জলে থাকে সেই কালীয়া সাপ।
দংশিয়া দংশিয়া মোকে বড় দেয় তাপ ॥
দেওয়ানিয়া সাপের রোজা চারি দিকে ডাক।
দেখাইবে ৫৪ তায় ৫৫ যদি পায় কালা সাপের নাগ ॥
এ সাপ বিষম সাপ কদমের ডালে ঝুলে।
পাছে পাছে ফিরে সাপ যমুনার কূলে কূলে॥
সারা রা'ত পড়িয়া থাকে ঘরের ছাইকায় ৫৬।
বাহির হৈলে পাও বেড়িয়া মুখের চুমা খায় ॥
কাণাই বলে ভয় নাই আমি সাপের ওঝা।
কত মন্তর জ্ঞান জানি ঔষধ বোজা বোজা ॥
গাঙের জল পড়িয়া দেই কর তায় সিনান।
বিষ নামিবে কাদো ধুবে বাচিবে তোমার জান॥
মাছ ধরিতে সব্ব অঙ্গে লাগিয়া গেইছে কাদা।
ঝক্ ঝক্ করক অঙ্গ যেমন চকচকিয়া চান্দা॥
রাধা কয় মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া।
কেমন তুমি সাপের ওঝা সাপের সাপুড়িয়া ॥
সাপুড়িয়া বাঁশীর সুরে সাপ বাহির হয়া আ'সে।
তোমার বাঁশীর সুরে সাপ জাগিয়া উঠিয়া বইসে॥

৫২। কইস—কহিস্। ৫৩। নন্দের ছাওয়াল—নন্দের ছেলে। ৫৪। দেখাইবে—উচিত ফল দিবে।
৫৫। তায়—তিনি বা সে, ৫৬। ছাইকায়—ঘরের বাহির ধার, ঘরে চালের বাহির অংশে।

তোমার বাঁশীর সুরে সাপ কাণের ছিদ্দির ৫৭ দিয়া।
বসন্ত বাড়ী কর্‌লে সাপ হৃদের গন্তে গিয়া ॥
ঘুমায় না ঘুমায় না সাপ জাগিয়া থাকে সোজা ৫৮।
তোমার বাঁশীর সুরে সাপ খায় মোর কলিজা ৫৯ ॥
আর কিছু মাঙ্গিনা কানু আর কিছু মাঙ্গিনা ৬০।
সাপ বাহির করিয়া কেনাও গুণের ভাগিনা ॥
ছাড়না ছাড়না কেনে ও মোর আঙ্গিনা ৬১।
তুমি না জাগাইলে আমি কখনো জাগিনা ॥
কাণাই কয় (ওরে) মামী কেনে কথার কাটাকাটি।
সিন্নান ৬২ করিয়া উঠ যাই আপন বাটী ॥
এ উজান বয়সে ৬৩ মামী উজান বয়া যাই।
তোমার অঙ্গে অঙ্গ দিয়া একবার সাঁতার খাই ॥
ভরা যৌবন তোমার ভরা পুরা বাণ।
ইয়াত বাঁয়ে সাঁতার দেয় সেই তো ভাগ্যবান ॥
গলা জলে নামিল রাধা করিতে সিন্নান।
আউলাইল মাথার কেশ যে ছিল বিনান ৬৪ ॥
লম্ফ দিয়া পড়ে কানাই অতল জলের মাঝে।
রাধাকে না হেরি কানুর মনে কেমন বাজে ॥
ডুবে ডুবে আসে কাণাই রাধার চরণ তলে।
রাধারে ধরিয়া কাণাই ভাসিয়া গেল জলে ॥
মনের সুখে হাঁসি রাধা কয় হাত তুলে।
কেউকি আছেন দরদিয়া ৬৫ দরিয়ার ৬৬ কূলে ॥
ননদিরে শাশুড়ীকে কইমেন ৬৭ বিচারি।
কুম্ভীরে লইল তোমার যুয়ান বউরী ॥
খাইল ৬৮ ভরা গহনা আছে সেই গুলা দিয়া।
ধুম ধামে কবাক এখন দেওরানিয়ার বিয়া ॥
অকূল দরিয়ায় ভাসিল কলঙ্কিনী রাই।
এ পালা হইল সারা এখন বাড়ী চলি যাই ॥

৫৭। ছিদ্দির—ছিদ্র। ৫৮। সোজা—কেবল। ৫৯। কলিজা—হৃৎপিণ্ড। ৬০। মাঙ্গিনা—ভিক্ষা করি না। ৬১। আঙ্গিনা—প্রাঙ্গন। ৬২। সিন্নান—স্নান। ৬৩। উজান বয়সে—উঠ্‌তি বয়সে। ৬৪। বিনান—গ্রথিত। ৬৫। দরদিয়া—সমদুঃখভাগী, ব্যথার ব্যথী। ৬৬। দরিয়ার—দরি হইতে নির্গত বন্যা। ৬৭। কইমেন—কহিবেন। ৬৮। খাইল—বেত্রনির্ম্মিত পেটিকা।

ক্রোড়পত্র।

পরলোকে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর-শাখা সভার সুযোগ্য সভাপতি ও পিতৃস্থানীয় পরম বিদ্যোৎসাহী, বিদ্বান, উদারচেতা, দয়ালু, কাকিনাধিপতি রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয় গত ২০শে চৈত্র (১৩১৫) শুক্রবার শুক্লা বিজয়া দশমী তিথির রজনীতে উত্তরবঙ্গকে অন্ধকারসমাচ্ছন্ন করিয়া অকালে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

এই শিশু-পরিষৎ পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করার পূর্বেই পিতৃহীন হইয়া দারুণ শেলসম এই শোকোত্তরীয় বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গগত মহাত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করিতেছেন।

ইঁহার সচিত্র জীবনবৃত্ত পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
(রঙ্গপুর শাখা) চৈত্রমাস, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।
রঙ্গপুর।

কেলি-কদম্ব।
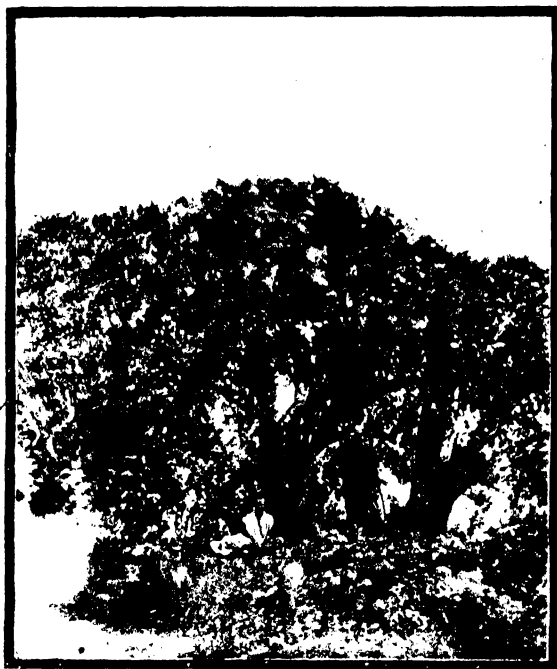
১৪ নং চিত্র।

১৩১৫, ৩য় ভাগ, ৩য়, সংখ্যা।

মালদহ—রামকেলি।

এই বৃক্ষমূলে গৌড়াবস্থান কালে মহাপ্রভু বাস করিয়াছিলেন। ভক্তসমাজ বৃক্ষমূলে যে বেদী বাঁধিয়া দিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

চিত্র সংগ্রাহক—শ্রীঅনাথ নাথ মৈত্রেয়.—রাজসাহী।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

বগুড়ার শিল্পেতিহাস। *

নানাকারণে বগুড়া জেলা উত্তরবঙ্গের মধ্যে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হইয়া উঠিতেছে এবং অনুসন্ধিৎসু বিদ্বজ্জনের গবেষণাপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এই জেলার স্থানে স্থানে প্রাচীন গৌরব ও মহাসমৃদ্ধির যে ধ্বংসাবশেষ-চিহ্ন কালের করাল কবল হইতে রক্ষিত হইয়া আজিও বিদ্যমান আছে, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের নিকটে অমূল্য রত্নরাজী স্বরূপ আদরণীয় হইবার যোগ্য। যে জেলার 'মহাস্থান গড়ের' অভ্যন্তরে কহ্লন ও হুয়েনথ্সঙ্গ-বর্ণিত তড়াগবৃক্ষবাটিকাচ্ছাদিত মহাসমৃদ্ধিশালী "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর" শেষ চিহ্ন গুলি আজিও অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে,—পুরাণপ্রসিদ্ধ প্রথিতনাম্নী করতোয়া নদীর পূত সলিলরাশি দ্বারা যে জেলা প্রবিত্রীকৃত,—জয়ন্তনামা মহারাজ আদিশূর, রাজা পরশুরাম, অচ্যুত সেন ও মুকুন্দ শ্রী প্রভৃতির বীরত্বকাহিনীতে আজিও যে জেলা সজীব রহিয়াছে—তাহা যে প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, তাহা এক প্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু বগুড়া জেলার পূর্ব্বোক্ত সমৃদ্ধি ও গৌরব-কাহিনী বর্ণনা করা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। অদ্য আমরা এই ক্ষুদ্র অথচ মহান্ ভূভাগের প্রাচীন ও আধুনিক মৃত ও জীবিত শিল্পসমূহের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এই ভূভাগে, কতকাল হইল, আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইলেও অনির্ণেয় নহে। এই ভূভাগ যে প্রাচীন পৌণ্ড্রদেশের অন্তর্ভূত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। প্রথিতনাম্নী করতোয়া নদী যে পৌণ্ড্রদেশকে পরিপ্লাবিত করিত, তাহা স্কন্দপুরাণান্তর্গত "করতোয়া মাহাত্ম্যের" বচন দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। "করতোয়া মাহাত্ম্যে" সুস্পষ্ট লিখিত আছে—

"করতোয়ে সদানীরে সরিচ্ছ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে॥

মহাভারতের মতে বালেয় ক্ষত্রিয় "পুণ্ড্র" হইতে পৌণ্ড্রদেশের নামকরণ হইয়াছে। উক্ত

---

* উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বগুড়া নগরে পঠিত।

এই প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তজ্জন্য প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পুণ্ড্র, বলি রাজার ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে জাত বলিয়া কীর্ত্তিত। বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে—

"হেমাৎ সুতপাঃ তস্মাৎ বলিঃ যস্য ক্ষেত্রে দীর্ঘতমসা
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সুহ্মা পুণ্ড্রখ্যাং বালেয়াং ক্ষত্রমজন্যত।"
(বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, ১৮ অধ্যায়)

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের কয়েকটি সূক্তের রচয়িতা এক দীর্ঘতমা ঋষি। এই দীর্ঘতমা ও মহাভারতীয় দীর্ঘতমা উভয়ের পিতার নাম উতথ্য ও মাতার নাম মমতা বলিয়া অবগত হওয়া যায়। সুতরাং ঋগ্বেদের দীর্ঘতমাই যে মহাভারতীয় দীর্ঘতমা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। অতএব ইহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইতেছে যে, সুদূর বৈদিক-যুগে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ৪।৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই ভূভাগে আর্য্য উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল।

প্রাচীন আর্য্যগণ যে চতুঃষষ্টি প্রকার কলাবিদ্যা ও বিবিধ শিল্প বিদ্যায় সাতিশয় নিপুণ ছিলেন, শাস্ত্রে তাহার বহুতর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং অন্যূন ৪।৫ হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে যে এতদঞ্চলে বিবিধ শিল্প বিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা এক প্রকার নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে।

হিন্দুজাতির মধ্যে নানা প্রকার শিল্পবিদ্যা যে সকল সম্প্রদায়ের অধিকতররূপে করায়ত্ত ছিল ও আছে, বগুড়া জেলায় তাহাদিগের লোকসংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

	সম্প্রদায়		সংখ্যা		সম্প্রদায়		সংখ্যা
১।	কুম্ভকার	...	৩৯৬৭	৮।	চামার	...	৩০০৬
২।	তাঁতি	...	২২০৯	৯।	মুচী	...	৪৪১৪
৩।	কর্ম্মকার	...	২০৩৪	১০।	কাঁসারী	...	২০৯
৪।	সূত্রধর	...	১২৮৬	১১।	সাঁখারী	...	১২
৫।	ময়রা	...	১২৯১	১২।	চূণারী	...	১২২
৬।	পাটনী	...	১১৫০	১৩।	কপালী	...	৭৬১
৭।	যুগী	...	৩৩১৮	১৪।	কলু	...	৩৯২

এতদ্ভিন্ন ১২৫৫৭ জন জোলা আছে। ইহারা মুসলমান-জাতীয়। এই সমস্ত জাতির অধিকাংশের উল্লেখ মনুসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাদের আচরিত শিল্প সমূহ তৎসময় বা তৎপূর্ব্ব সময় হইতে এতদ্দেশে প্রচলিত থাকা অধিকতর সম্ভব।

বগুড়ার শিল্পজাত দ্রব্যের উল্লেখ করিতে গেলে, সর্ব্বপ্রথম "রেশম-শিল্পই" সুবিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এই শিল্প দ্বারা বগুড়া জেলা প্রাচীন ও আধুনিক কালে যথেষ্ট খ্যাতি লাভে সমর্থ হইয়াছে। বগুড়ার এই রেশম শিল্প কত প্রাচীন তাহা অনুমান করা নিতান্ত দুরূহ। মহাভারতাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে "চীন

রেশম-শিল্প

দেশোৎপন্ন কীটজ বস্ত্র" (১), "চীনাংশুক" (২), ও "চীন-চেলক" (৩), শব্দের উল্লেখদৃষ্টে অনেকে অনুমান করেন যে "রেশমশিল্প" সর্ব্বপ্রথম চীনদেশেই সমুদ্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এরূপ অনুমান করিবার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। মহাভারতেরও পূর্ব্ববর্ত্তী মনুসংহিতা ও রামায়ণে রেশম বস্ত্রের ও রেশমোৎপত্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তথায় চীনদেশের কোন প্রসঙ্গ পরিদৃষ্ট হয় না। সংস্কৃতগ্রন্থে চীনদেশোৎপন্ন বস্ত্রাদিকে সর্ব্বত্রই "চীন" শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা দৃষ্ট হয়। 'অংশুক' ও 'চেলক' প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্বে 'চীন' শব্দের যোগ দ্বারা বরং ইহাই প্রতীত হয় যে, এতদ্দেশে ঐ সমস্ত বস্ত্র পূর্ব্বাপর উৎপন্ন হইত ও প্রচলিত ছিল। কিন্তু চীনদেশ হইতে যে সমুদয় অংশুক ও চেলক প্রভৃতি এতদ্দেশে আগমন করিত, তৎসমুদায় বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার নিমিত্তই উক্ত শব্দের পূর্ব্বে "চীন" এই বিশেষণ পদ প্রয়োগ করা হইত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে চীনাংশুক প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দ্বারা চীনের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের প্রাচীনত্বই সূচিত হইতেছে।

সংস্কৃত "কৌষেয় বস্ত্রই" রেশম বস্ত্রের প্রাচীন প্রতিশব্দ। মনুসংহিতায় এই কৌষেয় বস্ত্রের স্পষ্ট উল্লেখ আছে যথা,

"কৌষেয়াবিকয়োরূষৈঃ কুতপানামরিষ্টকৈঃ।
শ্রীফলৈরংশুপট্টানাং ক্ষৌমাণাং গৌরসর্ষপৈঃ॥" ৫।১২০

অর্থাৎ কৌষেয় বা কৃমিকোষোৎভব (রেশমী) বস্ত্র এবং আবিক বা মেষলোমজাত কম্বলাদি ক্ষার ও মৃত্তিকা দ্বারা পরিষ্কৃত হয়। কুতপ বা নেপাল দেশীয় কম্বল নিম্বফল চূর্ণ দ্বারা অংশুপট্ট বা পাটনির্ম্মিত সূক্ষ্মবস্ত্র বিল্বফলের নির্য্যাস দ্বারা এবং ক্ষৌম অর্থাৎ শণনির্ম্মিত বস্ত্র শ্বেতসর্ষপ চূর্ণ দ্বারা শুদ্ধ হয়।

---

(১) চীন, শক, ওড্র প্রভৃতি জাতি রাজসূয়-যজ্ঞ উপলক্ষে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যে সমুদয় দ্রব্য উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ মহাভারতের সভাপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত দ্রব্যাদির মধ্যে বাহ্লীক ও চীন দেশোৎপন্ন ঔর্ণ, রাঙ্কব, পটজ ও কীটজ বস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

* * * *

প্রমাণরাগস্পর্শাঢ্যা ন বহ্লী-চীন-সমুদ্ভবম্।
ঔর্ণঞ্চ রাঙ্কবঞ্চৈব পটজং কীটজন্তথা ॥২৬
কুটীকৃতং তথৈবাত্র কমলাভং সহস্রশঃ।
শ্লক্ষ্ণং বস্ত্রমকার্পাস মাবিকং মৃদুচাজিনম্ ॥২৭"
(সভাপর্ব্ব ৫১ অধ্যায়)

(২) "শকুন্তলার প্রথম অঙ্কে "চীনাংশুক" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—
"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিবকেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥"

(৩) স্মার্ত্তরঘুনন্দনধৃত "যাত্রাতত্ত্বে" এই "চীনচেল" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—
"সর্ব্বাঙ্গ মনুলিপোস্ত চন্দনেন্দুমৃগদ্রবৈঃ।
সুগন্ধিমাল্যাভরণৈ শ্চীনচেলৈঃ সুশোভনৈঃ ॥"

রামায়ণ রচনাকালে ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে বর্ত্তমান "পৌণ্ড্রদেশ" বা বারেন্দ্রভূমিতে এই "কৌষেয়" বা রেশমবস্ত্রের যথেষ্ট উৎপত্তি হইবার বিষয় রামায়ণ পাঠে অবগত হওয়া যায়। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৪০ সর্গে ভারতের পূর্ব্বভাগে মগধপুণ্ড্র ও অঙ্গাদি দেশস্থ "কোষকার"দিগের ভূমির উল্লেখ আছে,—

"মাগধাংশ্চ মহাগ্রমান্ পুণ্ড্রাংস্ত্বঙ্গাংস্তথৈবচ।
ভূমিঞ্চ কোষকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাং ॥"২৩

অর্থাৎ মগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র, অঙ্গ প্রভৃতি দেশে কোষকারদিগের ও রজতাকর ভূমিতে দশরথের পুত্রবধূ রামের দয়িতা সীতার অন্বেষণ করিবে। এস্থলে 'কোষকারাণাং ভূমিং' শব্দে টীকাকার "কৌষেয়তন্তুৎপাদক-জন্তুৎপত্তি-স্থানভূতানাং ভূমিং" অর্থাৎ কৌষেয় বা রেশম বস্ত্রের তন্তুৎপাদক জন্তুগণের উৎপত্তি স্থান এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। সুতরাং রামায়ণের সময়েও যে মগধ, পুণ্ড্র, অঙ্গ প্রভৃতি ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তস্থ ভূভাগসমূহে "রেশম কীটের" যথেষ্ট পরিমাণ চাষ ও উৎপত্তি হইত, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। আমাদের দেশের সুলিখিত কোন ইতিহাসগ্রন্থ বিদ্যমান নাই। সুতরাং উপরোক্ত সামান্য প্রমাণের উপর নির্ভর করা ব্যতীত আমাদের আর গত্যন্তর নাই। প্রমাণগুলি নিতান্ত সামান্য হইলেও উহা দ্বারা এতদ্দেশের রেশম-শিল্পের প্রাচীনত্ব অনেকটা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

"পুণ্ডরীক" (১) রেশম কীটের একটি প্রাচীন সংস্কৃত নাম। সম্ভবতঃ পুণ্ড্রদেশে যে সমুদয় রেশমকীট উৎপন্ন হইত, তাহা ভারতীয় আর্য্যসমাজে "পুণ্ডরীক" নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। পুণ্ড্রদেশের আদিম অধিবাসিগণ আজিও পুণ্ডরীক, পুণ্ড্র, পুঁড়া বা পোঁড়ু নামে পরিচিত। মুসলমান অধিকারকালে ইহাদের অধিকাংশ মুসলমানধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং অবশিষ্ট স্থানচ্যুত অবস্থায় বর্ত্তমান বঙ্গপ্রদেশের নানাস্থানে পুণ্ড্র পোঁড়ু প্রভৃতি নামে পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং হিন্দুসমাজের নিম্নস্তর অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বগুড়া এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জেলায় 'রেশমকীটের' প্রচলিত নাম "পোলু"। এই "পলু" শব্দ যে 'পুণ্ড্র' বা "পোঁড়ু" শব্দের অপভ্রংশ তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। প্রাচীন পৌণ্ড্র দেশে পৌণ্ড্র বা পোঁড়ুগণ রেশমকীটের চাষ করায় রেশমকীটের নামও "পোঁড়ু" বা "পোলু" বা পুণ্ডরীক হইয়াছে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বহুশতাব্দী পূর্ব্ব হইতে পৌণ্ড্রদেশে রেশমকীটের আবাদ ও প্রচলন ছিল। বগুড়া জেলা প্রাচীন পৌণ্ড্ররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বগুড়াতেও যে সুপ্রাচীন কাল হইতে রেশমকীটের চাষ হইত, তাহা অনেকটা নিঃসন্দেহে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

ইহা অতি আনন্দের কথা যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষ যে বিরাট রেশম

(১) পুণ্ডরীকঃ কোষকারভেদঃ ইতি মেদিনী।

বাণিজ্যের জন্য সভ্য জগতে বিখ্যাত হইয়াছে, উক্ত রেশমবাণিজ্যের একাংশ রেশম সম্ভবতঃ বগুড়া জেলায় উৎপন্ন হইত। বহুদিনের কথা নহে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে যখন হামিল্টন সাহেবের "ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ার" নামক গ্রন্থ বিরচিত ও প্রকাশিত হয়, তখনও ভারতবর্ষ হইতে বিদেশগত ও ভারতবর্ষে ব্যবহৃত সমুদয় রেশমের ⅘ অংশ এক রাজসাহীতেই উৎপন্ন হইত। বলা বাহুল্য, এই সময় "বগুড়া জেলা" রাজসাহীজেলার একাংশ বলিয়া পরিগণিত ছিল (১)।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময় "রেশম-প্রধান" সর্ব্বস্থানেই এক একটি "কুঠী" স্থাপন করিবার চেষ্টা হয় এবং এই চেষ্টার ফলে উক্ত কোম্পানী কর্ত্তৃক 'কাশীমবাজার' 'মালদহ' 'বোয়ালিয়া' প্রভৃতি স্থানের ন্যায় 'বগুড়া জেলার' নন্দাপাড়া (নওদাপাড়া) নামক স্থানে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে "কোম্পানীর রেশমকুঠী" সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের দোষে এই কুঠী অল্পকাল মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "সেতিহাস বগুড়া" নামক গ্রন্থ হইতে এই রেশম কুঠীর বিবরণ অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

"১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এখানে কোম্পানি বাহাদুরের রেশমের কুঠী সংস্থাপন হয়। ঐ রেশম কুঠীর রেসিডেণ্ট প্রথমতঃ রিজক সাহেব ছিলেন। ইনি এখানে কিছুকাল থাকিয়া কর্ম্ম করার পর মিঃ মিসন সাহেব আইসেন। তৎপর বিজর সাহেব আইসেন। এই বিজর সাহেব কুঠীর কর্ম্মকারগণের ধূর্ত্ততা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া সরকারের লাভের পক্ষে বিশেষ চেষ্টা পান। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাহেবেরা আলস্যপরতন্ত্র হইয়া কেবল শিকার করিয়া ও অন্যান্য সাহেবদিগের আলয়ে গিয়া খানা খাইয়া কাল কাটাইতেন, আর মাস গত হইলে পর আপনার ও অন্যান্য কর্ম্মকারকদিগের বেতনের জন্য কেবল এক এক খানি বিল প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেন, আর কোন কর্ম্ম করিতেন না। সাহেবদিগের রীতি নীতি জানিয়া কুঠীর কর্ম্মকারকেরা কুঠীর কর্ম্মে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে কিছুমাত্র ভয় করিতেন না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাহেবেরা কুঠীর কর্ম্মকারকদিগের প্রতি যেরূপ বিশ্বাস করিতেন, বিজর সাহেব তদ্বিপরীত আচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপর ক্রাবল সাহেব বিজর সাহেবের কর্ম্মে আইসেন। ইনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কুঠীর যাবতীয় কর্ম্মকারকের নিকট সরকারী তহবিল ২,০০,০০০৲ টাকা আদায় করেন। এ সময় বাবু শিবশঙ্কর দাস দেওয়ান ছিলেন। ইঁহার বেতন ৩০৲ টাকার উর্দ্ধ ছিল না। কুঠীতে কোয়া খরিদের জন্য বৎসর বৎসর ৫,০০,০০০৲ টাকা দাদন হইত। ঐ দাদনের টাকা শিকি দেওয়ান, আর শিকি অপরাপর কর্ম্মকারকগণ

---

(১) Rajshahi 20, 20 N. L. Boundary on the north Dinajpur and Mymensing, on the south Birbhum and Krishnanagar, on the East Dacca, Jalalpur and Mymensing and on the West Boglipur and Birbhum.

Rajshahy produced four-fifths, of all the silk raw or manufactured, used in or imported from Hindustan" (The East India Gazetter vol. II by Sir Walter Hamilton p. 449)

লইত। এইরূপে সরকারের তহবিল লুঠপাট হইত। ক্রাবণ সাহেব বিস্তর পরিশ্রম করিয়া যেরূপে তহবিল তছরুপাত্ হয় তাহা ধৃত করেন। এ সময় কুঠীর কর্ম্মকারকেরা যে যত লইয়াছিল, তাহা ফিরিয়া দিয়াছিলেন। দেওয়ান ভিন্ন এক সিরিস্তাদার, আর একজন খাজাঞ্চি, দুইজন মোহরের, একজন বক্সী, একজন হাওয়ালদার, ষোলজন সিপাহী, একজন আমলদার, আর কাটানি, পাকদার, যাচনদার, সরদার কমবেশ ২০০০ ছিল। পরে ১৮৩৮ সালে এই কুঠী বিক্রয় হয়। এই অবধি কোম্পানীর রেশমের কারবার বন্ধ হয়।”

প্রতি বৎসর যে স্থানে ৫,০০,০০০৲ টাকার দাদন চলিত, সে স্থানে যে কি পরিমাণ রেশম উৎপন্ন হইত, তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত রূপে কোম্পানী বাহাদুর কর্ত্তৃক রেশমের কুঠী বিক্রীত হইলে পর, এ জেলায় রেশমের কারবার ক্রমাগত হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ ঠাকুর মহাশয় কোম্পানির নিকট হইতে কুঠী ক্রয় করিবার অল্পকাল পরেই জে, সি, এবট (J. C. Abbott) নামক এক সাহেব ও অপর কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহার নিকট হইতে উক্ত কুঠী ক্রয় করেন। ইঁহারা এই কুঠীকে রেশমের পরিবর্ত্তে চিনির কুঠীতে পরিণত করতঃ কিয়ৎকাল কার্য্য পরিচালনের পর বহু টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অবশেষে বহুকাল যাবৎ কুঠীর যাবতীয় কার্য্য বন্ধ রাখিতে বাধ্য হন। তৎপর জর্ম্মন রাজ্যের প্রতিনিধি স্বরূপ মিঃ ডগসন্ (Mr. Dogson) এই কুঠী ক্রয় করতঃ পুনরায় তথায় রেশমব্যবসা আরম্ভ করেন, কিন্তু তিনিও চারি বৎসরের ঊর্দ্ধকাল ব্যবসা চালাইতে সমর্থ হন নাই। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ সি, জি, রিজ (Mr. C. G. Ridge) ঐ কুঠী ক্রয় করেন; কিন্তু তিনিও দশ এগার বৎসর কাল রেশমের কারবার পরিচালনের পর অবশেষে চীন, ফ্রান্স ও ইটালী দেশীয় রেশম ব্যবসায়িগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত হইয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কার্য্য বন্ধ করেন। এই সময় হইতে বগুড়া জেলায় রেশম কুঠীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করে এবং অচিরকাল মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় (১)।

বগুড়া জেলায় নন্দাপাড়া রেশম কুঠীর অধীন সুলতান গঞ্জ ও সেরপুর নামক স্থানদ্বয়ে আরও দুইটি ক্ষুদ্র রেশমকুঠী বর্ত্তমান থাকিবার বিষয় অবগত হওয়া যায়। নন্দাপাড়া কুঠীর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ইহারাও ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে। রেশমব্যবসা পূর্ব্বে অত্যন্ত লাভ জনক ছিল। দুঃখের বিষয় এই, অতি প্রয়োজনীয় ও লাভজনক ব্যবসায়টি বগুড়াবাসীর হস্ত হইতে ক্রমশঃ বহুপরিমাণে অপসারিত হইতেছে, কি প্রকারে এই জেলায় রেশম চাষ নিষ্পন্ন হয়, কি প্রকারেই বা “গুটি” হইতে সূত্র প্রস্তুত হয়, এবং কি প্রকারে সেই সূত্র হইতে সুন্দর সুন্দর রেশমী বস্ত্র স্থানীয় তন্তুবায়গণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, আমরা পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থ ক্রমশঃ তাহা যথাসম্ভব বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করিব রেশম ব্যতীত এতদঞ্চলে আরও দুই প্রকার কীটজ সূত্রের স্বল্প পরিমাণ উৎপত্তি ও তদ্দ্বারা সামান্যরূপ বস্ত্রবয়নাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আমরা প্রসঙ্গক্রমে তাহারও আলোচনা করিব।

(১) Hunter's Statistical Account of the Bogra District.

সাধারণতঃ এপ্রদেশে তিন প্রকার কীট হইতে সূত্র উৎপাদিত হইয়া থাকে। যথা,—(১) পোলু অর্থাৎ রেশমকীট, (২) এণ্ডি বা বেঁদ, (৩) এবং মুগা। ইহাদের মধ্যে পোলু অর্থাৎ রেশমকীট "তুঁত" নামক বৃক্ষের পত্র খাইয়া, 'এরণ্ডীকীট' এরণ্ড বা ভেঁল্লার পাতা খাইয়া এবং মুগকীট 'কুল' বা 'বরইর' পাতা ভক্ষণ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয় ও জীবিত থাকে। আমরা নিম্নে ইহাদের যথাযথ বিবরণ প্রদান করিতেছি।

রেশমকীট পোষণের পূর্ব্বে ইহাদের খাদ্য অর্থাৎ "তুঁত" বৃক্ষ আবাদ করা আবশ্যক।

পোলু বা রেশমকীট

"তুঁত"চাষ আমাদের দেশের এক অতি পুরাতন ও প্রধানতম চাষ ছিল। এই তুঁত চাষ দ্বারা যে কত লোক সামান্য অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায় সমানীত হইত এবং কত লোক যে প্রতিপালিত হইত, তাহা বলা যায় না। আজিও বগুড়া জেলায় নানা স্থানে বহুদূরব্যাপী উচ্চ-তুঁত-ক্ষেত্র সমূহ পথিকের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। কিন্তু হায়, এই অতি প্রয়োজনীয় ও লাভবান্ চাষটি এতদঞ্চলে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! চীন, ফ্রান্স, ইটালী, জর্ম্মানী ও জাপানী প্রভৃতি জাতির প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের রেশম-কারবার গুলি ক্রমশঃ ধ্বংসমুখে উপনীত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তুঁত চাষও দেশ হইতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে।

কি প্রকারে তুঁত-চাষ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা এস্থানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই চাষ যে কি প্রকার লাভজনক, তাহা আমরা অতি সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছি। প্রতি মাসে তুঁত-ক্ষেত্র হইতে দুই বার পাতা তুলিতে পারা যায় এবং প্রতি বারে প্রতি বিঘা জমি হইতে প্রায় ১৷৷০ দেড় মণ পাতা উঠিয়া থাকে। প্রতিবৎসর কেবল ক্ষেত্র পাইট করিবার নিমিত্ত দুই মাস কাল পরিত্যাগ করিলে বৎসরে প্রায় দশ মাস কাল পত্র সংগৃহীত হইতে পারে। এই হিসাবে প্রতি বিঘা জমি হইতে বৎসরে প্রায় ৩০/ মণ পত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং প্রতিমণ পাতা ন্যূনকল্পে ১৷৷০ টাকা দরে বিক্রীত হইলেও বৎসরে প্রতি বিঘা জমিতে প্রায় ৪৫৲ টাকা মূল্যের তুঁতপত্র জন্মিয়া থাকে। জমির চাষ ইত্যাদির বাবদ প্রতি বিঘায় ১৫৲ টাকা হিসাবে বাদ দিলেও বৎসরে প্রায় ৩০৲ টাকা পরিমাণ প্রতি বিঘা তুঁত-ক্ষেত্রে লাভ হইতে পারে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে লার্কিন্স (Mr. Larkins) সাহেব বগুড়া জেলার কলেক্টর ছিলেন। তাঁহার রিপোর্ট দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে,তৎকালে বগুড়া জেলায় প্রায় ১৫০০ একার জমিতে তুঁত চাষ হইত; কিন্তু মিঃ জে, এন, গুপ্ত (Mr. J. N. Gupta) মহাশয় সম্প্রতি বঙ্গদেশ ও আসাম প্রদেশের শিল্প সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, বগুড়া জেলায় এক্ষণে আর ১৩০ একারের অতিরিক্ত জমিতে তুঁত চাষ হওয়া পরিদৃষ্ট হয় না।

তুঁত চাষ দ্বারা প্রতি বিঘা জমিতে কৃষকের বৎসরে প্রায় ৩০৲ টাকা পরিমাণ লাভ হইয়া থাকে, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। কিন্তু রেশম-কীট প্রতিপালন দ্বারা এই তুঁত চাষ

হইতে পরোক্ষভাবে যে কত লাভ হইয়া থাকে, আমরা ক্রমশঃ তাহাই বিবৃত করিব। পাশ্চাত্য জাতিগণের সহিত প্রতিযোগিতায় এবং আমাদের স্বদেশীয় কৃষকগণের বিজ্ঞান-সম্মত কৃষি প্রণালীর সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে কৃষি ও শিল্প বিভাগের এই অতি প্রয়োজনীয় ও লাভজনক অংশটি ইদানীং ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে, ইহা কম পরিতাপের বিষয় নহে।

রেশম-কীটের খাদ্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। এক্ষণে কিরূপে রেশম কীট প্রতিপালন করিয়া তাহা হইতে "কোয়া" সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাই বিবৃত করিতেছি।

রেশমকীট আবাদ।

প্রথমতঃ রেশমকীট বা "পোলু" সংগ্রহ করিয়া একটি নূতন "হাঁড়িতে" রাখিয়া দিতে হয়। প্রায় ৮ দিন পর ঐ "পোলু" হইতে প্রজাপতি বহির্গত হইয়া পড়ে। প্রজাপতি বাহির হইলে একখানি বা আবশ্যক মত ততোধিক বংশনির্ম্মিত চাঙ্গারীতে কাগজ পাতিয়া তদুপরি প্রজাপতি গুলিকে ছাড়িয়া দিতে হয়। স্থানীয় লোকেরা এই প্রণালীকে জোড়ে ধরান কহে। সন্ধ্যার সময় পুং ও স্ত্রী জাতীয় প্রজাপতি গুলিকে পৃথক্ করতঃ পুংগুলিকে পূর্ব্বোক্ত হাঁড়িতে উঠাইয়া রাখিয়া, স্ত্রীগুলিকে উক্ত চাঙ্গারীতে কাগজের উপর ফাঁক ফাঁক করিয়া রাখিতে হয় এবং উক্ত চাঙ্গারী বেশ সাবধানে 'খৈ চালা' বা ঐ প্রকার অন্য কোন আবরণ দ্বারা আবৃত করতঃ একটি স্বতন্ত্র গৃহে একটি 'মাচাঙ্গের' উপর রক্ষা করিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় রাখিলে রাত্রিকালে স্ত্রীগুলি কাগজের উপর ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। পর দিবস পুনরায় স্ত্রী ও পুং জাতীয় প্রজাপতি গুলিকে পূর্ব্ববৎ চাঙ্গারীর উপর জোড় ধরাইয়া দিয়া সন্ধ্যাকালে পুং ও স্ত্রী গুলিকে পৃথক করতঃ স্ত্রীগুলিকে চাঙ্গারীতে ঢাকিয়া রাখিতে হয়। দুই দিন ক্রমান্বয়ে ডিম্ব প্রসব করিলে প্রজাপতি গুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় এবং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়।

ডিম্বপ্রসব শেষ হইলে ডিমগুলিকে পূর্ব্ববর্ণিত চাঙ্গারীতে কাগজের উপর রাখিয়া খৈ চালাদি দ্বারা আবৃত করতঃ সাত দিবস পর্য্যন্ত পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র গৃহে একটি মাচাঙ্গের উপর রক্ষা করিলে সাত দিবস পর ডিম্ব ফুটিয়া তন্মধ্য হইতে কাল কাল কীট বহির্গত হইয়া থাকে। তৎপর দিবস যখন সমস্ত কীটগুলি ডিম্ব হইতে বহির্গত হইয়া পড়ে তখন উক্ত কীটগুলিকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে তুঁত পাতা কর্ত্তন করতঃ প্রতিদিন অল্প পরিমাণে দিবসে দুইবার ও রাত্রিতে একবার খাইতে দিতে হয়। রেশম-কীটগুলি এই প্রকারে চারি দিন পর্য্যন্ত পাতা খাইলে পঞ্চম দিনে সর্ব্বপ্রথম নিদ্রিত হইয়া পড়ে, এবং এই নিদ্রাবস্থায় কোন খাদ্য গ্রহণ করে না। এইবারে তাহারা এক অহোরাত্র নিদ্রিতাবস্থায় যাপন করে।

তৎপর দিবস ঘুম ভাঙ্গিলে কীটগুলিকে বিষ্ঠা মিশ্রিত ভুক্তাবশিষ্ট পত্রগুলি হইতে পরিষ্কৃত করতঃ পূর্ব্বোক্ত চাঙ্গারীতে পূর্ব্বাপেক্ষা ফাঁক ফাঁক করিয়া রাখিয়া তুঁত পত্রের অপেক্ষাকৃত বড় বড় টুকরা আহারের নিমিত্ত প্রদান করিতে হয়। এইরূপে, পোকাগুলি যতই বড় হয়, তুঁত পাতাগুলিও ততই বড় বড় করিয়া কাটিয়া দিতে হয়।

পোকাগুলি প্রথম ঘুম হইতে জাগরিত হইয়া তিন দিবস পর্য্যন্ত পাতা খাইয়া থাকে। তৎপর ইহাদের "দ্বিতীয় ঘুম" আরম্ভ হয়। এবারেও পোকাগুলি এক অহোরাত্র নিদ্রিত থাকে এবং ঘুম ভাঙ্গিলে পুনর্ব্বার তিন দিবস পর্য্যন্ত পাতা খাইয়া থাকে। তৎপর "তৃতীয় ঘুম" আরম্ভ হয়। এবারেও এক অহোরাত্র নিদ্রিতাবস্থায় থাকে, এবং তৎপর নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া চারি দিবস পর্য্যন্ত পাতা ভক্ষণ করে। প্রতি ঘুমের পর দিবস পূর্ব্বের ন্যায় ভুক্তাবশিষ্ট পাতাগুলি ও বিষ্ঠাদি ময়লা, পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়, এবং পোকাগুলির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে "চাঙ্গারীর" সংখ্যা তিন চারি খানি হইতে পাঁচ ছয় খানি পর্য্যন্ত পরিবর্দ্ধিত করিতে হয়। তৃতীয় ঘুমের চারি দিন পর পোকাগুলির "চতুর্থ ঘুম" উপস্থিত হইয়া থাকে এবং পূর্ব্ববৎ এক অহোরাত্র নিদ্রিত থাকিয়া পুনরায় জাগরিত হয়।

চতুর্থ ঘুমের পর চাঙ্গারীতে স্থান সংকুলান না হইলে, তিন চারি খানি "কুলাতে" কীটগুলিকে রক্ষা করা আবশ্যক। চতুর্থ ঘুমের পর তুঁত পাতা আর কাটিয়া দিতে হয় না। গোটা পাতা অধিক পরিমাণে দিতে হয়; এবং এই সময় পোকাগুলির আহারও বেশী বার যোগাইতে হয়। এক্ষণে দিবাতে দুইবারের পরিবর্ত্তে তিনবার এবং রাত্রিতে পূর্ব্বের ন্যায় একবার, সর্ব্বসমেত দিবারাত্রিতে চারিবার পাতা দিতে হয়। পাতাগুলি এরূপ ভাবে দিতে হয়, যেন পাতা দ্বারা পোকাগুলি সম্পূর্ণ আবৃত হইয়া পড়ে। চতুর্থ ঘুমের পর পোকাগুলি ছয় দিবস পর্য্যন্ত পাতা খাইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাকে পোকার 'খাওয়ানীয়া' বা 'পেটুক' অবস্থা বলে। এই ছয় দিবসেও প্রয়োজন মত ভুক্তাবশিষ্ট পাতা ও বিষ্ঠাদি ময়লা পূর্ব্ববৎ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

পোকাগুলির "চতুর্থ ঘুমের" পর উক্ত ছয় দিবস অন্ত হইলে সপ্তম দিবসে পোকাগুলি ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ হইতে আরম্ভ করে। এই অবস্থাকে পোকার "পক্কাবস্থা" বলে। অষ্টম দিবসে পোকাগুলি প্রায় সমস্তই পরিপক্ক হইয়া উঠে, এবং এই পক্কাবস্থায় পোকাগুলির আর আহারের প্রয়োজন হয় না।

পোকাগুলি সাধারণতঃ রাত্রিযোগে পরিপক্ক হইয়া থাকে। পরিপক্ক হইলেই প্রাতঃকালে "চন্দুরী" নামক একপ্রকার বংশনির্ম্মিত যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন "ঘরা" বা "খোপে" কীটগুলিকে ছাড়িয়া দিতে হয়। "চন্দুরিতে" পোকাগুলি ছাড়িয়া দিয়া চন্দুরিটি উপুড় করতঃ কিয়ৎকাল প্রভাত-সূর্য্যের কিরণে উত্তপ্ত করিয়া লইতে হয়। এরূপ করিলে পোকাগুলির মলমূত্র মাটিতে ঝরিয়া পড়ে এবং পোকাগুলিও পরিষ্কার হইয়া থাকে। পোকাগুলির পেট হইতে মলমূত্র বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত ইহারা "গুটি" নির্ম্মাণ কার্য্যের উপযোগী হয় না। মলগুলি ঝরিয়া পড়িলে কীটগুলি পূর্ব্বোক্ত "চন্দুরির" "ঘরে ঘরে" দুই দিবস পর্য্যন্ত রেশমগৃহ বা "গুটি" নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

শীতকাল ভিন্ন অন্যকালে "চন্দুরিগুলি" রৌদ্রে দিবার প্রয়োজন হয় না। কেবল শীতকালেই "চন্দুরিগুলি" প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক একবার রৌদ্রে উত্তপ্ত করিয়া লইতে

হয়। সকল ঋতুতেই তৃতীয় দিবস "চন্দ্রিগুলি" রৌদ্রে দিয়া "গুটি" বা "কোয়া বাহির করিতে হয়। "গুটি" বাহির হইলেই তাহা বিক্রয়ের উপযোগী হইল।

এক বিঘা জমিতে তুঁত চাষ করিলে তাহা হইতে প্রতিমাসে দুইবার পাতা উঠাইতে পায়া যায়। এবং সেই পাতায় প্রতি 'বন্দে' ৪০০ গুটি হিসাবে দুই 'বন্দে' অর্থাৎ এক-মাসে ৮০০ গুটির চাষ হইতে পারে। 'গুটিগুলি' বেশ ভাল হইলে ৮০০ গুটি ওজনে প্রায় ১/ মণ হইয়া থাকে। প্রতিমণ গুটির মূল্য প্রায় ৩০৲ টাকা সুতরাং এক বিঘা জমিতে তুঁত চাষ করিয়া উক্ত পত্র দ্বারা 'পোলু' প্রতিপালন করিলে গৃহস্থের প্রতিমাসে প্রায় ৩০৲ টাকা পরিমাণ আয় হইতে পারে।

গুটি হইতে সূত্র প্রস্তুত প্রণালী। গুটি হইতে সূত্র বাহির করিতে সাধারণতঃ তিনটি দ্রব্যের প্রয়োজন যথা—

(১) 'ঘাই'—ইহা একটি গরম জল পূর্ণ পাত্র। ইহার মধ্যে 'কোয়া' গুলি নিক্ষেপ করতঃ এক গাছি কাঠির সাহায্যে ডুবাইয়া ডুবাইয়া সিদ্ধ করিতে হয়। সূত্র নির্গমন কালে কোয়াগুলি ইহার গরম জল মধ্যে অবস্থান করে এবং ঘুরিতে থাকে।

(২) 'চশমা' বা 'আড়ানী'—ইহা এক প্রান্তে ছিদ্র বিশিষ্ট দুই খণ্ড বংশনির্ম্মিত 'বাতা'। অথবা দুই খণ্ড লৌহ-শলাকার এক প্রান্ত সংলগ্ন দুইটি ক্ষুদ্র সচ্ছিদ্র মাটীর 'কোটা' 'চরকা'।

(৩) প্রথমতঃ কোয়াগুলি 'ঘাই' মধ্যস্থিত গরম জলে একগাছি কাঠির সাহায্যে ডুবাইয়া ডুবাইয়া সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। তৎপর উক্ত সিদ্ধ কোয়ার কতকগুলি সূত্রের অন্তিমভাগ একত্র করিয়া 'চসমা' বা 'আড়ানীর' একটি ছিদ্র পথে চালাইয়া দিয়া 'চরকার' এক প্রান্তে আটকাইয়া দিতে হয়। এবং ঘাইয়ের অভ্যন্তরস্থ অপর কতকগুলি কোয়ার সূত্রের অন্তিমভাগ একত্র করতঃ অন্য 'চশমা বা আড়ানির' ছিদ্র পথে চালাইয়া 'চরকার' অপর প্রান্তে সংলগ্ন করিয়া দিতে হয়। তৎপরে হাতলের দ্বারা চরকা ঘুরাইতে থাকিলে ঘাইস্থিত সিদ্ধ কোয়া হইতে সূত্র আপনি খুলিয়া যাইতে থাকে। কোন একটি কোয়ার সূত্র সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গেলে 'ঘাইয়ের' অভ্যন্তরস্থ সিদ্ধ কোয়ার রাশি হইতে আর একটি কোয়া গ্রহণ করতঃ উক্ত কোয়ার প্রথম প্রান্ত, নিঃশেষিত কোয়ার শেষ প্রান্তের সহিত সংযোজিত করিয়া দিতে হয়।

আমরা অতি সংক্ষেপে 'কোয়া' হইতে সূত্র বহির করিবার প্রণালী বর্ণন করিলাম। কিন্তু শুধু পুস্তক বা প্রবন্ধ পাঠ দ্বারা 'কোয়া' হইতে সূত্র বাহির করিতে শিক্ষা করা অসম্ভব। এ কার্য্যের শিক্ষা সম্পূর্ণ অভ্যাস ও ভূয়োদর্শনের উপর নির্ভর করে। অতি অল্প বয়সে 'কাটাই' শিক্ষা করিতে আরম্ভ না করিলে প্রায়ই এই বিদ্যা লাভে অকৃতকার্য্য হইতে হয়। এজন্য রেশম কাটাইয়ের কারখানায় 'চরকার' পাক দিবার নিমিত্ত প্রায়ই বালক

বালিকা নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহারা 'চরকায়' পাক দিতে ও রেশমসূত্রে গ্রন্থি দিতে শিক্ষা করিয়া ক্রমশঃ 'গুচ্ছি' তুলিতে ও 'গুচ্ছি' ফেলিতে শিক্ষা করে। এদেশে প্রায় এক একটি ঘাইয়ের জন্য, অর্থাৎ দুই বন্দী রেশম এককালীন প্রস্তুত করিবার জন্য, একজন কাটানী ও একজন 'পাকদার' নিযুক্ত থাকে। বলা বাহুল্য, ইহাতে মজুরী খরচ অত্যন্ত অধিক পড়ে।

রেশম হইতে বস্ত্রবয়ন করিতে হইলে, প্রথমতঃ কাঁচি রেশমের বন্দী গুলি 'ফিরান' করিয়া অর্থাৎ বন্দী হইতে খসাইয়া 'লাটাইয়ে' জড়াইয়া লইতে হয়। 'পাকোয়ান' কাপড় প্রস্তুত করিতে হইলে ঐ 'ফিরান করা' সূত্র গুলি পাকাইয়া লওয়ার প্রয়োজন।

সূত্র ফিরান করা, পোঠে লাগান, নলী ভরান, বস্ত্র বয়ন—

কাপড় বুনিবার সময় এককালীন ৫, ১০ বা ২০ খানি কাপড়ের 'টানা' প্রস্তুত করতঃ উক্ত 'টানার' এক মুখ কাটিয়া খিলপূর্ণ 'সানার' মধ্যে ভরাইয়া লইতে হয়। এবং ঐ টানা গোছাইয়া 'নরোজ' জড়াইতে হয়। সাধারণতঃ তন্তুবায়গণ ৫০ হইতে ৮০ গজ লম্বা করিয়া সূত্রের 'টানা' হাঁটাইয়া ঐ সূত্র সমূহ 'পোঠে' করিয়া অর্থাৎ সাজাইয়া লইয়া থাকে।

সূত্রগুলি সানার মধ্যে ভরাইয়া এবং নরোজে জড়াইয়া লইবার পর কাঠি দিয়া 'ব' পরাইতে হয়। তৎপর বস্ত্রবয়ন কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। যদি খাড়ি ও রং করিয়া বস্ত্রবয়ন করা প্রয়োজন হয়, তবে "পোঠে" অবস্থায় "টানার" সূত্রগুলি খাড়ি ও রং করা কর্ত্তব্য।

"ভরণা" বা "পৈরাণের" সূত্র দুই তিনটি একত্র করিয়া "চরকার" সাহায্যে ছোট ছোট "নলের" গায়ে জড়াইয়া লইয়া ঐ "নলী" গুলি "মাকু" মধ্যে ভরাইয়া তদ্দারা বস্ত্র বয়ণ করিতে হয়। যেমন টানার সূতা "পাকান", "কোরা", "খাড়ি করা" অথবা রং করা, সকল অবস্থাতেই ব্যবহৃত হয়, ভরণা বা "পৈরাণের" সূতাও সেইরূপ পাকান, কোরা, খাড়িকরা, অথবা রং করা সকল অবস্থাতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই প্রকারে "টানা" ও "পৈরাণ" ঠিক হইলে তদ্দারা "তাঁত" সংযোগে বস্ত্রবয়ন কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বস্ত্রবয়ন কার্য্য পুস্তক বা প্রবন্ধ পাঠ দ্বারা আয়ত্ত করা যায় না। ইহা অভ্যাসের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সাধারণতঃ তাঁতের গঠন বুঝিয়া লওয়া দুরূহ ব্যাপার নহে; কিন্তু তাঁতের গঠন বুঝিলেই বস্ত্রবয়ন কার্য্য পরিচালন করা যায় না। বস্ত্রবয়ন প্রণালী বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা বলিয়া তদ্বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন।

বগুড়া জেলায় প্রাচীন কালে অতি সুন্দর সুন্দর রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইত বলিয়া অবগত হওয়া যায়। বর্তমান বগুড়া সহরের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশস্থিত "মালতী নগর" নামক স্থানের তন্তুবায়গণ রেশম বস্ত্র বয়নের জন্য পূর্ব্বাপর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এ স্থানের ও সেরপুরের তন্তুবায়গণ কপৰ্দ্দূল (কর্পূর ধবল?) নামক এক প্রকার মশারী প্রস্তুত করিত তাহা তৎকালের বাজারে ৩০।৪০ টাকার ন্যূন বিক্রয় হইত না। কালীপ্রসাদ, কমল, দামোদর, বৈদ্যনাথ, উদয় চাঁদ প্রভৃতি রেশম বস্ত্র-

রেশম বস্ত্রের ব্যবহার।

বয়নকারী তন্তুবায়গণের প্রশংসাবাক্য আজিও বৃদ্ধগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। বগুড়ার রেশম-বস্ত্রের সাধারণ নাম 'গরদ'। যদিও অর্থাভাব ও স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের রেশম বস্ত্র ব্যবহারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন হেতু রেশম কীট প্রতিপালনের ন্যায় রেশম-বস্ত্র বয়ন কার্য্যে বগুড়াজেলার যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে,—এমন কি প্রায় ধ্বংসমুখে নিপতিত হইয়াছে, তথাপি মালতীনগর-নিবাসী গিরিধর, যজ্ঞেশ্বর, গৌরনাথ ও বাউলচন্দ্রবসাক কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিল্প প্রদর্শনীতে যে সমুদয় রেশমী-বস্ত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা সবিশেষ প্রশংসিত ও আদৃত হইয়া ঐ সমুদয় নির্ম্মাতা ও প্রেরকগণ প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র ও পদক প্রাপ্ত হইয়াছে (১)। বগুড়ার রেশম শিল্পের চূড়ান্ত অবনতির সময় ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে।

বগুড়া জেলার অন্তর্গত মালতীনগর, চুপ চাঁচিয়া, ছাতিয়ান গ্রাম, সূর্য্যতা, রায়কালী, গোপীনাথপুর, বেটখুর প্রভৃতি গ্রামে তন্তুবায়গণের বাসস্থান পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কেবল মাত্র মালতীনগরের তন্তুবায়গণকেই রেশম বস্ত্র বয়ন করিতে দেখা যায়, অন্যান্য গ্রামের তন্তুবায়গণ কার্পাসবস্ত্র বয়ন এবং অন্যবিধ ব্যবসা দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। এই জেলার গণ্ডগ্রাম, চকজোড়া, সাজাপুর, ইকুলিয়া,নিশিন্দারা, ফুলবাড়ী, দশঠিকা, বার্ব্বকপুর প্রভৃতি গ্রামে আজিও সামান্য পরিমাণে রেশম কোয়া সমুৎপন্ন হয় এবং ঐ রেশম কোয়া হইতে প্রধানতঃ বার্ব্বকপুর গ্রামের বেঙ্গাসেখ, করিম মিস্ত্রী,কুড়ানু প্রামাণিক, একু প্রামাণিক প্রভৃতি সূত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে।

বগুড়া এবং নিকটবর্ত্তী রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলার দুঃখী লোকেরা গৃহকার্য্যের অবসরে এণ্ডির কার্য্য করিয়া থাকে। এণ্ডি পোকা প্রতিপালন একটি অল্প-মূলধনে বিস্তর লাভ জনক ব্যবসা। সামান্য এক পয়সা মূল্যেও একটি 'কাঠি' ক্রয় করিলে, উহা দ্বারা ক্রমশঃ চিরস্থায়ী কারবার ও বহু আয় হইতে পারে। এণ্ডিকীট বা 'বোঁদ' বৎসরে আট বার 'কোয়া' প্রস্তুত করিয়া থাকে। এণ্ডি প্রজাপতি চারি পাঁচ দিন কাঠিতে বাঁধা থাকিলে ক্রমে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ঐ ডিম্বগুলি সবিশেষ সতর্কতার সহিত একটি পাত্রে করিয়া 'জলসরার' উপর রাখিতে হয়। অন্যথা মাছি ও পিপীলিকা দ্বারা ডিম্বগুলি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

এণ্ডি ও মুগা—

ডিম্বগুলি ফুটিয়া তন্মধ্য হইতে কীট নির্গত হইলে, ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট গুলিকে ডালিতে রাখিয়া তাহাদের আহারের নিমিত্ত অতি কোমল এরণ্ড পত্র টুকরা টুকরা করিয়া দিতে হয়। চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই কীটগুলি দুই ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হইয়া ক্রমশঃ চারি ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়। কীট গুলি যতই বড় হয় ততই পুরু পাতার বড় বড়

(১) গিরিধর বসাক মহিসুর প্রদর্শনীতে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট সহ রৌপ্য পদক; যজ্ঞেশ্বর বসাক কলিকাতা কংগ্রেসের শিল্প প্রদর্শনীতে প্রথমশ্রেণীর প্রশংসা পত্র সহ স্বর্ণপদক ও বগুড়া শিল্পপ্রদর্শনীতে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র; গিরিধর বসাক ও গৌর নাথ বসাক বগুড়া শিল্পপ্রদর্শনীতে রৌপ্য পদক এবং বাউলচন্দ্র বসাক বগুড়া শিল্পপ্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছে।

টুকরা দেওয়া আবশ্যক। কীটগুলিকে মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে গরম করিয়া লইতে এবং সর্ব্বদাই বস্ত্রাবৃত রাখিতে হয়। সাত আট দিনের মধ্যে কীটগুলি বড় হইয়া উঠিলে, 'জলসরা' বিশিষ্ট 'আড়ে' পাঁচ সাতটি এরণ্ড-পত্র একত্র বাঁধিয়া তাহাতে পোকাগুলি ছাড়িয়া দিতে হয়। প্রতি দিনই আড়ের সহিত নূতন পাতার 'থোপনা' বাঁধিয়া দেওয়া প্রয়োজন। শুষ্ক পত্রের থোপনাগুলি আড়েই থাকে এবং এণ্ডি পোকা ঐ শুষ্ক পত্রগুলির শিরায় শিরায় 'কোয়া' প্রস্তুত করতঃ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

এণ্ডিকীটের "কোয়া" প্রস্তুত কার্য্য শেষ হইলে, "কোয়া" গুলি "থোপনা" হইতে সংগ্রহ করতঃ প্রতিদিন ডালায় রাখিয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করিয়া লইতে হয়। এই প্রকার পাঁচ সাত দিন রৌদ্রোত্তাপ প্রদান করিলে কোয়ার মুখ ফুটিয়া একটু ঈষৎ হরিদ্রাভ মেটে ও শুভ্র বর্ণের প্রজাপতি বাহির হইয়া থাকে। এই প্রজাপতি গুলিকে কাঠিতে পাখা বন্ধিয়া রাখিলে তাহারা পুনরায় ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ডিম পাড়া শেষ হওয়ার পর ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ইহারা যথেচ্ছা প্রস্থান করে।

"কোয়া" হইতে সূত্র প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ "কোয়া" গুলি উত্তমরূপে জলে সিদ্ধ করিয়া লওয়ার প্রয়োজন। সুসিদ্ধ কোয়াগুলির মুখ প্রসারিত করিয়া তন্মধ্য হইতে মৃত কীটগুলি ও ময়লা ধৌত ও পরিষ্কৃত করতঃ শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। এই অবস্থায় "কোয়া" গুলিকে "কোয়া পাত" বলে।

"কোয়া পাত" গুলি হইতে সূত্র বাহির করিবার সময় ইহাদিগকে জলে ভিজাইয়া একটি কাঠির অগ্রভাগে জড়াইয়া পরে ক্রমে ক্রমে টানিয়া 'টাকু" নামক যন্ত্রের সাহায্যে সূত্র প্রস্তুত করিতে হয়। এণ্ডি বস্ত্রবয়ন প্রণালী রেশমী বস্ত্রবয়ন প্রণালীর অনুরূপ।

এণ্ডি-কীটগুলি সাধারণতঃ ভেরেণ্ডা বা ভেঁল্লাপত্র আহার করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। এরণ্ড বৃক্ষের প্রণালীবদ্ধ চাষ বগুড়া জেলায় প্রচলিত নাই—ইহারা যেখানে সেখানে জন্মিয়া থাকে।

এণ্ডি বা "বৌদের" কাপড় পূর্ব্বে বগুড়া এবং রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলায় যথেষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন হইতে। অনেক সময় "টেক্-সই" বলিয়া দুঃস্থ কৃষক পরিবারবর্গের মধ্যে এই কাপড় পরিধান করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। দুঃখের বিষয় এতদ্দেশীয় উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এই সুদৃঢ় ও সুশ্রী বস্ত্র গুলিকে অপবিত্র বোধে ব্যবহার করিতেন না। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকগণের উৎসাহের অভাবে এবং আরও অন্যবিধ কারণে এক্ষণে এই বৌদ বা এণ্ডি বস্ত্রের বয়ন কার্য্য এতদ্দেশ হইতে একপ্রকার অন্তর্হিত হইয়াছে। তথাপি বগুড়া জেলায় বাঁশ বাড়ীয়া, কলসী মাটি, দশঠিকা গোকুল শিকারপুর, কুমীরা, কৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রামের কারিকরগণ (জোলাগণ). এবং সারিয়াকান্দী থানার অন্তর্গত বেড়াডাঙ্গা ও পাঁচগাছি গ্রামের তন্তুবায়গন আজিও এই এণ্ডি শিল্পের অস্তিত্ব কথঞ্চিৎ পরিমাণে বজায় রাখিয়াছে, এবং বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে ইহা কতকটা সজীবতাও লাভ করিয়াছে।

বগুড়ায় মুগা সূত্র অতি সামান্য পরিমাণ উৎপন্ন হয়। মুগা-কীট এ জেলায় সাধারণতঃ

প্রতিপালিত হয় না। কুলগাছ হইতে মুগাকীটের "কোয়া" সঞ্চয় করতঃ স্থানীয় লোকগণ অনেক সময় বড়্‌শীর সূতা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ফল কথা মুগার চাষ এ জেলায় নাই বলিলেই চলে।

কার্পাস বস্ত্রাদি।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বগুড়া জেলায় তন্তুবায় ২২০৯ জন, যুগী ৩৩১৮ জন এবং জোলা ১২৫৫৭ জন। প্রাচীনকালে এই সমস্ত জাতি-মধ্যেই বস্ত্র শিল্প আবদ্ধ ছিল এবং সাধারণতঃ ইহাদের তাঁত-সম্ভূত বস্ত্র দ্বারাই জেলাস্থ যাবতীয় লোকের লজ্জা নিবারণ হইত। কিন্তু হায়! সে প্রাচীন স্বদেশী শিল্প এক্ষণে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁতি ও যুগিগণের মধ্যে অনেকেই তাঁত পরিত্যাগ করতঃ বিভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে; এবং অধিকাংশ 'জোলা' কৃষিকার্য্যে আপনাদিগের হস্তদ্বয়কে নিয়োজিত করিয়াছে। কলের বস্ত্র যে সময় হইতে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট সমাদৃত হইতে আরম্ভ করে, সেই সময় হইতেই এদেশের বস্ত্র-বয়নকারী সম্প্রদায় নিজ নিজ জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। আজ কালের এই অবনতির সময়েও এ জেলায় তহবস্, মশারী, চারখানা, নানা প্রকারের গামছা ও কৌপিন যথেষ্ট পরিমাণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন প্রভাবে ভদ্রলোকের ব্যবহারোপযোগী 'ধুতি' কিয়ৎ পরিমাণে উৎপন্ন হইবার সূত্রপাত হইয়াছে এবং সম্প্রতি আদমদিঘীর নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও বগুড়া সহরের কবিরাজ রাধা মাধব সোম মহাশয়দ্বয় দুইটি মোজার হস্তচালিত কল সংস্থাপন পুরঃসর নানা প্রকার মোজা প্রস্তুত করাইতেছেন।

কার্পাস বৃক্ষের চাষ এ জেলায় আর প্রায় পরিদৃষ্ট হয় না। তন্তুবায় ও জোলাগণ ভিন্নস্থান হইতে সূত্রাদি ক্রয় করতঃ বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। বগুড়ায় কার্পাসের স্থানীয় নাম "বাঙ্গা"। কার্পাস বস্ত্র বয়নের তাঁত ও তাহার ব্যবহার প্রণালী সর্ব্বাংশে রেশম বস্ত্র বয়নের তাঁতের অনুরূপ।

নীল।

কোম্পানির রাজত্বের প্রথমাবস্থায় রেশমের ন্যায় এ জেলায় সারিয়াকান্দী, ধুনট প্রভৃতি থানায় নীলকর সাহেবগণ কর্ত্তৃক নীলকুঠি সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেতিহাস বগুড়ায় লিখিত আছে "এ জেলায় নীলকুঠি এক্ষণে চারিটা আছে। তাহার একটি সেরেকান্দী, একটি মাদারগঞ্জ,একটি মাদারীগঞ্জ, একটি বেগুনী। ঐ সকল কুঠি ভিন্ন আর নীলের কুঠি যাহা আছে তাহা অত্যল্প ও অকর্ম্মণ্য ... ... নীল ও রেশমের জন্য অন্যান্য জেলার ন্যায় এ জেলায় অধিক দৌরাত্ম্য নাই।" ইহা ইং ১৮৬১ সালের কথা। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে অন্যান্য স্থানের নীলকর সাহেবগণের ন্যায় এ স্থানের নীলকরগণও যথেষ্ট অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে সারিয়া কান্দী থানার অন্তর্গত হরিণাগ্রাম নিবাসী কৃষ্ণপ্রসাদ রায় নামক জনৈক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির নেতৃত্বে প্রজাগণ 'মারচী' নামক গ্রামে দলবদ্ধ হইয়া নীলকর সাহেবদিগের বিরুদ্ধে

উত্থিত হয়। এই উপলক্ষে যে হাঙ্গামা হয় তাহাতে ফার্গুসন (Mr. Furguson) নামক জনৈক নীলকর সাহেব হত হইয়াছিলেন বলিয়া জনরব শুনিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই হাঙ্গামার পর হইতে এই স্থানের ও অন্যান্য স্থানের নীল কুঠিগুলি বগুড়া জেলা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। অধুনা বগুড়ায় আর নীল উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না।

শর্করা।

আজকাল বিদেশ হইতে বহুটাকার বীটচিনি আসিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এতদ্দেশীয় বহুস্থানের ইক্ষুচিনির কেন্দ্র সমূহকে ধ্বংসমুখে উপনীত করিয়াছে, কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ন্যায় বগুড়া জেলার পাঁচবিবি থানার অন্তর্গত জামালগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে অতি উৎকৃষ্ট ইক্ষু চিনি প্রস্তুত হইয়া সমগ্র জেলার শর্করার অভাব পরিপূর্ণ করিত। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির নিমিত্ত কি প্রণালীতে গুড় হইতে শর্করা প্রস্তুত কার্য্য নিষ্পন্ন হইত, তাহার সামান্য আভাস এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে।

বলা বাহুল্য, পূর্ব্বে বগুড়া জেলার নানাস্থানে প্রচুর পরিমাণ ইক্ষুচাষ প্রচলিত ছিল। আজ পর্য্যন্তও শিবগঞ্জ থানার ধাওয়াগির, দোগাছি, মীরাপুর, নন্দীপুর, মহাবোলা, বান্না, গোপালপুর, বোয়াইলমারী, কাগছগাড়ী, বাকসন্, জুড়ী, শঙ্করপুর, বাদা, ঘোড়ামীরা, বালুপাড়া, খড়িয়াবাদা প্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকারের প্রচুর পরিমাণ ইক্ষুচাষ প্রচলিত আছে, এবং ঐ ইক্ষু রসে যথেষ্ট গুড় প্রস্তুত হইয়া 'মোকামতলা' প্রভৃতিস্থানের হাটে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়া থাকে। এতদঞ্চলে সাধারণতঃ বোম্বাই, সূর্য্য বোম্বাই, আষ্টিয়া মুখী, কাজলীকুশী ও ভেল্লামুখী জাতিয় ইক্ষুই পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে এই ইক্ষু গুড় হইতে জামালগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট চিনি উৎপন্ন হইত এবং তদ্দ্বারা স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্ত্তী লোকগণের অভাব পরিপূর্ণ হইয়াও অন্যত্র রপ্তানি হইত। কিন্তু সেই শর্করা-প্রস্তুত ব্যবসায় বগুড়া হইতে এক্ষণে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে।

চিনি প্রস্তুত প্রণালী।

বড় বড় মৃদ্‌ভাণ্ডে গুড় কিছু আর্দ্র অবস্থায় মুখবন্ধ করিয়া দুই এক মাস রাখিলে গুড়ের অধিকাংশ দানা বাঁধিয়া যায়। তখন ভাণ্ডের মুখ ভাঙ্গিয়া শৈবাল দ্বারা আবৃত করতঃ তলদেশে ছিদ্র করিয়া দিলে ছিদ্র পথে সমুদায় "চিটা" (অপরিষ্কার পাতলা গুড়) বহির্গত হয় এবং শৈবালের গুণে উপরের কতকটা দানাকার গুড় শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। তখনই শাদা অংশ চাঁচিয়া লইয়া পুনর্ব্বার নূতন শৈবাল দ্বারা অবশিষ্ট গুড় ঢাকিয়া দিতে হয়। এই প্রকারে সমস্ত 'চিটা' বাহির হইয়া যায় এবং অবশিষ্ট অংশ শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া সংগৃহীত হইয়া থাকে। ঐ শ্বেতগুড় শুষ্ক করতঃ বস্তায় করিয়া রাখিলেই তাহা "দলো" চিনি নামে বাজারে সাধারণতঃ পরিচিত হয়।

দলোচিনি হইতে পরিষ্কৃত চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পিত্তলের কটাহ চূলায় চড়াইয়া উহাতে দলোচিনি ও জল ঢালিয়া দিতে হয়। যখন ফুটিতে থাকে তখন উহাতে অল্পে অল্পে দুগ্ধজল, চূণজল, ক্ষারজল প্রভৃতি ঢালিতে হয়। এবং "গাদ" উপরিভাগে

ভাসিয়া উঠিলে ঝাঁঝরার সাহায্যে তাহা অপসারিত করিতে হয়। এই প্রকারে পরিস্কৃত করতঃ কড়াই নীচে নামাইয়া তন্মধ্যস্থ পরিস্কৃত "দলো"গুলি শীতল করিলে, উহার উপরিস্তরে দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে ইহাই শর্করা। রস হইতে ঐ উপরিস্থিত দানাবদ্ধ শর্করা ছাঁকিয়া লইলে পুনরায় নূতন দানা বাঁধিতে থাকে, এবং তাহাও সংগ্রহ করিয়া লইলে পুনর্ব্বার দানা বাঁধিতে থাকে। এই প্রকারে সমস্ত দানা সংগৃহীত হইলে অবশিষ্টাংশ জ্বাল দিয়া অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত হয় এবং উক্ত সংগৃহীত দানাবদ্ধ শর্করা বস্তায় পুরিয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে।

ইহাই দেশী শর্করা প্রস্তুতের সংক্ষিপ্ত প্রণালী এবং এই প্রণালীতে বগুড়া জেলার অধীন পাঁচবিবি থানার অন্তর্গত জামালগঞ্জ এবং নিকটবর্ত্তী বদলগাছী প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ "দলো চিনি" ও শর্করা প্রস্তুত হইত বলিয়া অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে কারখানাগুলি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

জর্জ্জ ওয়াট সাহেব অনুমান করেন, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে অধিক পরিমাণে সুপরিস্কৃত শর্করা প্রস্তুত হইত না। চীন ও মিশর দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ শর্করা এদেশে আমদানী হইত। চীনজাত শর্করার নাম চিনি ও মিশরদেশজাত শর্করা "মিশ্রী" নামে এতদ্দেশে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে উক্ত নামদ্বয় ভারতবর্ষে সাধারণভাবে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

চিনি ও মিশ্রী শব্দের উৎপত্তি।

এরূপ হইলেও অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহে "শর্করা" শব্দের বহুল উল্লেখ দৃষ্টে আমাদের অনুমান হয় যে, প্রচুর পরিমাণে না হউক, শর্করা অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হইত এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য বহু শিল্পজাত দ্রব্যের ন্যায় ভারতবর্ষেই ইহার আদি জন্মভূমি। লাটিন ও গ্রীক ভাষায় শর্করার নাম 'শখার', পারসীক ভাষায় 'শকর' আরবীতে 'শখার' বা 'অশখার', স্পানিয়া ভাষায় "অজুকর্", ইটালীয় ভাষায় "জুক্যারো", ফরাসিতে "সুকরী", জর্ম্মণ ভাষায় 'জুখার' এবং ইংরাজীতে 'সুগর'। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে শর্করার ব্যবহার গ্রীক, ল্যাটিন, জর্ম্মণ প্রভৃতি জাতি এবং সম্ভবতঃ চীন ও মিশর জাতিরাও সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষ হইতেই পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ইয়ুরোপবাসিগণ ইক্ষুচাষ ও চিনি প্রস্তুত প্রণালী অবগত হইয়া আপনাদিগের দেশে ইহা সর্ব্বপ্রথম উৎপাদিত করেন

ভারতের শর্করার প্রাচীনত্ব।

প্রাচীনকালে কাগজ বগুড়ার একটি প্রসিদ্ধ শিল্প ছিল। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও বগুড়া জেলার সাজাপুর প্রভৃতি গ্রামে রাশি রাশি কাগজ প্রস্তুত হইয়া রাজসাহী, রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণ রপ্তানি হইত। এবং প্রায় সহস্র লোক এই শিল্প দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিত। এই সমস্ত কাগজ প্রস্তুতকারিগণ এতদঞ্চলে "কাগজি" নামে পরিচিত ছিল। এই কাগজিগণের মধ্যে অনেক

কাগজ।

ব্যক্তি আজিও বর্ত্তমান আছে, কিন্তু শ্রীরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলের উন্নত ধরণের কাগজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অসমর্থ হইয়া, ইহারা এক্ষণে কৃষিব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং অনেকেরই অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা অলিসেখ নামক একজন বৃদ্ধ কাগজীর নিকটে এতদঞ্চলের কাগজনির্ম্মাণ প্রণালী যে প্রকার অবগত হইয়াছি তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল।

কাগজ প্রস্তুতপ্রণালী।

প্রথমতঃ শঙ্খচূণের "গুঁছা" 'চাড়ির' ভিতর জল দিয়া ভিজাইয়া তন্মধ্যে "পাট" (কোষ্ঠা) ডুবাইয়া পা দ্বারা "খঁচিতে" হয়। তৎপরে ঐ 'পাট' ভিজা অবস্থায় উঠাইয়া "পালা" দিয়া ৮।১০ দিবস রাখিতে হয়। এইরূপ করিলে চূণ দ্বারা 'পাট' খাইয়া যায় এবং পরিষ্কার হইয়া থাকে। তখন "পালা" ভাঙ্গিয়া ঐ পচা ও ক্ষয়িত পাটগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া "ঢেঁকির" সাহায্যে তুষের ন্যায় গুঁড়া করিয়া লইতে হয়, এবং ঐ গুঁড়া "মট্‌কি" (বড় মৃদ্‌ভাণ্ড) পূরিয়া জলদ্বারা ভিজাইয়া ৮।১০ দিন, কি এক মাস পর্য্যন্ত রাখিতে হয়। সাধারণতঃ নদীর ধারে কি অন্য কোন জলাশয়ের পার্শ্বে রাখিলে কার্য্যের সুবিধা হইয়া থাকে। তৎপর কোন একটি জলাশয়ের মধ্যে "মাচা" প্রস্তুত করতঃ তাহার উপর সূক্ষ্ম নলের দরমা বিছাইয়া তদুপরি ঐ পচা পাট জল সমেত ঢালিয়া খঁচিতে ও তদুপরি ক্রমশঃ জলসেচন করিতে হয়। এইরূপ করিলে ক্রমে ময়লা কাটিয়া উক্ত পচা পাটের গুঁড়া পরিষ্কৃত হইয়া যায়। এইরূপে পরিষ্কৃত হইলে, ঐ পচাপাটের গুঁড়াগুলি মৃত্তিকায় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত একটি "চাড়ির" মধ্যে রাখিয়া তন্মধ্যে জল ঢালিয়া "কাঠি" দ্বারা আলোড়ন করতঃ জলের সহিত "মাড়ের" মত করিয়া মিশ্রিত করিতে হয়। বলা বাহুল্য উক্ত "মাড়" দ্বারা একটি বংশনির্ম্মিত "সঞ্চের" সাহায্যে কাগজ প্রস্তুত হইত বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

কাগজ প্রস্তুতে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি।

(১) ঢেঁকি—পাটগুলি গুঁড়া করিতে সৃষ্টি, কড়ি, বা অপর কোন ভারী কাষ্ঠের ৫।৬ হাত লম্বা ও ৫।৬ মণ ওজনের একটি ঢেঁকি নিতান্ত প্রয়োজন। এই ঢেঁকির "মস্থন" বেল কাঠের, "গুলা" লৌহনির্ম্মিত খুব চওড়া ও মজবুত এবং "গড়" প্রস্তরনির্ম্মিত হইবে। এক একটি ঢেঁকি এরূপ হওয়া প্রয়োজন হইত যে, তাহা পরিচালন করিতে ৭।৮ জন লোক এবং তৎপরিমাণ বিস্তৃত ঢেঁকির "পিছা" হওয়া প্রয়োজন ছিল।

(২) সঞ্চ—সাধারণতঃ তিন প্রকার আকারের কাগজ এতদঞ্চলে প্রস্তুত হইত এবং ঐ তিনপ্রকার কাগজ প্রস্তুতের নিমিত্ত "কাগজিগণ" তিন প্রকার "সঞ্চ" ব্যবহার করিত। বড় "আড়া" কাগজের সঞ্চ দৈর্ঘ্যে ৩২ অঙ্গুলি ও প্রস্থে ২০ অঙ্গুলি; "মধ্যম আড়ার" কাগজের সঞ্চ দৈর্ঘ্যে অনুমান ২০ অঙ্গুলি ও প্রস্থে ১৬ অঙ্গুলি; এবং "ছোট আড়া" কাগজের সঞ্চ দৈর্ঘ্যে ২০ অঙ্গুলি ও প্রস্থে ১৩ অঙ্গুলি পরিমাণ ছিল। একখানি সঞ্চ ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষিত হইয়া সাজাপুরের একটি কাগজির গৃহে আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। এই "সঞ্চটী" খুব

সরু সরু মসৃণ বাঁশের খিল দ্বারা নির্ম্মিত এবং রেশম সূত্রে "চিক্‌" বা "সড়কির" ন্যায় গাঁথা। উহার প্রস্থের উভয় প্রান্তে চারিটী করিয়া এবং মধ্যে ১৬টি "বাইন"। দৈর্ঘ্যের উভয় প্রান্তে দুইটী করিয়া বাঁশের মসৃণ "বাতা" দ্বারা খুব দৃঢ় করতঃ রেশম সূত্রে বাঁধা। কাগজ প্রস্তুতের সময় সঞ্চ পরিচালনের নিমিত্ত একটি "টাটি" বা "ফ্রেম" আছে। প্রস্থে তিনটী ও লম্বাদিকে দুইটি বাঁশের বাতা আড়াআড়ি ভাবে রাখিয়া রেশম সূত্রের সাহায্যে ঐ বাতাগুলি দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সহিত বাঁধিয়া এই টাটিখানি প্রস্তুত। এতদ্ব্যতীত সঞ্চের কার্য্যসৌকর্য্যার্থে আরও দুইটী আল্‌গা বাঁশের বাতা প্রয়োজন হইত।

কাগজ প্রস্তুতের ক্রম।

প্রথমতঃ "টাটির" উপর সঞ্চ রাখিয়া ঐ সঞ্চের প্রস্থের দুই প্রান্তে পূর্ব্বোক্ত দুইটী আল্‌গা "বাতার" সাহায্যে "টাটি"ও সঞ্চের প্রস্থের দুই প্রান্তে হস্ত দ্বারা দৃঢ় ভাবে ধারণ করতঃ 'টাটি'সহ সঞ্চখানি চাড়ির 'মণ্ড' মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া ঐ অবস্থায় 'সঞ্চ'খানি চারিধারে এরূপভাবে সঞ্চালন করিতে হয়, যেন সঞ্চের উপরে সমানভাবে স্তর পড়ে। তৎপর 'টাটি' ছাড়িয়া দিয়া এবং সঞ্চের উপরিস্থিত পূর্ব্বোক্ত আল্‌গা মসৃণ 'বাতা'দ্বয় পরিত্যাগ করতঃ কেবলমাত্র স্তর সহ সঞ্চ একখানি কাষ্ঠনির্ম্মিত মসৃণ পিঁড়ির উপর উল্টাইয়া রাখিয়া সঞ্চের পৃষ্ঠদেশে হস্ত সঞ্চালন করিলে কাগজের স্তরটি পিঁড়ির উপর পড়িয়া যায়। এই প্রকারে ঐ আদিম স্তরের উপর আরও স্তর জমাইতে হয়। ৩।৪ শত স্তর জমিয়া গেলে তাহার উপর একটি মসৃণ কাষ্ঠফলক লাগাইয়া ঐ কাষ্ঠের উপর দণ্ডায়মান হইয়া যথেষ্ট পরিমাণ চাপ প্রদান করিতে হয়। এইরূপে কতকটা জল নিঙ্‌ড়াইয়া গেলে, সে দিবসের নিমিত্ত ঐ অবস্থায় রাখিয়া দিতে হয়। পরদিন একটু চেষ্টা করিলেই প্রত্যেক স্তর পৃথক্‌ হইয়া খুলিয়া আইসে এবং এক একটি স্তর এক এক "তা" কাগজে পরিণত হইয়া থাকে। "তা"গুলি পৃথক করিয়া কাগজিরা সাধারণতঃ পরিষ্কার দেওয়ালের গায়ে ঐগুলি লাগাইয়া দেয়। তাহাতে 'তা'গুলি হইতে ক্রমশঃ জল নিঙ্‌ড়াইয়া শুষ্কহইয়া চুষিয়া যায়। জল নিঙ্‌ড়াইয়া ও শুষ্ক হইয়া গেলে কাগজের 'তা'গুলি রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ "কলপ" দিয়া লইতে হয়।

কলপ প্রস্তুত প্রণালী।

আতপ তণ্ডুলের গুঁড়া জলের সহিত পাতলা করিয়া জ্বাল দিয়া লইলেই 'কলপ' প্রস্তুত হয়। ঐ কলপ "তীরধুমার" খোসা দ্বারা কাগজে লাগাইয়া (ব্রাস করিয়া) কাগজগুলি পুনরায় রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। তৎপরে ঐ কাগজের 'তা'গুলি একখানা মসৃণ সমতল পিঁড়ির উপর রাখিয়া মসৃণ প্রস্তর শিলা দ্বারা উভয় পৃষ্ঠে ডলিয়া মসৃণ ও চক্‌চকে করিতে হয়। অনেক সময়, যাহাতে কাগজে কীট না ধরে, তজ্জন্য 'কলপের' সহিত কিঞ্চিৎ হরিতাল মিশ্রিত করতঃ ঐ কলপ লাগাইতে হয়। এই প্রকার হরিতাল মিশ্রিত কলপকৃত কাগজ এতদ্দেশে সাধারণতঃ "তুলট" কাগজ নামে অভিহিত হইত। অনেক সময় পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত তণ্ডুলের গুঁড়ার কলপ না দিয়া তেঁতুলের বিচি (আঁটি) ভিজাইয়া পেষণ করতঃ তদ্দ্বারা 'কলপ' প্রদান করা হইত। রঞ্জিণ

কাগজ প্রস্তুত করিতে হইলে কলপের সহিত নীল,লাল প্রভৃতি বিবিধ রং মিশ্রিত করিয়া লইতে হইত।

রেলওয়ে বিস্তারের পূর্ব্বে এতদ্দেশের "কাগজ" প্রধানতঃ ঘোড়া ও নৌকাওয়ালাগণের সাহায্যে বিভিন্ন জেলায় রপ্তানী হইত। পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহ হইতে দালালগণ সুবিধামত "টঙ্গি" ঘোড়া অথবা "নৌকা" লইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইত এবং "কাগজিগণের" নিকট কাগজ খরিদ করতঃ ঐ সমস্ত অশ্ব বা নৌকায় বোঝাই করিয়া লইয়া যাইত। এতদ্ব্যতীত বিনিময় প্রথাও প্রচলিত ছিল। এক হাত উচ্চ পুরাতন অব্যবহার্য্য কাগজ সমষ্টির পরিবর্ত্তে নূতন এক দিস্তা কাগজ প্রাপ্ত হওয়া যাইত। পাট ব্যতীত এই সমস্ত পুরাতন অব্যবহার্য্য কাগজ এবং ছিন্ন বস্ত্রাদিও "কাগজ" প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

বাজারে তৎকালে বড় "আড়ার" ভাল কাগজ সাধারণতঃ টাকায় ৮ দিস্তা, মধ্যম আড়ার কাগজ ১৬।১৭ দিস্তা, এবং ছোট আড়ার কাগজ ২১ দিস্তা হিসাবে বিক্রীত হইত। পাট ইত্যাদির খরিদা মূল্যের এবং কাগজের চাকচিক্য, পরিচ্ছন্নতা ও মসৃণতার তারতম্যে মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইত। সচরাচর মোটা কাগজের মূল্য অধিক ছিল।

তৎকালে একমণ পাট সাধারণতঃ দেড় টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত। কিন্তু এই একমণ পাট দ্বারা অন্যূন ১০৲ টাকা মূল্যের কাগজ প্রস্তুত হইত। সুতরাং এই কাগজ-শিল্প যে অতি লাভজনক ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাগজিরা জাতিতে মুসলমান ছিল এবং স্ত্রীপুরুষ সকলেই পুরুষানুক্রমে এই কাগজের ব্যবসাতেই লিপ্ত থাকিত।

বগুড়া জেলায় প্রাচীনকালে স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত অলঙ্কারাদির বিশেষ পারিপাট্য পরিদৃষ্ট হইত না। পূর্ব্বে এই জেলার উচ্চশ্রেণীর হিন্দু মহিলাগণ স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে সাধারণতঃ কর্ণে কড়ি, ঢেঁড়ি ও কদমা, নাসিকায় নথ, বেশর, বুলাক, বালী, কণ্ঠে হাঁসলী, চিক্‌, এবং বাহুতে তাড় ও বাজু পরিধান করিতেন। রৌপ্যালঙ্কারের মধ্যে হাঁসলি, কাটাবাজু, তাড়, চন্দ্রহার, খাড়ু, রোয়াদানী, ছন্‌, সরল, খাড়ুয়া বা মল, বাঁক, পঞ্চম প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত অলঙ্কার নির্ম্মাতাগণ "স্বর্ণকার" নামে অভিহিত এবং প্রায়শই মুসলমান জাতীয়। এই জেলার "কর্ম্মকার" জাতীয় হিন্দুগণ সাধারণতঃ লৌহশিল্প দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইদানীং ঢাকা অঞ্চল হইতে বহু "কর্ম্মকার" আগমন করতঃ আধুনিক ধরণের নানাপ্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার প্রস্তুত করিতেছে এবং ক্রমশই পুরাতন ধরণের অলঙ্কারগুলি পরিত্যক্ত হইয়া নানাপ্রকার নূতন নূতন অলঙ্কার এতদঞ্চলে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় মুসলমান জাতীয় কর্ম্মকারগণের মধ্যেও অনেকে এই সমস্ত ঢাকাই কর্ম্মকারগণের আদর্শে সুন্দর সুন্দর অলঙ্কারাদি প্রস্তুতে আগ্রহ ও নিপুণতা প্রকাশ করিতেছে।

স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প।

বগুড়া জেলার মধ্যে আঁচলাই, ডুপচাঁচিয়া, কাঞ্চনপুর প্রভৃতি স্থানে সমান সংখ্যক "কাংস্য" বণিকের বসতি পরিদৃষ্ট হয়। দুঃখের বিষয় ইহাদের মধ্যে সকলেই এক্ষণে জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছে এবং কেহ কেহ স্বর্ণকারের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। পিত্তল, কাংস্য ও তাম্র নির্ম্মিত তৈজসাদি বগুড়া জেলায় প্রস্তুত হওয়া এক্ষণে আর পরিদৃষ্ট হয় না।

পিত্তল কাংস্য ও তাম্র শিল্প।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বগুড়া জেলার যে সমস্ত কর্ম্মকার জাতীয় হিন্দু পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদের অধিকাংশই এক্ষণে জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। ইহাদিগের সংখ্যা ২০৩৪ জন মাত্র। ছুরী, কাঁচি, ক্ষুর, কাটারি, দা, খড়্গ, বল্লম, শড়কী, বঁটি, কড়া, বেড়ি, খন্তা, তাওা, জাঁতি বা সরতা, কুরুণী, হাতা, কাস্তে, কুঠার, সাবল প্রভৃতি নানাবিধ লৌহদ্রব্য এ জেলায় সাধারণতঃ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বামুনীয়া, সেকেরকোলা, আসকোলা, প্রভৃতি গ্রামের কর্ম্মকারগণ ঐ সমস্ত লৌহদ্রব্য প্রস্তুতের নিমিত্ত সমধিক প্রসিদ্ধ। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে স্বদেশী দ্রব্যাদির সমাদর পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, সম্প্রতি বগুড়া বাজারে অক্ষয়কুমার চন্দ ও রাধারমণ বড়াল নামক ব্যক্তিদ্বয় যে সমুদয় স্বদেশী টীনট্রাঙ্ক প্রস্তুত করিতেছে তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত ব্যক্তিদ্বয় ও আরও কতিপয় ব্যক্তির নির্ম্মিত টিনের লণ্ঠনগুলি এতদঞ্চলে যথেষ্ট বিক্রীত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বগুড়া দুর্গাদহ গ্রামবাসী জানকীনাথ কর্ম্মকার অতি উৎকৃষ্ট খড়্গ প্রস্তুতের নিমিত্ত গত ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের বগুড়া শিল্পপ্রদর্শনী কর্ত্তৃক প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছে।

লৌহ শিল্প।

"শঙ্খ" শিল্প শঙ্খবণিকগণের জাতীয় ব্যবসায়। ইহাদের সংখ্যা বগুড়া জেলায় নিতান্ত অল্প। কেবল আঁচলাই ও শাঁখারিয়া গ্রামে কয়েক ঘর মাত্র শঙ্খবণিকের নিবাস পরিদৃষ্ট হয়। ইহারা পুরুষ-পরম্পরাক্রমে এই জেলায় বাস করতঃ "শাঁখা" প্রস্তুত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে।

শঙ্খ শিল্প।

"লাহারী" নামক এক শ্রেণীর হিন্দু এই শিল্প ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহারা "লাহা" দ্বারা "চুড়ী" "বাংড়ী" প্রভৃতি অতি সুন্দর সুন্দর গহনা প্রস্তুত করিত। এক্ষণে "আঁচলাই" গ্রামে কয়েক ঘর মাত্র "লাহারী" পরিদৃষ্ট হয়। ইহারা বিলাতী চুড়ির সহিত প্রতিযোগিতায় অপারগ হইয়া প্রায় ৭।৮ বৎসর যাবৎ তাহাদের এই লাভজনক জাতীয় ব্যবসায়টী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে উহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। কিন্তু জাতীয় ব্যবসায় লোপ প্রাপ্ত হওয়ায় ইহাদের অবস্থাও অতীব শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

গালা বা লাহা শিল্প।

পূর্ব্বকালে সূত্রধর জাতীয় হিন্দুগণ এই শিল্প দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত। এই সূত্রধর

গণ অতি সুশ্রী কারুকার্য্যে খচিত খট্টা, পর্য্যঙ্ক, তক্তপোষ, সিন্দুক, বাক্স, চৌকি, পিঁড়ি, কপাট জানালা, চরকা, খড়ম, রথ, ইক্ষু ও তৈলের ঘানী, নৌকা, পাল্কী, চতুর্দ্দোল, মালা প্রভৃতি প্রস্তুত করিত। এক্ষণে মাণিকচক্ নাঙ্গলু, কাগইল প্রভৃতি গ্রামে কতিপয় হিন্দুজাতীয় সূত্রধর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা আজিও ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় জাতীয় ব্যবসায় দ্বারাই জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। কিন্তু স্থানীয় মুসলমানগণের মধ্যে অনেকে এই ব্যবসায় অবলম্বন করায় "সূত্রধর" গণের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

কাষ্ঠশিল্প।

বগুড়া জেলায় কুম্ভকারগণের সংখ্যা প্রায় ৪০০০ চারি হাজার। এই জাতীয় লোকগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে নানাপ্রকার মৃৎশিল্প দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। অতি সুন্দর সুন্দর হাঁড়ি, পাতিল, জালা, গামলা, সান্‌কি, প্রদীপ, গ্লাস, চাড়ী, কুপেরপাট প্রভৃতি ইহারা পুরুষানুক্রমে প্রস্তুত করিয়া থাকে। বগুড়ার নিকটবর্ত্তী সেঁউজগাড়ী গ্রামের "চাড়ী" "আড়িয়া ও সেকের কোলা" গ্রামের "পাতিল" এবং কালাই গ্রামের "কুপ-পাট" সৌন্দর্য্য ও স্থায়িত্বের নিমিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ।

মৃৎ শিল্প।

বগুড়া জেলার নানাস্থানে প্রাচীন দেবমন্দির ও অট্টালিকা সমূহের নিদর্শন দৃষ্টে অনুমান হয়, বহুপ্রাচীন কাল হইতে এস্থানে ইষ্টক ও টালি প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইত। অনেক স্থানে কারুকার্য্য খচিত ইষ্টকও প্রাপ্ত হওয়া যায়। আজিও এজেলার বহুস্থানে অতি উৎকৃষ্ট ইষ্টক ও টালি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইষ্টকাদি ব্যতীত নানা প্রকার দেব প্রতিমাও এ জেলায় প্রস্তুত হয়। প্রতিমা নির্ম্মাতাগণকে সাধারণতঃ "মালাকর" নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

কৃষ্ণনগরের কারিকরগণের অনুকরণে অধুনা কাঞ্চনপুর নিবাসী সতীশচন্দ্র কুণ্ডু নামক জনৈক ব্যক্তি যে সমুদয় সুন্দর সুন্দর মৃন্ময় ফুল, ফল, ও খেলনা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে, তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বগুড়া জেলার "মালাকর" জাতীয় হিন্দুগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ইহারা অতি প্রাচীনকাল হইতে অতি সুন্দর সুন্দর ডাকের সাজ, সোলার টোপর, পুষ্প, পক্ষী ইত্যাদি এবং প্রয়োজনমত বারুদ ও নানাবিধ বাজি প্রস্তুত করিয়া থাকে। এক্ষণে মুসলমান ও অন্যান্য জাতীয় অনেক ব্যক্তিও বারুদ ও বাজি ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ডাকের সাজ, সোলার জিনিস, বাজী, বারুদ ইত্যাদি।

ডোম ও পাটনি জাতীয় লোকগণ এই জেলায় গৃহকার্য্যের নিমিত্ত বাঁশের কুলা, ধুচুনী, ডালা, ঝুড়ি, চাঙ্গারি, চালন, খৈচালা, চাটাই, পাখা প্রভৃতি বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত ইহারা বেতের ধামা, পাল্লা, সের, কাঠা প্রভৃতিও প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহাদের নির্ম্মিত নলের তালাই দরমাও সময়ে সময়ে বাজারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর হইল হরিণাকুলবাড়ী

বংশশিল্প।

গ্রামের আয়েতুল্লা আকন্দ নামক এক ব্যক্তি অতি সুন্দর সুন্দর বংশ নির্ম্মিত "ছড়ি" বা লাঠি প্রস্তুত করিতেছে। এই "ছড়ি" গুলির কোন কোনখানি ১০।১৫।২০ এমন কি ৩০৲ টাকা পর্য্যন্তও বিক্রীত হইতেছে।

তৃণশিল্প।

বগুড়ায় অতি সামান্য পরিমাণ সপ' বা মাদুর প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ স্থানের মাদুর গুলি কিছু মোটা হইলেও শক্ত ও বহুকালস্থায়ী; মাদুর-নির্ম্মাতাগণ সাধারণতঃ মুসলমান জাতীয়।

মাদুর ব্যতীত এ স্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আকারের নানাপ্রকার তালপাখা প্রস্তুত হয়।

দড়ি, চট ইত্যাদি।

এই জেলায় প্রচুর পরিমাণ পাট ও শণের চাষ হইয়া থাকে। এই পাট ও শণের অধিকাংশ বিভিন্নস্থানে রপ্তানী হইয়া গেলেও, অবশিষ্ট যাহা বর্ত্তমান থাকে তদ্দ্বারা স্থানীয় লোকগণ কাছি, দড়ী, শিকে, গুণ, থলিয়া, চট প্রভৃতি বহুল পরিমাণে প্রস্তুত করে। প্রাচীনকালে "শিকায়" "কড়ি" গাথিয়া সুসজ্জিত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এক্ষণে পল্লীগ্রাম ভিন্ন অন্যত্র "শিকার" ব্যবহার এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। করঞ্জাহাট, কাঁকড়া, চামারপাড়া, কাগইল, জামারবাড়ীয়া (সারিয়াকান্দী), চিল্লি (সারিয়াকান্দী) প্রভৃতি গ্রামের কপালীজাতীয় হিন্দুগণ অদ্যাপি যথেষ্ট চট নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

সূতা।

পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই জেলাতেও প্রায় ঘরে ঘরে "চরকা" পরিদৃষ্ট হইত এবং স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্মের অবসরে উক্ত চরকার সাহায্যে উত্তম চিক্কণ সূত্র প্রস্তুত করিত। তন্তুবায়গণ কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিকের পরিবর্ত্তে ঐ সূত্র দ্বারা গৃহস্থগণকে বস্ত্র বয়ন করিয়া দিত। এক্ষণে স্থানীয় জোলা, যুগী ও তন্তুবায়গণের গৃহ ব্যতীত অন্যত্র চরকা প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয় না।

চর্ম্মশিল্প।

সেরপুর প্রভৃতি স্থানে পূর্ব্বকালে অতি সুন্দর সুন্দর "নাগরা জুঁতা" প্রস্তুত হইত এবং তৎকালে ভদ্রলোকগণ ঐ "নাগরা জুতাই" ব্যবহার করিতেন। এক্ষণে এতদ্দেশে আর নাগরা জুতা প্রস্তুত হইতে দেখা যায় না। সম্প্রতি কৃষ্ণনগর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে মুচীগণ আসিয়া বগুড়ায় নানাপ্রকার আধুনিক ধরণের জুতা প্রস্তুত করিতেছে।

স্থাপত্য শিল্প।

স্থাপত্য শিল্প যে বগুড়া জেলার অতি প্রাচীনযুগ হইতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহা "মহাস্থান" নামা "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী" প্রভৃতি স্থানের অট্টালিকা ও দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে আজিও অনুমান করা যাইতে পারে।

মিঠাই ইত্যাদি।

এই জেলায় প্রায় ১২০০ ময়রা জাতীয় হিন্দুর বাস। ইহারা অতি প্রাচীনকাল হইতে নানাপ্রকার "মিঠাই" প্রস্তুত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকালে সেরপুরের "সরভাজা" এবং ভবানীপুরের "ক্ষীরতক্তি" সমগ্র বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

উপরোক্ত শিল্প ব্যতীত বগুড়া জেলায় সামান্য পরিমাণ "চুণ" এবং সর্ব্বত্র যথেষ্ট পরিমাণ তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জেলার "তণ্ডুল" ও "সর্ষপ" তৈল বিশেষ প্রসিদ্ধ।

অন্যান্য।

আমরা অতি সংক্ষেপে বগুড়া জেলার প্রচলিত, অপ্রচলিত, মৃত, অর্দ্ধমৃত ও সজীব শিল্প সমূহের আলোচনা শেষ করিলাম। শিল্পসম্পদে প্রাচীন ভারতবর্ষ এক সময়ে পৃথিবীর বাণিজ্যক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। আর্য্যজাতির এই গৌরবময় শিল্প-বাণিজ্যের পরিচয় অদ্যাপি ভারতের নগরে নগরে—পল্লীতে পল্লীতে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রত্যেক জেলা স্ব স্ব প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিত এবং নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে পরিপূরিত করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা বাণিজ্যার্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, এমন কি ভারতের বহির্ভাগে বাণিজ্য-পোতের সাহায্যে প্রেরণ করিত। এই প্রকারে বহুকাল যাবৎ নিজের অভাব মোচন করিয়াও বহু শিল্পজাতদ্রব্য ক্রমাগত বিদেশে রপ্তানী করায় প্রাচীন ভারতবর্ষ প্রচুর সম্পদের অধীশ্বর হইয়া উঠিয়াছিল। "টলেমি" লিখিয়াছেন যে গঙ্গানদীর মোহানা হইতে মলয় দেশ পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ভূভাগে অনেকগুলি বাণিজ্যস্থান বিদ্যমান ছিল।

জনৈক পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন :—

"Hence in all ages, the trade with India has been the same; gold and silver have uniformly been carried thither in order to purchase the same commodities, with which it now supplies all nations; and from the age of Pliny to the present times, it has been always considered and execrated as a gulf which swallows up the wealth of every other country, that flows in incessantly towards it, and from which it never returns". অর্থাৎ ভারতবর্ষ একটী উপসাগর, উহার গর্ভে যাবতীয় জাতির ধনরাশি ক্রমাগত পতিত হয় এবং একবার গলাধঃকরণ হইলে আর কখনই উদ্গীরিত হয় না (১)। বঙ্গবাসী সওদাগরগণ স্ব স্ব বাণিজ্য পোত বিবিধ শিল্পজাত দ্রব্যাদিতে পরিপূরিত করিয়া ভারত-সাগরের উপকূলে গমনাগমন করিত এবং যব, বালীদ্বীপ, এমন কি সিংহল পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত বলিয়া প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতি প্রাচীনকাল হইতে তাম্রলিপ্ত বা তমোলুক বঙ্গদেশের একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। মহাভারত প্রভৃতি সুপ্রাচীন গ্রন্থেও এই তাম্রলিপ্তের গৌরবকাহিনী বর্ণিত আছে। বগুড়া জেলার অন্তর্গত চম্পানগর (চাঁদনীয়া বা চাঁদমুয়া) এবং উজ্জয়িনী (বা উজানী) নামক স্থানদ্বয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অতি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান ছিল বলিয়া জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। চম্পানগরে বা চাঁদমুয়া গ্রামে প্রসিদ্ধ

(১) Robert's Hist. Disg. on Anc. India. p. 202,

বণিক চন্দ্র সওদাগরের বাস এবং বগুড়ার চারি মাইল পশ্চিমে ইরুলিয়া নামক গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী উজ্জয়িনী বা উজানী নগরে চন্দ্র সওদাগরের আত্মীয় অপর প্রসিদ্ধ বণিক বাস সওদাগরের বাসস্থান, স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আজিও অনুসন্ধিৎসু পথিকের নিকট প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বহুকাল অতীত হইয়াছে, তথাপি ইহাদের গৌরবকাহিনী আজিও বগুড়াবাসী নরনারীর মানসপটে সজীব ও উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সওদাগরদ্বয় যথাক্রমে কালীদহ ও সুবিল দ্বারা করতোয়ার নিকট আসিয়া তৎসাহায্যে দেশ দেশান্তরে বাণিজ্যতরী প্রেরণ করিত বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

তৎপর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে বগুড়া জেলার সেরপুর নামক স্থানটী ক্রমশঃ বাণিজ্য ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে রচিত "আইন আকবরী নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই স্থানে সম্রাট্ আকবর কর্ত্তৃক তদীয় পুত্র সেলিম (জাহাঙ্গীর) এর নামানুসারে সেলিমনগর নামক একটী দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ময়মনসিংহ সেরপুর হইতে পৃথক করিবার অভিপ্রায়ে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ "বগুড়া সেরপুরকে" "সেরপুর মুরচা নামে অভিহিত করিয়াছেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ডচ্ গভর্ণর "ভন্ ডেনব্রুক" সাহেব কর্ত্তৃক অঙ্কিত বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ মানচিত্রে "সেরপুর মুরচা" "Ceerpur Mirts" নামে এবং চম্পানগর বা চাঁদনীয়া ট্যাসেণ্ডিয়া (Tassandia) নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতের—বঙ্গদেশের—বগুড়া জেলার সে সুখ সৌভাগ্য—সে বাণিজ্য গৌরব—সে শিল্পোন্নতি—আর নাই! বহুকাল যাবৎ তাহা কালের সর্ব্বধ্বংসী কুক্ষিগত হইয়াছে। তাহা আর কখন ফিরিয়া আসিবে কি না কে বলিতে পারে!

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন।

উত্তরবঙ্গের মুসলমান সাহিত্য। *

সাত শত বৎসরের অধিক হইল উত্তরবঙ্গের সহিত মুসলমানের সম্বন্ধ। মহাবীর বখ্‌তি-য়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হইলে উত্তরবঙ্গ মুসলমানের শাসনাধীনে আইসে। তিনি নববিজিত প্রদেশের শাসন সৌকর্য্যার্থে লক্ষ্ণৌতিনগরে দক্ষিণাংশের এবং দেবকোটে উত্তরাংশের রাজধানী স্থাপন করেন। দেবকোটের ধ্বংসাবশেষ দিনাজপুর জেলায় বিদ্যমান আছে। যে পাণ্ডুয়া ও গৌড়নগর বহুদিবস যাবৎ সমগ্র বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, তাহা এই উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত। যে ঘোড়াঘাটের সমৃদ্ধির কথা এখনও প্রবাদ বচনের ন্যায় প্রচলিত আছে, যাহার ৫২ বাজার ৫৩ গলি এখনও লোকে ভুলিতে পারে নাই, যেখানে বহুকাল যাবৎ প্রাদেশিক মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ বাস করিতেন, সেই প্রাচীন ঘোড়াঘাট গভীর অরণ্যরাজি দ্বারা আবৃত হইয়া এখনও উত্তরবঙ্গে মুসলমান-গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য দিনাজপুর জেলায় বিদ্যমান আছে। প্রতাপান্বিত রাজপুরুষ এবং বীরগণের কীর্ত্তি ভিন্ন মহাস্থান, সাহাজাদপুর, বাবা প্রভৃতি স্থানে মুসলমান সাধকদিগের মাহাত্ম্যও অনেক দিন হইল উত্তরবঙ্গে ইসলামের পবিত্র জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে। অল্পদিন পূর্ব্বে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের ধারণা ছিল, কেবল তরবারির সাহায্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রভাব ঈদৃশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সৌভা-গ্যের বিষয়, সত্য ইতিহাস আলোচনার সঙ্গে সেই ভ্রান্ত সংস্কার ক্রমশঃ শিক্ষিত সমাজ হইতে দূরীভূত হইতেছে। অতএব আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, উত্তরবঙ্গে মুসলমান সংখ্যাধিক্যের কারণ, ইস্‌লামের তরবারির প্রভাবে নহে, সনাতন একেশ্বর-বাদের মাহাত্ম্য। পূর্ব্বোক্ত রাজপুরুষ এবং সাধকগণের সঙ্গে আরব, পারস্য, আফ-গানিস্থান এবং পশ্চিম ভারতের অনেক মুসলমান উত্তরবঙ্গে আগমন করিয়া এখানে স্থায়ী রূপে বাস করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন স্থানীয় হিন্দুগণের মধ্যেও অনেকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোটের উপর উত্তরবঙ্গে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অনেক অধিক। কেন অধিক, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আরব, পারস্য, আফ্‌গানিস্থান অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন আর এতদ্দেশবাসী হিন্দুই হউন, আমরা এক্ষণে বাঙ্গালী, আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বাস্তবিক পক্ষে ঐ সকল দেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহারাও এখন আর আরব, পারসি, অথবা আফ্‌গান বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে

---

* উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বগুড়া নগরে পঠিত।

পারেন না, কারণ দীর্ঘকাল যাবত ঐ সকল দেশের সহিত তাঁহাদের কোন সংশ্রব নাই। পূর্ব্ব পুরুষগণের জন্মভূমির সহিত সংশ্রব শূন্য হইয়া যে দেশে আমরা সাত শত বৎসর বাস করিতেছি, সেই দেশকে যদি আমরা এখনও স্বদেশজ্ঞান না করি, তাহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য এবং পরিতাপের বিষয় আর কি আছে।

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথমে যে ভাষা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, যে ভাষা আমরা আজীবন ব্যবহার করি, যে ভাষায় আমরা সুখদুঃখ, হর্ষ, বিষাদ প্রকাশ করি, যে ভাষায় হাটে বাজারে, ব্যবসায় বাণিজ্যে এবং বৈষয়িক কার্য্যে কথোপকথন করি, যে ভাষায় নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখি, সেই ভাষা বাঙ্গালা। সুতরাং বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা। উত্তরবঙ্গের যে অঞ্চলের হিন্দুগণ যে ভাষা ব্যবহার করেন, সেই অঞ্চলের মুসলমানগণও সেই ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ হিন্দু মুসলমানের ভাষা এক। তবে মুসলমানের কথিত ভাষায় স্থল বিশেষে দুই চারিটী আরবি, পারসি ও উর্দ্দু শব্দের অধিক প্রচলন দেখা যায়। হিন্দুগণও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ভাষা সম্পদ কম গ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস দেখুন, বাঙ্গালা অভিধান অনুসন্ধান করুন; দেখিবেন, কত আরবি ও পারসি শব্দ বাঙ্গালা ভাষার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালা দেশ যেমন হিন্দু মুসলমান উভয়ের স্বদেশ, বাঙ্গালা ভাষাও সেইরূপ হিন্দুমুসলমান উভয়ের মাতৃভাষা।

জ্ঞানিগণ একবাক্যে বলিয়াছেন, যে জাতি যত উন্নতি লাভ করেন তাঁহাদের মাতৃভাষা সেইরূপ উন্নত হয়। মাতৃভাষার পরিণতির দ্বারাই জাতীয় সাহিত্য গঠিত হয়। দুঃখের বিষয় উত্তরবঙ্গের মুসলমানগণ এই সুদীর্ঘ সাত শতাব্দীর মধ্যে মাতৃভাষার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। ইহা অপেক্ষা তাঁহাদের অবনতির উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের আর আবশ্যকতা নাই। যে মুসলমানগণ এক সময় আরবি পারসি প্রভৃতি সাহিত্যে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, যাঁহাদের কার্ডোভা, কায়রো, বোগদাদ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবৃন্দের পদপ্রান্তে বসিয়া ইউরোপ সভ্যতার বীজ আহরণ করিয়াছেন, যাঁহাদের মধ্য হইতে ইমাম আবুহানিফা, ইমাম গজ্জালী, আবু-আলি সিনা প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত, শেখ সাদি, হাফেজ, ফেরদৌসী, রুমি, নিজামী প্রভৃতি অমর কবি; মস্উদী, এব্নে হোকল, আবুরয়হান বৈরূণী, এব্নেবতুতা, প্রভৃতি ভৌগলিক, ওবারদাখাতুন, শেখ শুদা, জয়নাব উম্মেঅল মোরাইদ, তাকিয়া খাতুন, সোলতানা রেজিয়া, নুরজাহান, জেবন্নেসা প্রভৃতি বিদুষী রমণী আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই স্বধর্ম্মাবলম্বী এবং বংশধর আমরা, এতদিন যাবত মাতৃভাষার উন্নতি কল্পে চেষ্টা করি নাই, বড়ই লজ্জার বিষয়। সুধু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অতীত কীর্ত্তি কাহিনীর গর্ব্ব করিলে কি হইবে, সুধু আত্মাভিমান লইয়া থাকিলে কি হইবে? কার্য্য দ্বারা প্রমাণ করা উচিত যে, আমরা তাঁহাদের বংশধর তাঁহাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী।

বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে আমরা প্রতিবেশী হিন্দুভ্রাতৃগণের অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছি। কেবল সাহিত্যে কেন, সাংসারিক কোন বিষয়েই আমরা তাঁহাদের সমকক্ষ নহি। যতদিন আমাদের সৌভাগ্যের দিন ছিল, ততদিন আমরা বাঙ্গালা ভাষাকে যত্ন করি নাই। আরবি পারসির মোহে মুগ্ধ ছিলাম, তখন হিন্দুরাও বাধ্য হইয়া আরবি পারসির চর্চ্চা করিতেন। সে দিন অতীতের স্বপ্নকাহিনীতে পরিণত হইয়াছে; তথাপি আমাদের মোহ ছুটিতেছে না। অনেকে বাঙ্গালার বাঁশবন ও আম্রকাননের মধ্যস্থিত পর্ণকুটীরে নিদ্রা যাইয়া এখনও বোগদাদ, বোখারা, কাবুল, কান্দাহারের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে উর্দ্দুকে মাতৃভাষা করিবার মোহে বিভোর। দুর্ব্বল ব্যক্তি যেমন আলৌকিক স্বপ্ন দর্শন করে, অধঃপতিত জাতিও তেমনি অস্বাভাবিক খেয়াল আঁটিয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় জাতি ধর্ম্মনির্বিশেষে ভারতবাসীর জ্ঞানালোচনার সুযোগ ঘটিয়াছে। সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মের লোক আত্মোন্নতির চেষ্টা করিতেছেন এবং নিজ নিজ মাতৃভাষার উন্নতি জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন কিন্তু আমরা বাঙ্গালী মুসলমানগণ মাতৃভাষার আলোচনায় আশানুরূপ অগ্রসর হই নাই।

আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুভ্রাতৃগণ বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি জন্য যেরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন, আমরা তাহার শতাংশের একাংশ করিলেও বাঙ্গালা ভাষার অপূর্ব্বশ্রী সাধিত হইত, সঙ্গে সঙ্গে পতিত আমরাও উন্নতিমার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিতাম; আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জ্ঞানগরিমা, আমাদের পবিত্র ইসলামের বিশ্বজনীন উদারতা এবং যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করিয়া হিন্দুভ্রাতৃগণকে মুগ্ধ করিতে পারিতাম। তাঁহাদিগকে দেখাইতে পারিতাম; ইসলামের ভিত্তি কিরূপ উদার এবং অকাট্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের মধ্যে কত মহা পণ্ডিত, কত দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষ, কত প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, কত অমরকবি, কত মহা দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনন্ত অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে হিন্দুদিগের সহিত আমাদের ভাবের আদান প্রদানের সুবিধা হইত, তাঁহারা আমাদের গৌরবের বিষয় অবগত হইয়া শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন, আমরাও আত্মগরিমা অনুভব করিয়া উন্নতি ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতাম। আমাদের সেই সকল গৌরবের কাহিনী আরবি, পারসি প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষার বিশাল ভাণ্ডারে নিহিত রহিয়াছে, তাহা অন্যকে প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, আমরাই খোঁজ রাখি না।

সুখের বিষয়, অল্পদিন হইল, উত্তরবঙ্গের মুসলমানগণ বাঙ্গালা সাহিত্যালোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই দুই একজন কৃতিত্বও দেখাইয়াছেন। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং শেখ ফজলল করিমের ন্যায় প্রতিভাশালী কবি, মৌলবী মির্জা মোহাম্মদ ইউছফ আলী, এবং মৌলবী তস্‌লিম উদ্দীন আহমদের ন্যায় চিন্তাশীল লেখক, মিসেস্ আর, এস্, হোসেনের ন্যায় সুলেখিকা, সিরাজী, মুনসী, মেহের উল্লা, এবং মৌলবী মোহাম্মদ

উদ্দীন আহমদের ন্যায় সুবক্তা হিন্দু সমাজেও বিরল। ইঁহারা উত্তরবঙ্গের মুসলমান সাহিত্যিকগণের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এক্ষণ অনেকেই সাহিত্য সাধনায় নূতন ব্রতী হইতেছেন। তাঁহাদের দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ আশা আছে।

হিন্দুসাহিত্যিকগণ সংস্কৃত সাহিত্যসমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক বেদ, পুরাণ, ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্র দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। অনেক পাশ্চাত্য জ্ঞানও বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। এমন কি তাঁহারা মুসলমানদিগের অনেক গ্রন্থ ভাষান্তরিত ও রূপান্তরিত করিতেছেন। বাবু গিরীশ চন্দ্র সেন তজকরাতল আউলিয়া এবং কোরাণ শরীফের অনুবাদ করিয়া তাপসমালা ও কোরাণের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাকবি হাফেজের কতিপয় কবিতার অনুবাদ করিয়া সদ্ভাবশতক রচনা করিয়াছেন। অল্পদিন হইল সায়েরে মোতাক্ষিরিণ, রিয়াজস্ সালাতিন প্রভৃতি গ্রন্থ হিন্দুলেখকগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। কিন্তু আরবি ও পারসি সাহিত্যভাণ্ডারে এখনও অসংখ্য রত্নরাজি বিদ্যমান আছে। সেই সকল কেবল মাত্র বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিতে শত শত প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইতে পারে। অতএব চিন্তা করিয়া দেখুন, মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীর কর্ম্মক্ষেত্র কিরূপ বিস্তীর্ণ।

মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্যসেবিগণ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা হিন্দুদিগের ন্যায় সংস্কৃত মূলক সাধু বাঙ্গালার আলোচনা করেন,—তাঁহারা এক শ্রেণী, আর যাঁহারা উর্দ্দু পারসি শব্দ বহুল সাধারণ মুসলমানের চলিত ভাষার আলোচনা করেন, তাঁহারা অপর শ্রেণী। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকগণ পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ রচনার পক্ষপাতী, তাঁহাদের ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য আছে এবং তাঁহারা ব্যাকরণের নিয়মাধীন। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যসেবিগণের ভাষা কোনরূপ নিয়মের অধীন নহে, তাঁহারা যদৃচ্ছা পদবিন্যাস এবং শব্দ ব্যবহার করেন, এই শ্রেণীর ভাষা সাধারণতঃ পদ্যে, পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি মিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত। কিন্তু তাহারও কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নাই। এই ভাষা 'মুসলমানি বাঙ্গালা' নামে পরিচিত। উত্তরবঙ্গে এই ভাষার লেখক এবং পাঠকের সংখ্যা অনেক অধিক। এস্থলে সাধু বাঙ্গালার নমুনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, নিম্নে মুসলমানি বাঙ্গালার কতিপয় নমুনা প্রদত্ত হইল।

"এবে সবে আপন হয়, নিদানের কেহ নয়, পুত্র মাত্র সেসে আপনার। হেয়াত মহাম্মদ কহে, কেহই কাহার নহে, গুরুর চরণ খানি সার॥" হেতুজ্ঞান।

"দিন চারি দিন দুই দুনিয়ার বাস। নিদানে মরিবে সবে ছাড়িয়া নিশ্বাস॥" হেতুজ্ঞান।

"হাদিসের কথা শুনি হইছে বিশ্বাস,
বৃথা দুনিয়ার সুখ ঘর গৃহবাস।
বেহেস্ত করিছে খোদা সুখের মোকাম,
সেই সুখ চির সুখ ভেবে দেখিলাম।

সে সুখ পাওয়ার কোন কাজ না হইল,
অনিত্য সংসার সুখে বৃথা দিন গেল।"

মজমার নছিহত।

"কোথা ছিলে কোথা এলে যাইবে কোথায়।
কিসের লাগিয়া খোদা তোমারে বানায়॥
দুনিয়াতে কি জন্তেতে পাঠাইল সাঁই।
তাহার উদ্দিস ভাই কেহ কর নাই॥
একেলা কবরে তুমি যাইবা যখন।
খোদার খোদাই তবে জানিবা তখন॥"

কেহানারে সোরে কেয়ামত।

এক বাদসা ছিল তার নাম সেকেন্দর।
সাগর জঙ্গম আদি দখল ছিল তার॥
কোন ঠাঁই দখলের বাকী নাহি ছিল।
দরিয়ার মৎস্য আদি যারে কর দিল॥"

দেল মনছুব।

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর লেখকদিগের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য বিস্তর। মুসলমান সাহিত্যিকগণের মধ্যে ভাষা সম্বন্ধে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার পক্ষপাতী, কেহ কেহ প্রচলিত মুসলমানি বাঙ্গালার অনুরাগী। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে উপলব্ধি হয়,—এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী একটি উপায় নির্দ্ধারণ হওয়া আবশ্যক। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা তাহার মূলভিত্তিস্বরূপ থাকিবে, তদুপরি বাঙ্গালা উপকরণ ও অলঙ্কারাদির সঙ্গে সুবিধাজনক আরবি পারসি শব্দ সম্পদ মিশ্রিত করিয়া অপূর্ব্ব নবভাষাসৌধ নির্ম্মিত হইবে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ ধরণেই এই ভাষার কলেবর গঠিত হইবে, তবে যে সকল মুসলমানি শব্দ অথবা ভাব বাঙ্গালা ভাষার অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আবশ্যকমত ব্যবহার করা যাইবে। যেমন জমা খরচ, খাজানা, গোয়েন্দা, সেরেস্তা, কাগজ, কলম প্রভৃতি শত শত আরবি পারসি শব্দ বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগকে ভিন্ন ভাষা বলিয়া আর উপলব্ধি হয় না এবং অনেকগুলির প্রতিশব্দও খাঁটি বাঙ্গালায় নাই। এই সকল শব্দ ব্যবহৃত হইলে বাঙ্গালা ভাষার সমৃদ্ধিই বৃদ্ধি পাইবে।

আমরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মুসলমান সাহিত্যিকগণের বিষয় যতদূর জানিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম।

রঙ্গপুর।

এই জেলার মুসলমানের লিখিত বাঙ্গালা প্রথম পুস্তক-আমপারার তফসির (ভাষ্য)

পবিত্র গ্রন্থ কোরাণশরীফের প্রধান একটি অধ্যায় আমপারা। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে রঙ্গপুরের অন্তর্গত মট্‌কপুর নিবাসী আমিরুদ্দীন বশুনিয়া আমপারার এই পদ্যানুবাদ রচনা করেন। উপরে আরবি আয়েত (শ্লোক) নিম্নে বাঙ্গালা অনুবাদ। ভাষা মুসলমানি বাঙ্গালা। শ্রদ্ধাস্পদ গিরীশ বাবু এবং মৌলবী নইমউদ্দীন সাহেবের পূর্ব্বে কোন মুসলমান কোরাণশরীফ বা তাহার অংশবিশেষের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন—ইহা শুনিয়া অনেকেই বোধ হয় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন। এই বইখানি সেকালের কোন লিথো প্রেসে মুদ্রিত; আকার ডিমাই ১২ পেজি, ১৬৮ পৃষ্ঠা। ইহা এখন দুষ্প্রাপ্য। বাসনা সম্পাদক কাকিনা নিবাসী সেখ ফজলল করিম সাহেব একখণ্ড বই অনেক চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়াছেন।

গোলামিজান আফ্‌তাব দস্তান—রহিম বক্‌স্‌ প্রণীত। ইহা একখানি গল্প পুস্তক, ১২৮৭ সালে মুদ্রিত। ভাষা মুসলমানি বাঙ্গালা হইলেও রচনায় একটু কৃতিত্ব আছে। গ্রন্থকারের বাসস্থান রঙ্গপুরের অন্তর্গত বাগাবামুনিয়া গ্রাম ষ্টেং পলাশবাড়ী।

ইমামসাগর—লেখক মোহাম্মদ বনিজ। বাসস্থান কাকিনার নিকটবর্ত্তী গোপালরায় গ্রাম। ভাষা মুসলমানি বাঙ্গালা।

(ক) জাকাত রহমান (খ) বাবু মিঞার আলাপ—রঙ্গপুরের মুন্সী কাজী ফজলর রহমান এই গ্রন্থদ্বয়ের লেখক। প্রথম পুস্তকখানি জাকাত অর্থাৎ দান-বিষয়ক, পদ্যে বিরচিত, দ্বিতীয়খানি সুন্দর প্রহসন, পড়িতে পড়িতে হাসিয়া আকুল হইতে হয়। গ্রন্থকার বর্ত্তমান কাকিনারাজের পারসী শিক্ষক ছিলেন—এক্ষণে পরলোকগত।

ইস্‌লামপ্রদীপ,—মুন্‌শী ছখিউদ্দীন আহম্মদ প্রণীত। ইহা একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক, ভাষা সাধু বাঙ্গালা। গ্রন্থকার একজন স্বজাতি প্রেমিক উৎসাহী যুবক, পতিত মুসলমান সমাজের উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া বইখানি রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নিবাস নিলফামারির অন্তর্গত কালিকাপুর গ্রামে, অল্পদিন হইল এই নবীন লেখক পরলোক গমন করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত ফকীর বিলাস প্রভৃতি দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ২।৩ খানি পুথির নাম শুনা যায়। কিন্তু সেই সকল পুথি এবং লেখকের বিষয় আমরা ভালরূপে জানিতে পারি নাই। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ব্রানউল্লা নামক রঙ্গপুরের একজন প্রাচীন কবির নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তৎপ্রণীত পুস্তকাদির বিষয় কিছু জানা যায় না।

উপরে যে সকল সাহিত্যিকের বিষয় আলোচনা করা হইল; তাঁহারা সকলেই পরলোক গমন করিয়াছেন। নিম্নে কতিপয় জীবিত লেখকের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

কোর-আন—রঙ্গপুরের প্রাচীন উকিল সাহিত্যানুরাগী মৌলবী তস্‌লিম উদ্দীন আহম্মদ বি, এল সাহেব কর্ত্তৃক কোরাণশরীফের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ। এ পর্য্যন্ত দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র উত্তরবঙ্গে দুইজন মাত্র বাঙ্গালা লেখক মুসলমান গ্রাজুয়েটের নাম জানা

যায়। মৌলবী সাহেব তাঁহাদের অন্যতর। তাঁহার লেখা ভাবপূর্ণ। অনেক সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ দৃষ্ট হয়।

মোহাম্মদীয় ধর্ম্মসোপান—রঙ্গপুরের মোক্তার মুনসী হাজিছমির উদ্দীন আহম্মদ প্রণীত। ইহা ইসলাম ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক, চারি খণ্ডে সমাপ্ত। এই গ্রন্থকারের রচিত আরও কয়েক-খানি পুস্তক আছে। ইঁহার ভাষা মন্দ নহে। ইনি একজন সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি।

তত্ত্বজ্ঞান—রঙ্গপুরের মোক্তার মুনসী আশরফ্‌উদ্দীন আহমদ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ইহাও একখানি আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিষয়ক পুস্তক।

বক্তৃতা ও মন্তব্য—চিকনমাটী-ডোমারের পণ্ডিত রেয়াজ উদ্দীন সরকার প্রণীত। ক্ষুদ্র পুস্তক, নামেই আলোচ্য বিষয়ের পরিচয় দিতেছে।

দালায়েলে কাফিফিরদ্দেলা মজ্‌হাবি—কাকিনার নিকটবর্ত্তী কোলকন্দ গ্রাম নিবাসী মৌলবী মহম্মদ আলি প্রণীত। ভাষা মুসলমানি বাঙ্গালা।

হীরকখনি—গলনা নিবাসী শ্রীমিয়াজান মণ্ডল প্রণীত ও সংগৃহীত ক্ষুদ্র কবিতা। ভাষা মুসলমানি বাঙ্গালা। অল্পশিক্ষিত মুসলমানদের নিকট পুস্তকখানির বেশ আদর দেখা যাইতেছে।

মোনাইযাত্রা—গোবিন্দগঞ্জ নিবাসী নাজির মামুদ সরকার প্রণীত। মুসলমানি বাঙ্গালায় গীতিকাব্য। এই যাত্রাগান রঙ্গপুর ও বগুড়া অঞ্চলের অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের বিশেষ প্রিয়।*

মোসাবেদা সংগ্রহ—গাইবান্ধা রেজেষ্টারি আফিসের কেরাণী মুন্‌শী আয়েন উদ্দীন আহা-মদ প্রণীত। নানাবিধ দলিলের আদর্শ পুস্তক।

তাম্বেহল মোক্‌ছেদিন,—বৌলবাড়ীর মৌলবী সৈয়দ আমানত আলী মুসলমানি বাঙ্গা-লায় নামজ্‌হাবি নামক মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই পুস্তক লিখিয়াছেন।

উল্লিখিত গ্রন্থকারদের অধিকাংশের ভাষা অশুদ্ধ, শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পাঠোপযোগী নহে। কিন্তু রঙ্গপুরের মুসলমান সাহিত্যিকগণের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র মুনসী শেখ ফজলল করিম। সুধু রঙ্গপুর কেন, উত্তরবঙ্গে তাঁহার ন্যায় সুকবি মুসলমানসমাজে ২।৩ জনের অধিক নাই। তৎপ্রণীত "পরিত্রাণ কাব্য" একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ. ইহা হজরত মোহাম্মদের (দরুদ) জীবন চরিত অবলম্বনে বিরচিত। ভাষা বিশুদ্ধ এবং মধুর, কবিত্ব সৌন্দর্য্যে ভরা। আমরা নিম্নে কতিপয় সমালোচনা উদ্ধৃত করিয়া এই সুন্দর কাব্যের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা "বঙ্গবাসী" বলেন,—"গ্রন্থকার যে কবি, গ্রন্থের স্থানে স্থানে গভীর ও বিশদ বর্ণনায় তাহার প্রমাণ। শব্দ সম্পদে এবং বাক্যমাধুর্য্যে কোথাও কোথাও কবিতা এত সুন্দর হইয়াছে যে, সহসা অন্য বাঙ্গালা কাব্যে তাহার তুলনা মিলে না। বাঙ্গালা কাব্যের আদরে "পরিত্রাণ কাব্য" সকল পাঠকের অবশ্য পাঠ্য। অনেক স্থলে ভাবের লহরী

* ইহার আদি রচয়িতার নাম তেলেঙ্গা সাহা ফকির, নিবাস রঙ্গপুর কোতোয়ালী থানার অধীন পালিচড়া গ্রাম। ইনি একজন ভক্ত কবি। স্বরচিত গানে হিন্দু মুসলমান সকলকেই তুল্যভাবে মোহিত ও ভক্তিরসাপ্লুত করিতেন। সাধারণতঃ তেলেঙ্গা গীদাল নামে পরিচিত। সম্পাদক।

উন্মুক্ত উৎসে উচ্ছ্বসিত। মধুর কঠোর—দুই চিত্র, অনেকস্থলে কবির হস্তে স্বভাব-প্রস্ফুট।"

সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত "নব্যভারত" বলেন,—"এই কাব্যে ইসলাম ধর্ম্মেতিহাসের কিয়দংশ বর্ণিত হইয়াছে। অনেকস্থলে বেশ সৌন্দর্য্যও ফুটিয়াছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্দে মুসলমান কবির শক্তি দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি।"

প্রাচীন পত্রিকা "রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ" বলেন,—ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। স্বভাব বর্ণন স্থানে স্থানে সুন্দর ও মনোরম হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাবও বেশ সুন্দর। করুণ রস পড়িলে হৃদয়ে দুঃখের তরঙ্গ ছুটিতে থাকে। রচনামাধুর্য্য কত সুন্দর, তাহা একবার গ্রন্থখানি পড়িলেই প্রতীতি হইবে। * আমাদের বিশ্বাস, উৎসাহ পাইলে এ যুবক ভবিষ্যতে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিবেন। আশা হয়, যথোচিত উৎসাহ ও সহায়তা পাইলে কালে বঙ্গের প্রিয় পুত্রগণের মধ্যে অন্যতম হইতে পারিবেন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ "বান্ধব" বলেন, গ্রন্থকার নূতন কবি হইলেও সুকবি। তাঁহার লেখার অনেক স্থলেই রসের স্ফূর্তি এবং উদ্দীপনার দীপ্তি আছে। যাঁহারা মুসলমান ধর্ম্মে অনুরাগী নহেন, তাঁহারও এই কাব্য পুস্তক পড়িয়া সুখী হইবেন। * * *

সাহিত্যিকগণের আদরের ধন "প্রবাসী" বলেন—"মুসলমান কবির এই কাব্য পড়িয়া হিন্দুরাও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন। আখ্যান বস্তুটি বেশ সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।"

এইরূপ আরও অনেক পত্রিকা এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ এই কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

শেখ ফজলল করিম সাহেব "লায়লী মজনু" মহর্ষিখাজা মইন উদ্দীন চিশতির জীবন চরিত, মানসিংহ, তৃষ্ণা প্রভৃতি আরও কয়খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গদ্য লেখাতেও তাঁহার বেশ হাত আছে। তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থের বিশদ বর্ণনা করিলে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং ইচ্ছাসত্ত্বেও নিবৃত্ত হইলাম। তিনি অল্পদিন হইল কাকিনা হইতে "বাসনা" নামে একখানি সুন্দর মাসিক পত্রিকা বাহির করিতেছেন। মফস্বল হইতে এরূপ উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা সচরাচর প্রকাশ হইতে দেখা যায় না। "বাসনা" উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিকগণের গৌরবের ধন। হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণ ইহাতে লেখনী চালনা করিয়া থাকেন।*

আমরা একজন বিদুষী মুসলমান লেখিকার বিষয় উল্লেখ করিয়া রঙ্গপুরের প্রস্তাব শেষ করিব। ইনি বঙ্গ সাহিত্য সমাজে সুপরিচিতা মিসেস্ আর, এস, হোসেন। তাঁহার প্রণীত "মতিচুর" বিশুদ্ধ ও ওজস্বিনী বাঙ্গালায় লেখা, তেমন সুন্দর বাঙ্গালা গদ্য লেখার ক্ষমতা মুসলমান পুরুষদিগের মধ্যেও অত্যল্প দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদের গৌরবের বিষয় তিনি উত্তর-

---

* সম্প্রতি এস, রেয়াজ উদ্দীন আহমদ নামক জনৈক শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সৈয়দ আমিরালী সাহেবের ইংরাজী গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন। ইহা বঙ্গসাহিত্যে একটি উপাদেয় জিনিস হইবে।

বঙ্গের দুহিতা। রঙ্গপুরের অন্তর্গত পায়রাবন্দ তাঁহার জন্মস্থান। এক্ষণ তিনি বিহার প্রদেশের জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সহধর্ম্মিণী। হিন্দী ভাষার মধ্যে স্থাপিত হইয়াও তিনি মাতৃ-ভাষা বাঙ্গালার আলোচনা করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন। আশা করি তিনি মতিচুর অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রত্ন দান করিবেন। তিনি নবনুর নামক উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত রূপে লেখনী চালনা করিতেন। যাঁহারা তাঁহার লেখা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন,—তাঁহার ভাষা কেমন সুন্দর, কেমন প্রাঞ্জল, কেমন মধুর, বর্ণে বর্ণে সজীবতা ও মাধুর্য্য ক্রীড়া করে। নিম্নে তাঁহার লেখার একটু নমুনা উদ্ধৃত হইল।

"সংবৎসরের পর আবার ঈদ আসিল। আজ আনন্দের দিন, উৎসবের দিন, সমুদয় মোসলেম সমাজের সম্মিলনের দিন।

সারা বৎসরের অবসাদের পর আজি উৎসাহের দিন আসিয়াছে। যেন বসন্ত সমাগমে মানবের গৃহরূপ কাননে অসংখ্য প্রীতিকুসুম ফুটিয়াছে। বালক বালিকার দল ত মনে করে, ঈদ না জানি কি! আর তাহাদের অভিভাবকেরাও কি আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহাদের আনন্দ কোলাহলে যোগদান করেন না? আজিকার এ আনন্দ প্রবাহে ধনীর অট্টালিকা ও দরিদ্রের দীনতম কুটীর একই ভাবে প্লাবিত।"

নবনূর, পৌষ ১৩১২ সাল।

বগুড়া।

উত্তরবঙ্গের মধ্যে বগুড়ার মুসলমানগণ শিক্ষাবিষয়ে উন্নত। শুধু উত্তরবঙ্গ কেন, সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে বগুড়ার মুসলমানেরা অধিক পরিমাণে শিক্ষিত। কিন্তু সেই হিসাবে এই জেলার মুসলমান সাহিত্যসেবীর সংখ্যা অধিক নহে। তাহার কারণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী উচ্চ শিক্ষিত মহোদয়গণ বাঙ্গালা-সাহিত্যের বড় সেবা করেন না। সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের মধ্যে বাঙ্গালা এবং অল্প ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যাই অধিক; তাহা নিতান্ত অল্প নহে। তবে সুলেখক এবং সুকবির অভাব বটে। আমরা নিম্নে যাঁহাদের নামোল্লেখ করিতেছি,—তাঁহাদের কেহই পাবনার সিরাজী, রাজসাহীর মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ্ আলী অথবা রঙ্গপুরের মুন্সী শেখ ফজলল করিমের ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে বলা যায় না। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি,—তাহাতে বোধ হয়—আয়তন ও লোক সংখ্যায় তুলনায় এই জেলায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী মুসলমান অধিক আছেন। নিম্নে কতিপয় লেখকের বিষয় আলোচিত হইল।

বাঙ্গালা ১২১১ সালে সারিয়াকান্দী থানার অন্তর্গত ধর্ম্মকুল নিবাসী কুতুব উদ্দীন খাঁ "হানিফার জঙ্গ" নামে মুসলমানি বাঙ্গালায় একখানি পুথি রচনা করিয়াছিলেন। ইহাই

বগুড়া জেলার মুসলমানের রচিত প্রাচীনতম পুস্তক। পুথিখানি মুদ্রাযন্ত্রের দর্শন পায় নাই। একখানি হস্তলিপি গ্রন্থকারের বংশধরগণের নিকট বিদ্যমান আছে। বগুড়ার সাহিত্যানুরাগী মোক্তার মোহম্মদ ইব্রাহিম সাহেব একখণ্ড নকল করিয়াছিলেন, তাহাও বিনষ্ট হইয়াছে। একশত বৎসরের পূর্ব্বে ইহা বিরচিত হইয়াছিল।

মজমায় ন'ছিহত বা সদুপন্যাস,—জয়ভোগা নিবাসী হানিফ উদ্দীন মোহাম্মদ প্রণীত। ১২৯৫ সালে মুদ্রিত, ডিমাই ৮ পেজি ১৬৬ পৃষ্ঠা। ইহাই এই জেলার মুসলমানের লিখিত বর্ত্তমান সময়ের প্রথম পুস্তক। ভাষা মুসলমানি বাঙ্গালা পদ্য হইলেও মুসলমানি শব্দ অত্যল্প এবং সাধু বাঙ্গালার ছাঁচে গড়া, স্থানে স্থানে কবিত্ব শক্তিরও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাগুলি নানা বিষয়ক। এই গ্রন্থকারের লিখিত "সারকথা" বা "তত্ত্বকথা" নামে আর একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আছে তাহার ভাষা সাধু বাঙ্গালার ন্যায়। মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি মাত্র মুসলমানি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আজকাল কোন কোন মুসলমান সাহিত্যিক এইরূপ ভাষা প্রচলনের, পক্ষপাতী। নমুনা স্বরূপ এই পুস্তকের কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"আহা! করুণাময় খোদাতালা কতই শিল্পচাতুর্য্য জানেন। তাঁহার কি অদ্ভুত কারিগরি। আমাকে কেমন সুন্দর সুশ্রী করিয়া পয়দা (সৃষ্টি) করিয়াছেন। আহা হা! পরম কারুণিক খোদা তালার এমনি কীর্ত্তি, আমি তামাম পৃথিবী খুঁজিলেও আমার মত আকৃতি বিশিষ্ট একজন লোককেও দেখিতে পাই না, একি ছোট কারিগরি।

প্রমত্ত প্রেমিক হাফেজের উক্তি,—প্রসিদ্ধ পারস্য কবি মহাত্মা হাফেজের কতিপয় কবিতার বঙ্গানুবাদ পরলোকগত মোক্তার মুনশী মশিওতুল্লা কর্ত্তৃক অনূদিত। ভাষা বিশুদ্ধ পদ্য।

"আদর্শ পতিভক্তি কাব্য"—সারিয়াকান্দীর অন্তর্গত চন্দনবাইসার ডাক্তার এলাম উদ্দীন আহম্মদ প্রণীত। ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক, নামেই বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ভাষা বিশুদ্ধ এবং কবিতাও বেশ সুন্দর হইয়াছে। লেখক অভ্যাস রাখিলে ভবিষ্যতে একজন ভাল কবি হইতে পারিবেন। আরবের সামন্ত নৃপতি আবু তালাহা যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করিলে গৃহে তদীয় পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু বীর পত্নী মিছা সেই হৃদয়-প্রসূনের শব পালঙ্ক শায়িত রাখিয়া যেরূপ ভাবে সহাস্য বদনে বিজয়ী স্বামীর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহা আদর্শ পতিভক্তি-পরায়ণা বীরাঙ্গনারই উপযুক্ত। আমরা এই ক্ষুদ্র কাব্যের একটু নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম;—

"বীরের ঘরণী আমি, বীর প্রসবিনী,
না না আর কাঁদিব না বৃথা এ রোদন।
ছিঁড়েছে হৃদয় বৃন্ত যে কাল অমনি,
কে আছে জগতে হেন করিতে বারণ।

ধরিব বিনোদ বেশ, বিনাইব কেশ,
আতর গোলাপ অঙ্গে করিব লেপন,
বাঁধিব পাষাণে হিয়া যাব পতি পাশ,
দেখিব কেমনে রোধে স্নেহের বন্ধন।”

১। ভারতের সিট ইতিহাস ২। সমগ্র ভারতের পকেট ইতিহাস ৩। শিক্ষা ও পরীক্ষা কৌমুদী, সাবরুল মডেলস্কুলের হেডপণ্ডিত মুনসী আমীর উদ্দীন আহম্মদ প্রণীত ইহার ভাষা বিশুদ্ধ এবং লিখিবার শক্তি বেশ। সাময়িক পত্রিকায় ইনি সময় সময় লিখিয়া থাকেন।

পদ্য হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা—গঙ্গানগর নিবাসী ডাক্তার আব্দুর রহমান প্রণীত নীরস চিকিৎসা গ্রন্থ প্রায় কেহ পদ্যে লিখেন না, গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয়। রচনা প্রণালী মন্দ নহে। বগুড়ার ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্টেট কালেক্টর কুমার শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জ বিহারী গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত প্যারী শঙ্কর দাস গুপ্ত প্রমুখ মহোদয়গণ এই গ্রন্থের প্রশংসা করিয়াছেন। এই গ্রন্থকারের ‘পাষণ্ডদলন’ নামে আর একখানি পুস্তক আছে। ইহা কুৎসা পূর্ণ; এরূপ পুস্তকের প্রচার না হওয়াই ভাল।

১। নবশিশুশিক্ষা প্রথমভাগ। ২। নব ধারাপাত। ৩। পরীক্ষা কৌমুদী—বগুড়ার আসিষ্টাণ্ট স্কুল সব ইন্‌স্পেক্টর মুন্‌শী মালেক উদ্দীন আহম্মদ প্রণীত। ভাষা বিশুদ্ধ; ইঁহার বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দর অধিকার আছে। ইঁহার লিখিবার ক্ষমতা যেরূপ তাহাতে আশা করা যায়,—চেষ্টা করিলে ইনি ভাল বই লিখিতে পারেন।

প্রাচীন প্রবাদ,—দুপচাঁচিয়া মডেল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক মুন্‌শী মানিকউদ্দীন আহম্মদ প্রণীত। ক্ষুদ্র পুস্তক, ভাষা মন্দ নহে।

বন্ধুবিলাপ—জামালগঞ্জ মাইনর স্কুলের হেডপণ্ডিত মির্জাওমরআলী বিরচিত কবিতা পুস্তক; ভাষা বিশুদ্ধ এবং প্রাঞ্জল; লেখকের কবিতাশক্তি বেশ।

শোকার্ণব,—চকলোকমান নিবাসী মুন্‌শী মোহাম্মদ রহিম বক্‌স প্রণীত; ১৬ পেজি ফর্ম্মার ৭২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহাতে চারিটি পদ্য এবং একটি গদ্য প্রবন্ধ আছে। লেখকের বাক্যাড়ম্বর যেমন ভাষা তেমন সুন্দর নহে। তিনি ‘ইসলাম বিকাশ’, রোমিওজুলিয়েট, প্রেম প্রকাশ, মিলন ও বিচ্ছেদ প্রভৃতি আরও কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন বগুড়ার মুসলমানগণের মধ্যে এত পুস্তক অন্য কেহ লেখেন নাই।

পদ্য-রত্নাকর—সারিয়াকান্দী নিবাসী আকবর হোসেন সরকার বিরচিত ক্ষুদ্র কবিতা, লেখক একজন স্বভাব-কবি, তাঁহার ভাষা বিশুদ্ধ, কবিত্বশক্তি প্রশংসনীয়। তিনি এক্ষণে পরলোকগত।

১। হিন্দু মুসলমান। ২। এহিয়া চরিত। ৩। ছান্দাত, কেশবেরপাড়া নিবাসী মুনশী ফকীরউদ্দীন সরকার প্রণীত। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ ; রচনাপ্রণালী সুন্দর এবং মনোরম, ভাব মার্জ্জিত। ইনি অনেক সাময়িক পত্রিকার নিয়মিত লেখক। এই প্রবন্ধে আমরা বগুড়ার যে সকল সাহিত্যিকের আলোচনা করিলাম, তন্মধ্যে ইহার গদ্য লেখা উৎকৃষ্ট।

পরিমল—মালগ্রাম নিবাসী মোহাম্মদ ইসমাইল প্রণীত। ক্ষুদ্র কবিতা ; ভাষা ও ভাব মধুর ; লেখকের কবিত্বশক্তি বেশ। তাঁহার পরিমলের সুগন্ধ আছে। লেখক এফ,এ, পড়িবার কালে এই কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ যৌবনের প্রারম্ভেই কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছেন। বাঁচিয়া থাকিলে ইনি ভাল কবি হইতে পারিতেন।

আদর্শলিখন—আটাপাড়া নিবাসী মুন্‌শী বাদউদ্দীন সরকার প্রণীত ; পাঠশালার বালকগণের উপযোগী পত্রাদি লিখন প্রণালী শিক্ষা। পুস্তকখানির ৬ষ্ঠ সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

শোকোচ্ছ্বাস ও বিলাপ তরঙ্গিণী—বার্ব্বকপুরের মুন্‌শী চাঁদমোহাম্মদ সরকার প্রণীত। লেখক একজন স্বভাব কবি ; তাঁহার কবিত্ব শক্তি অতি সুন্দর, ভাষা জ্ঞানও মন্দ নহে। চেষ্টা করিলে ইনি একজন ভাল কবি হইতে পারিবেন। ইনি আরও একখানি সুন্দর কবিতা পুস্তক লিখিয়াছেন ; কিন্তু অর্থাভাবে মুদ্রিত করিতে পারিতেছেন না।

সমাজচিত্র—পদ্য পুস্তক, ভাষা সাধু বাঙ্গালা—প্রণেতা মুনশী হেকমত আলি খাঁ। ইহার কবিতা মন্দ নহে।

খৃষ্টানি ধোকাভঞ্জন—বগুড়া নিবাসী মুন্‌শী আবদুল গনি আলি প্রণীত নামের দ্বারাই আলোচ্য বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা ভাল, লেখকের ভাষাজ্ঞান আছে।

নিম্নে মুসলমানি বাঙ্গালায় লিখিত কতিপয় পুস্তক এবং প্রণেতার নামোল্লেখ করা গেল।

	পুস্তক		প্রণেতা	বাসস্থান
১।	ছেকেন্দর ছানি	প্রণেতা	আনার উদ্দীন খোন্দকার	বাসস্থান বনভেটী, বগুড়া।
২।	"ষোখোদেপাষোগেরেগা"		ফতে মণ্ডল	,, যামিনীপাড়া, শিবগঞ্জ
৩।	বাহারে আফছোছ		নিয়ামত আলি খাঁ	,, বানিয়াদীঘি, দুপচাঁচিয়া
৪।	মাফিদোল এছলাম		হানিফউদ্দীন মিঞা	,, মালতীনগর, বগুড়া
৫।	রসুল বেদাতল	,,	কেরামত আলী	,, রামচন্দ্রপুর, শিবগঞ্জ
৬।	নছিহাতলএসলাম	,,	কেরামত আলী	,, রামচন্দ্রপুর, শিবগঞ্জ
৭।	ধোকাভঞ্জন	,,	মৌলবী রইস উদ্দীন আহম্মদ	সারিয়াকান্দী, বগুড়া
৮।	কোছানায়ে সোরে কেয়ামত	,,	মোহাম্মদ এব্রাহিম	শিকারপুর, বগুড়া,
৯।	ইসলামের চারুশিক্ষা	,,	ফকীর মোহাম্মদ	মাটীডালি, বগুড়া
১০।	নছিহত নামা	,,	আব্বাছ আলী মিঞা	চকনতিন, দুপচাঁচিয়া
১১।	দেল মনছুব	,,	মলজা সরকার	হসনাবাদ, সেরপুর

সারিয়াকান্দী নিবাসী মুনশী আকের উদ্দীন সরকার 'ইমামবধ কাব্য' নামে একটি সুন্দর কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা এবং কবিত্ব মধুর। কিন্তু পরিতাপের বিষয়,—গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই এই নবীন কবি পরলোক গমন করিয়াছেন।

রাজসাহী।

আমরা রাজসাহী জেলার কোন প্রাচীন মুসলমান লেখকের অনুসন্ধান পাই নাই। সকলেই আধুনিক সময়ের; তাঁহাদিগের মধ্যে মৌলবী মির্জা ইউসুফ আলী সাহেবের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। ইঁহার বাসস্থান বাঘমারা থানার অন্তর্গত আলিয়াবাদ। ইনি প্রসিদ্ধ মুসলমান দার্শনিক পণ্ডিত ইমাম গজ্জালী প্রণীত পারস্য গ্রন্থ কিমিয়া সায়াদতের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদিত গ্রন্থের নাম—"সৌভাগ্যস্পর্শমণি" ইহা চারিখণ্ডে সমাপ্ত। ভাষা বিশুদ্ধ এবং প্রাঞ্জল। মির্জা সাহেবের বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দর অধিকার আছে। তিনি এক জন চিন্তাশীল লেখক বলিয়া পরিচিত। 'সৌভাগ্যস্পর্শমণি' বাঙ্গালা ভাষায় এক উপাদেয় গ্রন্থ। ইহা ছাড়া তিনি 'দুগ্ধসরোবর' এবং 'খোসখবর' নামক আরও দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

নওগাঁ থানার অধীন শিকারপুর নিবাসী মৌলবী দেওয়ান নছির উদ্দীন আহমদ সাহেব রাজসাহীর অন্যতম সাহিত্য সেবক। তিনি "সমাজ সংস্কার" "পতিভক্তি" "হাসির তরঙ্গ" "পুষ্পহার" "বিদায় বা বিষাদ তরঙ্গ" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার ভাষা বিশুদ্ধ এবং মনোরম।

"মাতঃ ভিক্টোরিয়া" পদ্য গ্রন্থ। নাটোরের মোক্তার মুন্‌শী মোহাম্মদ আলী প্রণীত। ভাষা ও ভাব বেশ মধুর।

(১) বাহারুস্তানে রৌকি বা স্বর্গসোপান।

(২) নাছিহতে রঙ্গরস বা কেচ্ছায়ে জানবক্স।

নহাটা থানার অন্তর্গত তেবাড়িয়া নিবাসী মৌলবী আব্দুল রউফ প্রণীত। পদ্য, ভাষা মুসলমানি বাঙ্গালা। কবির ছন্দ মিলাইবার শক্তি বেশ।

"আখলাক্ উন্‌নেসা"—বাঘমারার অন্তর্গত তাহেরপুর নিবাসী মুন্‌শী দেওয়ান মোহাম্মদ কেরামতুল্লা খোন্দকার প্রণীত। মুসলমানি বাঙ্গালায় পতিভক্তিমূলক পুথি।

মোস্‌লেমের পুত্র সহিদ গীতাভিনয়—মহাদেবপুরের অধীন জোয়ানপুর নিবাসী মুন্‌শী মোহাম্মদ করিমবক্স সরদার প্রণীত। লেখকের উৎসাহ যথেষ্ট আছে।

নাটোর ট্রেনিং স্কুলের পণ্ডিত মোহাম্মদ আয়েজউদ্দীন বালকদিগের প্রথম শিক্ষার জন্য এক খানি "বর্ণ পরিচয়" লিখিয়াছেন।

স্বভাবকবি, নওগাঁ থানার অন্তর্গত বান্দাইখাড়া নিবাসী মুনশী মেহের উদ্দীন সর্দার

জাতীয় উন্নতিমূলক অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাহাতে স্বাভাবিক কবিত্ব বেশ আছে।

মৎস্য ব্যবসায়ী মিলন ধাওয়া রাজসাহীর একজন প্রসিদ্ধ স্বভাবকবি। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তি বেশ ছিল এবং দ্রুত সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার গানগুলি পারমার্থিক তত্ত্বে পূর্ণ। তিনি এক্ষণে পরলোকে। *

রাজসাহীর যে সকল মুসলমান সাহিত্যানুরাগী মহোদয় কোন পুস্তক রচনা করেন নাই, অথচ মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন; তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য,

মুনশী মোহাম্মদ আলমুদ্দিন ঘোষপাড়া, নাটোর
" " বসিরুদ্দীন, ঐ ঐ
" " আনওয়ার আলী, হেডপণ্ডিত বালুভরা মাইনর স্কুল, নওগাঁ।
" " তাহের উদ্দীন, আতাইকুলা।
" " আফজাল উদ্দীন, রাণীনগর।
" " আনিছব্য রহমান, ভবানীপুর।
" " হামিদর রহমান, ঐ

পাবনা।

পাবনা জেলার মুসলমান সাহিত্যিকগণের বিবরণ আমরা ভালরূপে সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য গগনে যিনি উজ্জ্বল নক্ষত্র, তিনি এই জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের অধিবাসী। সৈয়দ ইস্মাইল হোসেন সিরাজীর নাম সাহিত্যসেবিগণের অপরিচিত নহে। তিনি একজন সুকবি, সুলেখক এবং সুবক্তা। এই তিন গুণের একত্র সমাবেশ প্রায় সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না; কিন্তু সিরাজী সাহেব তিন বিষয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ জাতীয় কবিতা বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য রত্ন। সেরূপ কবিতা লিখিবার ক্ষমতা হিন্দুকবিদিগের মধ্যেও অধিক দেখা যায় না। অনেক প্রসিদ্ধ সমালোচক ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি নব উদ্দীপনা, অনলপ্রবাহ, উদ্বোধন ও উচ্ছ্বাস এই চারিখানি কবিতা এবং স্ত্রীশিক্ষা ও মহানগরী কর্ডোভা নামে দুই খানি গদ্য পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গদ্যের ভাষাও বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল এবং সতেজ কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তি অসাধারণ। আধুনিক সময়ে তেমন উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা অন্যের

* এতদ্ব্যতীত রাজসাহী নাটোরের অধিবাসী মমিন উদ্দীন আহাম্মদ ১২৯৫ সালে বড় দরগার "পির সাহা এছমাইল" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা ও বটতলার সাহায্যে প্রকাশ করেন। উহার ভিত্তি ইতিহাসের উপরে স্থাপিত না করিয়া তিনি বহু কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

সভার সম্পাদক।

লেখনী হইতে নিঃসৃত হইতে প্রায় দেখা যায় না। সিরাজী সাহেবের এইরূপ প্রশংসাকে কেহ কেহ অতিরঞ্জিত মনে করিতে পারেন; কিন্তু দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রিকা এবং সাহিত্যরথিগণ মুক্তকণ্ঠে তাঁহার যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা এস্থলে আমরা অতিরিক্ত কিছু বলিলাম না। হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যসেবিগণের নিকট তাঁহার লেখা অপরিচিত নহে, সুতরাং নমুনা উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। সমালোচনা উদ্ধৃত করিলেও প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবে সুতরাং বিরত রহিলাম।

এছলাহল কস্তম—সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত ধানঘরা নিবাসী মুন্‌শী সাহাবুদ্দীন খাঁ প্রণীত। ভাষা মুসলমানী বাঙ্গলা।

১। বিলাতীবর্জ্জন রহস্য। ২। সাহিত্যপ্রসঙ্গ—সলঙ্গা মাইনর স্কুলের হেডপণ্ডিত মুন্‌শী নজিবর রহমান প্রণীত। ভাষা সাধু বাঙ্গলা। বাঙ্গলা ভাষার প্রতি ইঁহার বেশ অনুরাগ আছে, ইনি আরও পুস্তক লিখিতেছেন।

দিনাজপুর।

উত্তরবঙ্গে সাহিত্যের প্রথম বিকাশ যে স্থানে হইয়াছিল তাহা এক্ষণে দিনাজপুরের অন্তর্গত। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, 'হেতুজ্ঞান' নামক মুসলমানী বাঙ্গলা পদ্য পুস্তক উত্তরবঙ্গের মুসলমানের লিখিত প্রাচীন তত্ত্বগ্রন্থ। ইহার লেখক কাজী হেয়াত মামুদ, ঘোড়াঘাটের নিকট বাগদার পরগণার অন্তর্গত ঝাড়বিশিলা গ্রামের অধিবাসী। * গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"বৃদ্ধ যোগে ভাবি অতি,   বিরচিনু এই পুথি,
সন এগার শ আট সালে।"

সুতরাং বোধ হয় বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য-কুঞ্জের প্রথম কোকিল মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় অপেক্ষা তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। 'হেতুজ্ঞান' মুসলমানি আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পূর্ণ; ভাষা অশুদ্ধ হইলেও স্থানে স্থানে বেশ সুন্দর। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এক জন অল্প বাঙ্গালা শিক্ষিত মুসলমান যাহা করিয়াছেন, তাহা অগৌরবের জিনিস নহে। পুস্তকখানি অনেক দিন হইল বটতলার কৃপায় মুদ্রিত হইয়াছে। আকার ডিমাই ৮ পেজি ৫২ পৃষ্ঠা। †

বর্ত্তমান সময়ে দিনাজপুরের মুসলমান সাহিত্যসেবীর সংখ্যা অতি বিরল। একমাত্র মৌলবী একিন উদ্দীন আহমদ বি, এল্ সাহেব উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক; তিনি 'ইসলামধর্ম্ম-

* এই গ্রাম রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত। আজও কাজী সাহেবের সমাধি নিতান্ত অযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন, সমস্তগুলি প্রকাশিত হয় নাই। আম্বিয়াবাণী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সারগর্ভ। এই সভা তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছেন।

সভার সম্পাদক।

† এই ভক্ত কবির বিরচিত আরও কয়েকখানি পুথি আছে; তন্মধ্যে আম্বিয়াবাণী ও ইমামসাগর উৎকৃষ্ট। তাঁহার সকল লেখাই উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব পূর্ণ।

নীতি' নাম দিয়া মিঃ কুইনিয়রের Faith of Islam এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন ইনি নবনুর, ইসলাম, দিনাজপুর পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। তাঁহার ভাষা বিশুদ্ধ এবং সুন্দর। দিনাজপুরের অপর একজন শিক্ষিত ব্যক্তি মৌলবী তইমুর মোহাম্মদ একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থখানির বিষয় ভালরূপ অবগত হইতে পারি নাই।

মালদহ, কুচবেহার এবং জলপাইগুড়ি।

এই তিন জেলার মুসলমানদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার ভালরূপ আলোচনা নাই। সাহিত্যসেবীর সংখ্যা নিতান্ত কম। মালদহে মুনশী আবেদ আলীখাঁ, মৌলুদ শরিফ, হজরত চরিত, নমাজ দর্পণ, মহরম পর্ব্ব, চাহার দরবেশ, বাঙ্গালা শিক্ষা প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। কোন কোনটির ভাষা মুসলমানি শব্দ মিশ্রিত, কোন কোনটির ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। উভয় প্রকারেই তাঁহার লিখিবার ক্ষমতা আছে। এই জেলার অপর কোন সাহিত্যিকের বিষয় আমরা অবগত হইতে পারি নাই।

কুচবেহার কলেজের আরবি ও পারসি অধ্যাপক মৌলবী মোহম্মদ আব্দুল হালিম সাহেব একজন বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি। তিনি বাসনা, নবনুর, সোলতান প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় লিখিয়া থাকেন। তাঁহার ভাষাজ্ঞান মন্দ নহে। তিনি নোয়াখালি জেলার অধিবাসী কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ উত্তরবঙ্গের অবস্থিতি করিতেছেন। সুতরাং আমরা তাঁহাকে উত্তরবঙ্গের মুসলমান সাহিত্যিকের মধ্যেই ধরিয়া লইলাম। এই জেলার স্থানীয় অধিবাসীর মধ্যে বড়মরিচা নিবাসী মুনশী আমানত উল্লা চৌধুরী একজন সাহিত্যসেবী তিনি সাময়িক পত্রিকায় লিখিয়া থাকেন। তাঁহার ভাষাজ্ঞান এবং ঐতিহাসিক গবেষণা বেশ আছে। তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মুসলমানি বাঙ্গালায় পুস্তক লিখিয়াছেন।

১। হুসিয়ারেল মোমেনিন ২। ছহি মেছ বাহল গবকেলিন—জোড়াপাড়া নিবাসী মোহম্মদ কাফুর শাহ ফকীর চেস্তান ওরফে কাউয়া শাহ প্রণীত। ধর্ম্ম বিষয়ক পুঁথি, রচনায় কোন পারিপাট্য নাই, সাধাসিধা। ১২৮৭ সালে মুদ্রিত, ১০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

"বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলী"—চাংড়াবান্ধা নিবাসী সফাতুল্লা সরকার প্রণীত। কবিতা পুস্তক বেশ মজার গল্প। লেখা কতকটা পুরাতন ধরণের। গ্রন্থ খানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে।

"ধর্ম্মশিক্ষা বা মানব জীবন সফল" প্রণেতা মৌলবী মীরমোহাম্মদ আলীশাহ খোন্দকার বাসস্থান ডাকানীগঞ্জ পোঃ মাথাভাঙ্গা, ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ পূর্ণ। লেখায় বিশেষত্ব নাই।

জলপাইগুড়ির মুসলমানগণের মধ্যে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির বিষয় জানা যায় না। সাধারণতঃ এই জেলায় মুসলমানেরা অশিক্ষিত, যে দুই একজন শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, দুঃখের বিষয় তাঁহারাও বাঙ্গালা ভাষায় আলোচনা করেন না। আমরা এই জেলার মুসলমানের

খিত "আদর্শ লিপি" নামক একখানি মাত্র পুস্তকের বিষয় সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। ইহা গড়বাগ্রামনিবাসী আবদুল জাহান্দার রসুল দ্বারা সংগৃহীত। তিনি এক্ষণে পরলোকে।

যথাসাধ্য উত্তরবঙ্গের মুসলমান সাহিত্যের বিবরণ সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু মাদৃশ অনুপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি গুরুভার অর্পিত হইলে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার আশা কোথায়? বোধ হয় অনেক লেখকের নাম বাদ পড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া অনেক গ্রন্থ সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। সমালোচকের পদ গ্রহণ করিবার স্পর্দ্ধা করি না। কারণ তদুপযুক্ত বিদ্যাবুদ্ধি আমার আদৌ নাই। সুতরাং নাজানি এই আনাড়ির হাতে পড়িয়া কত লেখকের অন্যায় সমালোচনা হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মনোকষ্ট দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। বলা বাহুল্য—তাঁহারা আছেন বলিয়াই আজ পতিত আমরা বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজের এক পার্শ্বে দাড়াইবার স্থান পাইয়াছি। আমার অনুপযুক্ততা বশতঃ কাহারও অন্যায় সমালোচনা হইয়া থাকিলে, তাঁহার নিকট বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীহামেদ আলী।

বাঙ্গালা ভাষার সমৃদ্ধি।

সংস্কৃতভাষার তুলনায় বাঙ্গলা ভাষা অতি দীনা, কিন্তু তথাপি তাহার সমৃদ্ধি একবারে নাই এ কথা বলিতে পারা যায় না। অনেকে মনে করেন যে চেষ্টা করিলে সকল ভাষাই সমৃদ্ধ হইতে পারে; যেমন দরিদ্র ব্যক্তি যত্ন ও চেষ্টা করিয়া দেশ বিদেশ হইতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া প্রভূত ধনশালী হইতে পারে; যেমন কোন জাতি দেশ বিদেশে বাণিজ্য করিয়া অসীম ধনলাভ করিতে পারে, সেই প্রকার ভাষাও অন্য বিবিধ ভাষা হইতে ধনরত্ন গ্রহণ করিয়া সমৃদ্ধিশালিনী হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে ইংরেজি ভাষার কথা অনেকে উপস্থিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন ইংরেজি ভাষা দিন দিন নানা ভাষা হইতে বিবিধ বস্তু সংগ্রহ করিয়া জগতের শ্রেষ্ঠতম ভাষা হইতে চলিয়াছে বা হইয়া পড়িয়াছে।

ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে আমারা বুঝিতে পারি যে, ব্যক্তিগত জীবনে যে প্রকার সামর্থ্য, ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুসারে পরের ধন রত্ন গ্রহণ সম্ভবপর, ভাষার পক্ষে তাহা নহে। কোন ব্যক্তি অপর দেশ হইতে যে বস্তু আনয়ন করেন তাহা আবশ্যক মত নিজের প্রয়োজনে তদ্রূপে বা রূপান্তরিত করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন; কিন্তু ভাষা অপর ভাষার সকল বস্তু এই ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না। নিজের অবয়বের গঠনানুসারে যে কোন বস্তু রূপান্তরিত করিয়াও তাঁহার গ্রহণ করিবার সামর্থ্য নাই।

ইংরেজি ভাষা অন্য ভাষা হইতে কতকগুলি শব্দ লইয়াছে ও এখনও লইতেছে। সংস্কৃত ভাষার শব্দও ইংরেজি ভাষা গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু ভাষার সমৃদ্ধি কেবল শব্দ বাহুল্যের উপর নির্ভর করে না। অপর ভাষা হইতে সকল ভাষাই শব্দ স্বরূপে বা রূপান্তরিত করিয়া গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু কেবল তাহাতে ভাষার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয় না।

কোন ব্যক্তি অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বীয় বেশ ভূষার পারিপাট্য বিধান করিতে পারে, উৎকৃষ্ট আহার্য্য বস্তু ভক্ষণ করিয়া কথঞ্চিৎ হৃষ্টপুষ্টও হইতে পারে, কিন্তু অবয়বের হীনতার প্রতীকার করিতে পারে না। অন্ধ অমূল্য পরিচ্ছদে পরিশোভিত হইলেও অন্ধ, খঞ্জ মহার্হ মণি-মণ্ডিত হইলেও খঞ্জ, কুব্জ কুবের ভবনের সমস্ত রত্ন ধারণ করিলেও কুব্জ বামন অশেষ-বিধ বেশবিন্যাস করিলেও বামন—ইহারা কেহই চক্ষুষ্মান্ পদবান্ ঋজু কায় ও দীর্ঘ হয় না। ভাষারও এই প্রকার অবয়বগত হীনতার প্রতীকার হয় না।

সমৃদ্ধি অবয়বগত ও পরিচ্ছদগত। অবয়বের সমৃদ্ধিই শ্রেষ্ঠ। যাহার অবয়বের সমৃদ্ধি আছে তাহার যে কোন পরিচ্ছদ সমধিক সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক। "কি মিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অধীন্দ্রিয় মন ইহা দ্বারা মনুষ্যের স্থূলদেহ গঠিত।

পঞ্চভূতের প্রত্যক্ষের অন্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয় এই প্রত্যক্ষ কার্য্যে যে পরিমাণে পারগ তাহা সেই পরিমাণে পুষ্ট, যে ইন্দ্রিয় যত পুষ্ট সে ইন্দ্রিয় তত সুন্দর। ভাষার যদি আমরা একটি দেহের কল্পনা করি তবে যে ভাষার ইন্দ্রিয় গুলি যত পুষ্ট, সে ভাষাও সেই পরিমাণে পুষ্ট, ইহাই বলিতে হয়। এক্ষণে দেখা যাউক ভাষার ইন্দ্রিয় কি।

মনুষ্য দেহের প্রয়োজন উপভোগ সুতরাং তাহার অবয়বগুলি উপভোগের সাধন। ভাষার প্রয়োজন ভাবের অভিব্যক্তি সুতরাং তাহার অবয়বগুলি ভাবের অভিব্যক্তির কারণ। এক্ষণে যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যত সুন্দররূপে বিষয়ের উপভোগ হয় সে ইন্দ্রিয় তত সুন্দর; সেই প্রকার, ভাষার যে অবয়ব দ্বারা ভাবের অভিব্যক্তি যত ভাল হয়, সে অবয়ব তত পুষ্ট। যে ভাষার অবয়ব যত পুষ্ট, সে ভাষা তত সুন্দর। মনুষ্যের অবয়ব চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, পাণি পাদ ইত্যাদি। ভাষার অবয়ব শব্দ, পদ, বাক্য। যে ভাষার শব্দ পদ বাক্য যত ভাবব্যঞ্জক সে ভাষা তত পুষ্ট, তত সমৃদ্ধ। শব্দ সম্বন্ধে বঙ্গভাষা বিশেষ সমৃদ্ধ, কারণ সংস্কৃত ভাষার শব্দব্যূহ বঙ্গভাষার দেহের প্রধান উপকরণ। সংস্কৃত ভাষার শব্দগুলি যেমন ভাবব্যঞ্জক আমরা যতদূর জানি তাহাতে অন্য ভাষার শব্দ তেমন ভাবব্যঞ্জক নহে।

সংস্কৃতে একার্থবাচক বহু শব্দ আছে, অনেকে ইহা ভাষার দোষ মনে করেন—অনর্থক ভাষার কলেবর বৃদ্ধি। কিন্তু যদি সূক্ষ্মভাবে দর্শন করা যায় তবে বুঝা যাইবে যে, এক অর্থ বুঝাইতে যে বহু শব্দের প্রয়োগ হয় তাহারা এক বস্তুকে বুঝাইলেও সে বস্তুকে ভিন্ন গুণ বা আকারসম্পন্ন করিয়া শ্রোতার নিকট উপস্থিত করে।

উদাহরণ দ্বারা কথাটি স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করা যাউক। 'বৃক্ষ' বুঝাইতে মহীরুহ, পাদপ, তরু, বিটপী, শাখী, ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হয়। মহীরুহ শব্দ দ্বারা আমরা বুঝি যে, এই শব্দের প্রতিপাদ্য বস্তু ভূমিতে প্ররূঢ় হয়, ইহা শূন্যে বা জলে থাকে না, পাদপ শব্দ দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হয় যে, উহা পাদ দ্বারা পান করে, অর্থাৎ রস আকর্ষণ করে। তরু শব্দে প্রতিপাদিত হয় যে, উহা জলে ভাসে, ইহা দ্বারা উহার আপেক্ষিক গুরুত্বের উপলব্ধি হয়। বিটপী প্রকাশ করে যে, উহার পত্র আছে. শাখী বলে তাহার শাখা আছে। এক একটি অংশের বাচক শব্দগুলি একত্র করিলে বৃক্ষটিকে সুন্দররূপে জানা যায়। ইহা ভাষার সমৃদ্ধি ব্যতীত বিড়ম্বনার বিষয় নহে।

পুরাণ ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের নামগুলির অর্থ স্মরণ করিলে তত্তৎ ব্যক্তির জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি বিবৃত হইয়া পড়ে। এই প্রকার সমৃদ্ধি অন্য ভাষায় দেখা যায় না। নদ, নদী, পর্ব্বতগুলির সকল নাম যুগপৎ গ্রহণ করিলে তাহাদের অনেক বিবরণ সংগৃহীত হইয়া পড়ে। সংস্কৃত ভাষার শব্দ সমষ্টির সহিত অন্য ভাষা হইতে গৃহীত শব্দ মিশ্রিত হইয়া বঙ্গভাষার শব্দরাশিকে বস্তুতঃ অপার শব্দাম্বুধিতে পরিণত করিয়াছে। শব্দ সম্বন্ধে বঙ্গভাষার নিজস্ব কি তাহার আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। শব্দ সম্বন্ধে বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি যথেষ্ট। এক্ষণে পদের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

শব্দ বিভক্তিযুক্ত হইলে পদ হয়। বিভক্তি যোগে পদ প্রস্তুত হওয়ার সময় শব্দের কিছু রূপান্তর হয়। বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃতের সমুদয় বিভক্তি না থাকিলেও বিভক্তির অর্থ প্রতি-পাদনের কৌশল দ্বারা সে অভাব সম্যক্ বিদূরিত হইয়াছে।

'দুই' শব্দ প্রয়োগে দ্বিবচনের অভাবের ক্লেশ উপস্থিত হয় না। কিন্তু ইহা যে সমৃদ্ধির ন্যূনতা তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন সংস্কৃত ভাষার দ্বিবচনটী অনর্থক; দ্বিশব্দের দ্বারা সে কার্য্য হয়; কিন্তু এ উক্তি সূক্ষ্মদর্শনের ফল নহে। দ্বিবচন না থাকিলে কাজ চলিতে পারে; কিন্তু কাজ চলা এক কথা, আর ভাষার সমৃদ্ধি অন্য কথা। অসভ্য বর্ব্বরগণের শীতবস্ত্র নাই, পশুচর্ম্ম দ্বারা তাহারা কোন প্রকারে শীতবাত হইতে আত্মরক্ষা করে; এক প্রকার আবরণই অল্প ও অধিক শীতে ব্যবহার করে—তাহা-দের কাজ চলে, কিন্তু সভ্যসমাজ শীতের অল্পতা ও আধিক্য দেখিয়া প্রয়োজনানুসারে নানাপ্রকার শীতবস্ত্র ব্যবহার করে—অবশ্য সকলগুলি না হইলে চলে—বস্ত্রের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য শীত বাতাদির জন্য আবশ্যক হয় না; কিন্তু, তাই বলিয়া সূক্ষ্ম শিল্প অপ্রয়োজনীয় নহে। উৎকৃষ্ট কাশ্মীরদেশীয় শালের দশাতে যে কারুকার্য্য থাকে তাহা দ্বারা শীত নিবারণের কোন সহায়তা করে না, তজ্জন্য যদি অনাবশ্যক বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া সভ্যতাভিমান করা যায়, তাহা হইলেই সংস্কৃতের বিভক্তি ও দ্বিবচনের আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা চলে। আবশ্যক অনাবশ্যকের কোন সীমা নাই। এক উদ্দেশ্যে যে বস্তুটী অনাবশ্যক, অপর উদ্দেশ্যে তাহা না হইলেই চলে না। এ প্রকারে দ্বিবচনের আবশ্যক না হইলে বহুবচনেরও আবশ্যক নাই, কারণ বহুশব্দ দ্বারা সে কার্য্য সিদ্ধ হয়।

সুতরাং পদ সমৃদ্ধিতে বঙ্গভাষা সংস্কৃত হইতে হীনা, কিন্তু প্রচলিত অন্য ভাষা অপেক্ষা হীনা নহে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইংরেজি ভাষাতে কারকার্থ অন্য পদ দ্বারা ব্যক্ত হয়, শব্দটীর রূপান্তর করিতে হয় না। এ প্রণালী উন্নত, এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রথমতঃ সর্ব্বনাম শব্দের রূপান্তর দেদীপ্যমান; সর্ব্বনামের রূপান্তর অনুমোদিত হইলে অন্য নামের অননুমোদিত হয়, কেন? দ্বিতীয়তঃ কারকার্থক পদ (preposition) যদি বাচক শব্দ (significant) হয় তবে তাহা সর্ব্বত্র সমান অর্থের বাচক ও তদর্থক সকল বস্তু উপস্থিত করে বলিয়া তাহাকে সাধারণ (common) ও তাহা বিশেষাভিধায়ী (general) নহে, ইহা বলা যাইতে পারে; এরূপ অবস্থায় ঐ সকল শব্দের preposition সংজ্ঞা না হইয়া common noun সংজ্ঞা হওয়া অসঙ্গত নহে। এই ভাবে ইহার সংজ্ঞা হইলে অপর শব্দের সহিত অন্বয় হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। যে শব্দের কারকার্থ বুঝাইতে এই সকল শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহার পূর্ব্বে এ সকল শব্দ ব্যবহার করাও শব্দবিজ্ঞানের অননুমোদিত। পদ্যে অথবা রীতির অনুরোধে যে পদের পরে অর্থ প্রতীতি হয়, তাহা অনেক সময় পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়;

কিন্তু সে স্থলে তত্তৎশব্দের স্মৃতি রক্ষা করিয়া অর্থপ্রতীতির জন্য অন্বয়কালে পরে বলা হয়। ইংরেজিতে অন্বয়কালেও preposition পূর্ব্বে বলা হয় ইহা বিজ্ঞানসম্মত নহে। অর্থপ্রতীতি যখন হয় তখন এ সকল আপত্তি অকিঞ্চিৎকর একথা বলা যায় না; কারণ সঙ্কেত দ্বারাও অর্থপ্রতীতি হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে বঙ্গভাষার বিশেষ একটি সমৃদ্ধির উল্লেখ করা উচিত। যুষ্মদাদি শব্দের রূপ শ্রবণে লক্ষ্যপাত্রের সম্ভ্রমাদি জ্ঞান, ইহা সংস্কৃতেও নাই; বাঙ্গালার সম্পূর্ণ নিজস্ব কি না সে বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই।

এই প্রকার ক্রিয়াপদ দ্বারাও সম্ভ্রমের বোধ হইয়া থাকে, যথা 'আছেন' সম্ভ্রমে, অন্যত্র 'আছে'। ইহাও বঙ্গভাষার অন্যতম সমৃদ্ধির লক্ষণ এবং অন্য ভাষাতে অবিদিত। এই 'ন' কি প্রকারে সম্ভ্রমের দ্যোতক হইল তৎসম্বন্ধেও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। সর্ব্বনামের রূপেও সম্ভ্রমে 'ন' ব্যবহৃত হয়। সম্ভ্রমে "তিনি" অন্যত্র 'সে'। 'তাঁহাকে' ইত্যাদির সম্ভ্রমার্থক 'ঁ' 'ন্'এর স্থানে জাত। বিক্রমপুর প্রদেশে সম্ভ্রমে 'তান্‌কে' অন্যত্র 'তাঁকে' বলা হয়। 'তিনি' বিক্রমপুরে 'তানি' হয়। সংস্কৃতে সম্ভ্রমে বহুবচন হইবার ব্যবস্থা আছে।

বাঙ্গলায় লিঙ্গভেদে রূপভেদ রাখা হয় নাই। সম্ভবতঃ ক্লীবলিঙ্গের 'তানি' সর্ব্বলিঙ্গে সম্ভ্রমে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এই 'তানি' পরে 'তিনি' হইয়াছেন। 'যানি' 'যিনি' ও ,ইয়ানি' 'ইনি' এই প্রকারে সম্ভ্রমে 'ন' এর আগমন হইয়াছে, ও সেই 'ন' 'চন্দ্রের' স্থানে 'চাঁদের' ন্যায় ঁ বিন্দুতে পরিণত হইয়াছেন।

বোধ হয় এই প্রকারে সম্ভ্রমে বহুবচন গৃহীত হইলে তাহার ক্রিয়াপদেও বহুবচনের স্থান হইয়াছিল এবং সেই বহুবচনের অন্তি, অন্তে, অন্ত প্রভৃতির অবয়বের সংস্কার ও পরিত্যাগের ফলে ক্রিয়াপদে সম্ভ্রমে 'ন' আসিয়া পড়িয়াছে। অনেক ক্রিয়াপদে এই প্রকারে 'ন' আসিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও,অন্যত্র আছে বলিয়া ক্রমে 'ন' আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। এই সমাধান যে সিদ্ধান্তমূলক তাহা বলা যায় না। এই বিষয়ে শ্রোতৃগণের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য উল্লেখ করা হইল মাত্র।

যে ভাবেই এই সম্ভ্রমের প্রত্যয় আসিয়া থাকুক, ইহা যে বঙ্গভাষার বিশেষ সমৃদ্ধির হেতু হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। "আমি অমুককে জানি অমুক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি" এত কথার ভাব "তাঁহাকে জানি" বলিলেই প্রকটিত হইল। 'ব'স', না বলিয়া 'বসুন' বলিলেই আগন্তুককে যে সম্মান করা হইল তাহা অন্য আচরণ বা শব্দ প্রয়োগ না করিলেও প্রকাশ পাইল। 'অমুক শয়ন করিয়াছেন' শুনিলেই সে ব্যক্তিকে কখন না দেখিয়া থাকিলেও জানা গেল যে, সে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত। এই প্রকার ভাবের অভিব্যক্তি বঙ্গভাষার অনন্য সাধারণ সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

এই স্থলে বঙ্গভাষার প্রত্যয় ঘটিত আর একটি সমৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। পদের উত্তর 'টা'

'খান', 'গাছ', যুক্ত হইয়া তত্তৎ পদ প্রতিপাদ্য বস্তুর আকার প্রতিপাদন করে। 'ভাটাটা' কাপড় খান, দড়িগাছ, যথা ক্রমে ভাটার কাপড় ও দড়ির আকার বিশেষ প্রতিপাদন করে। ক্ষুদ্র ও আদর বুঝাইলে 'টা' 'টী' তে পরিণত হয়, যথা সুশীল ছেলেটী, দুষ্ট ছেলেটা। এই সমৃদ্ধিও অন্য ভাষায় দেখা যায় না। সংস্কৃতে ভাষা পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণে 'বধূটী' পদ দেখা যায় তাহার অর্থ 'ক্ষুদ্রা বধূ র্বধূটী' এই প্রকার করা হইয়াছে। কতকটা আদরার্থেরও ভাব আছে। বাঙ্গলা 'টী' সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে ও কাল ক্রমে লিপিদোষে 'টী' 'টা' রূপে পরিণত হইয়া ভাবান্তর প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে স্থান রক্ষা করিয়াছে। 'গাছ' 'গুচ্ছ' শব্দের অপভ্রংশ হওয়া অসম্ভব নহে। খান সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে পারি নাই। এই সকল শব্দ যে প্রকারেই উৎপন্ন হইয়া থাকুক বা ইহারা প্রত্যয়ই হউক, ইহাদিগের দ্বারা ভাষা ভাবাভিব্যক্তি বিষয়ে যে সমৃদ্ধিমতী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাক্য সম্বন্ধেও বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি যথেষ্ট। সংস্কৃতের ন্যায় সকল রীতির সম্যক্ স্ফূরণ বঙ্গভাষায় নাই। কিন্তু তথাপি সকল রসের প্রকাশ যোগ্যতা বঙ্গভাষার আছে। অতি কঠোর ও কোমল ভাব সকল প্রকাশ করা বঙ্গভাষায় কঠিন নহে। উপযুক্ত বিভক্তি, লিঙ্গ ও ক্রিয়াপদের অভাবে শ্লেষ যমকাদি শব্দালঙ্কারের পারিপাট্য সংস্কৃতের ন্যায় বঙ্গভাষায় সম্ভবপর নহে।

কিন্তু তাহারও একেবারে যে অভাব আছে তাহা নহে। সংক্ষিপ্তোক্তি সংস্কৃতের ন্যায় না থাকিলেও আবশ্যক মত উক্তির সংক্ষেপ করা অসম্ভব নহে। সংস্কৃতের সমাস ও তদ্ধিতের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গভাষা সমাসোক্তি হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই।

ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে বঙ্গভাষা বড় দরিদ্র। ধাতুর সংখ্যা অতি অল্প; কিন্তু ধাতুর সংখ্যার লাঘবে বঙ্গভাষার ক্রিয়া প্রতিপাদনের ব্যাঘাত হয় নাই। কৃদন্ত পদের সহিত ক্রিয়া সামান্য বাচক 'কৃ' 'ভূ' 'অস্তির' যোগে সকল কার্য্য হইতেছে। সংস্কৃতের ধাতুর সংখ্যা বহু। এক গমন অর্থ বুঝাইতে, গম, যা, অট, পট, কট, কীট, ইট, ষিধু, ইত্যাদি বহু ধাতু আছে। ভাষার প্রচলিত শব্দ সমূহের মূল নিরূপণ জন্য ধাতুর কল্পনা। সংস্কৃত শব্দাম্বুধির অগণ্য রত্নরাজির মূল উপাদান অনুসন্ধানের ফলে এত অধিক সংখ্যক ধাতু বাহির হইয়াছে। উপরে যে ধাতুগুলি গমনার্থক বলা হইয়াছে তন্মধ্যে যা ধাতুর উত্তর অনট করিয়া 'যান' পদই কেবল গমনার্থ শকট প্রভৃতিকে বুঝায়, গমন, অটন ইত্যাদি অন্য শব্দে তাহা বুঝায় না, সুতরাং 'যান' শব্দের মূলস্বরূপ যা ধাতুর আবশ্যক, অবশ্য যা ধাতু যাতি, যথো ইত্যাদি পদেরও সাধক বটে। এই প্রকারে অপার শব্দসমুদ্রের অসংখ্য তরঙ্গের গণনার জন্য বহু ধাতুর কল্পনা করা হইয়াছে। বঙ্গভাষা সংস্কৃতের শব্দরাশি দান স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং অসংখ্য ধাতু কল্পনার জন্য তাহাকে উদ্বিগ্ন হইতে হয় নাই।

দেহের অবয়ব গুলি পুষ্ট হইলে যেমন দেহী সবল সুন্দর ও কর্ম্মক্ষম হয়, পদগুলি

পুষ্ট হইলেই বাক্যও তদ্রূপ পুষ্ট হয়। বাঙ্গলার পদের পুষ্টির বিষয় পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি। বাঙ্গলা ভাষার বাক্যে পদ বিন্যাস প্রণালী সরল। সংস্কৃতে রীতি প্রভৃতির অনুরোধে বাক্যস্থ পদগুলি আকাঙ্ক্ষানুসারে স্থাপিত হয় না, পরে অন্বয় করিবার কালে পদগুলিকে যথাস্থানে আনয়ন করিয়া অর্থ করিতে হয়। ইংরেজিতেও যে পদের সহিত যে পদের সম্বন্ধ সে পদগুলি অনেক সময় সন্নিহিত থাকে না। সংস্কৃতে বিভক্তি থাকায় পদগুলি ব্যবহিত থাকিলেও অন্বয় করিতে অসুবিধা হয় না; কিন্তু যে সকল ভাষাতে বিভক্তি নাই, সে সকল ভাষার পদগুলি আকাঙ্ক্ষা অনুসারে যত সন্নিহিত থাকে ততই ভাল। বাঙ্গলা ভাষার কারকার্থক বিভক্তি বা তাহা প্রতিরূপ থাকিলেও বিশেষণ পদে বিভক্তি নাই, সুতরাং পদের সান্নিধ্য রক্ষা করার প্রথা প্রশংসার্হ। ইংরেজিতে একটি বাক্য আরম্ভ করিয়া তাহার কর্ত্তার বিশেষণের জন্য অপর একটি বাক্য আরম্ভ করা যাইতে পারে এবং এই বিশেষ বাক্যে যদি কোন কর্ম্মপদ, উপস্থিত হয়, তবে তাহার বিশেষণ রূপে আর একটি বাক্য আনা যায়, এই প্রকারে একটি বাক্যের মধ্যে বহু বাক্য থাকিতে পারে। এই পদ্ধতি সাধু নহে। ইহাতে বাক্য লক্ষণের অনেক দোষ হয়। বাঙ্গলায় এ দোষ নাই।

বঙ্গভাষা সংস্কৃতের সম্পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত না হইয়া কিছু দীনা; অবয়বের দীনতার জন্য, বঙ্গভাষা সংস্কৃতের সমুদয় অলঙ্কার ধারণেও অসামর্থা—যে সমুদয় অলঙ্কার দেববাণীর অঙ্গ যষ্টির শোভা সম্পাদন করে, সেই সমুদয় বহু কারুকার্য্য খচিত আভরণ বোধ হয় কোন ভাষাসুন্দরীই ধারণে সমর্থা ও যোগ্যা নহে। সে সকল অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া গড়িলে তাহার চাকচিক্য থাকে না, অথচ যে ভাবে আছে সে ভাবে অন্য কাহারই শরীরে মানায় না; সে সকল শরীর তাহার তুলনায় এতই হীন। তবে বঙ্গভাষার শরীর কিয়ং পরিমাণে তাহার অনুরূপ বলিয়া সে সৌন্দর্য্যের—সে মধুরতার—কিছু অংশ সে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে ও মাতৃদত্ত কতকগুলি অলঙ্কার পরিয়া নিজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে।

বর্ণমালা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বঙ্গভাষা সংস্কৃতের অনুরূপ বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছে। সংস্কৃত বর্ণমালা অতিশয় উন্নত, সুতরাং বঙ্গভাষার বর্ণমালারও কোন ত্রুটি নাই। অনেকে বলেন যে বাঙ্গলায় যখন উচ্চারণগত পার্থক্য নাই তখন দুইটী ন ণ, দুইটী জ য, এবং তিনটি শ ষ স রাখা হয় কেন। বাঙ্গলাভাষা সংস্কৃতের সমুদয় শব্দ নিজস্ব করিয়াছি। এ স্থলে উক্ত বর্ণগুলির ভেদ রক্ষা না করিলে তত্তৎ বর্ণযুক্ত সংস্কৃত শব্দগুলি রূপান্তরিত হইয়া বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিলে অর্থ নিরূপণের ব্যাঘাত হইতে পারে, সুতরাং বঙ্গভাষা এ সমৃদ্ধিত্যাগ করিতে পারে নাই ও করাও সঙ্গত নহে।

প্রচলিত ভাষার অনেক শব্দ যে প্রকার লিখিত হয়, তদনুরূপ উচ্চারিত হয় না, ইহাতে অনেকে বলেন যে, বঙ্গভাষার আরও বর্ণ আবশ্যক, আমরা এ উক্তির যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারি নাই। সংস্কৃত বর্ণমালা বর্ণাত্মক শব্দ লিপিবদ্ধ করিবার পক্ষে অপ্রচুর

নহে। খেয়ে যাও, ব'সে আছ, ইত্যাদির উচ্চারণ লিপির অনুরূপ নহে, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই সকল উচ্চারণের জন্য স্বতন্ত্র বর্ণের আবশ্যক নাই।

'খেয়ে' 'খাইয়ার' সংক্ষেপ, 'ব'সে', 'বইসা' র সংক্ষেপ। এই প্রকার সংক্ষেপোক্তি স্থলে উচ্চারণের কালের সংক্ষেপ জন্য লিপির অনুরূপ উচ্চারণ, দেখা যায় না। "ভাল লাগছে' না" এই উচ্চারণ টীর পূর্ব্ববঙ্গের ও অপর বঙ্গের পার্থক্য স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে! পূর্ব্ববঙ্গে 'না' র আকার পূর্ণ দীর্ঘো-চ্চারণ প্রাপ্ত হয় কিন্তু তাহা অপর দেশের কর্ণে শ্রুতিকটু হয়। তাঁহারা 'আ' কারের পূর্ণ দীর্ঘোচ্চারণ করেন না, তাহাতেই অন্য প্রকার উচ্চারণ বোধ হয়। ইহা উচ্চারণের উপদেশের বিষয়ীভূত এজন্য পৃথক্ বর্ণের প্রয়োজন নাই।

পূর্ব্বে যে সকল কথা বলা গেল তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, বঙ্গভাষা নির্ঝরিণীর মূল উৎস সংস্কৃত ভাষার শব্দ সমুদ্র। সে সমুদ্র অপার সুতরাং বঙ্গভাষার শব্দও অনন্ত, এই প্রকারে অনন্ত শব্দরাশি যে ভাষার সম্পত্তি তাহার সমৃদ্ধি অতুল।

শ্রীভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী।

১৫ নং চিত্র।

স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি

১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১৬ নং চিত্র।

বগুড়া—সেরপুর ৺ গোবিন্দ রায় বিগ্রহের বাটীতে রক্ষিত

(ক) চামুণ্ডা। (খ) বাভ্রবীকায়া। (গ) বাসুদেব মূর্ত্তি

(খ) নং মূর্ত্তি হরগৌরী খ্যাত এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের বর্ণিত "বাভ্রবীকায়ার" সহিত অভিন্ন। ১৬৪পৃঃ দ্রষ্টব্য

চিত্র সংগ্রাহক—শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু।

রাজা বিরাট ও মৎস্য দেশ।

বগুড়া সহরের প্রায় ২০।২২ মাইল উত্তর পশ্চিমে ঘোড়াঘাট (১) নামক স্থান অবস্থিত। এই ঘোড়াঘাটের প্রায় ৩ ক্রোশ দক্ষিণে ৫।৬ ক্রোশ ব্যাপী যে বিশাল অরণ্যের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে, ঐ ধ্বংসাবশিষ্ট অরণ্যের মধ্যে একটি প্রাচীন রাজবাটীর বিপুল ধ্বংসস্তূপ কালের কঠোর হস্তের সাক্ষী স্বরূপ আজিও পাথিকের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে;—স্থানীয় প্রবাদ ও পুরুষ পরম্পরাগত জনশ্রুতি, এই ধ্বংস স্তূপকে বিরাট রাজের বাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এতদঞ্চলের বহুলোকের বিশ্বাস যে প্রাগুক্ত "বিরাট রাজ" ও মহাভারতোক্ত "মৎস্য রাজ বিরাট" এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি এবং পাণ্ডবগণ তাঁহাদের অজ্ঞাতবাসের সুদীর্ঘ দ্বাদশ মাস এই বিরাট রাজ্যেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দিনাজপুরের অন্তর্গত রাণীশঙ্কল পুলিশ ষ্টেশন হইতে আরম্ভ করিয়া "সুবিল" (২) পর্য্যন্ত উত্তর গোগৃহের এবং সুবিল হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে পাবনা জেলার রায়গঞ্জ পুলিস ষ্টেশনের অন্তর্গত নিমগাছি (৩) পর্য্যন্ত দক্ষিণ গোগৃহের সীমা বলিয়া আজিও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বিরাট সেনাপতি কীচকের বাড়ী (৪), ভীমের বিশাল ভুজবল নির্ম্মিত ভীমের জাঙ্গাল (৫), অর্জ্জুনের তীক্ষ্ণ শরোৎকীর্ণ "ভোগবতী গঙ্গা" (৬) প্রভৃতি আজিও

(১) "In Rennel's Bengal Atlas, Sheet 6, Ghoraghat is placed 27 M. N. N. W of Bogra. This Sarkar included the Rungpur, Dinagepur and (Part of) Bogra Districts."
(India of Aurangzeb by Prof. Jadu Nath Sarkar)

(২) বগুড়া সহরের প্রায় ১ মাইল উত্তরে একটি খালের ন্যায় জলের প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে স্থানীয় লোকে সুবিল বলিয়া অভিহিত করে।

(৩) জেলা পাবনার অন্তর্গত রায়গঞ্জ থানার অন্তঃপাতী নিমগাছি নামক স্থানের সন্নিকটে এক প্রাচীন নগরীর বিশাল ধ্বংসস্তূপ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা দেখিতে পাওয়া যায়। "জয়সাগর" নামক একটি দীর্ঘিকা অতি প্রকাণ্ড। এই স্থান বিরাট-রাজের দক্ষিণ গোগৃহ বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। অনেকে অনুমান করেন ইহা "জয়পাল" নামক পালরাজবংশীয় কোন সামন্ত নৃপতির রাজ্য ছিল এবং জয়-সাগর উক্ত রাজা জয়পালের নামে খনিত হইয়াছে।

(৪) "রাজা বিরাটের" ৪ ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণে ও বগুড়া সহরের প্রায় ৬ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে "কীচক পানিতলা" নামক স্থানে কীচকের বাড়ী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। ঐ স্থানে একটি হাট আছে।

(৫) বগুড়ার উত্তর পূর্ব্ব অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর অতি বৃহৎ শৈলাকারে একটি মৃন্ময় বাঁধ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বাঁধ বা জাঙ্গাল "ভীমের জাঙ্গাল" নামে পরিচিত। উহা উত্তরে ঘোড়াঘাট অতিক্রম করিয়া গিয়াছে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন কর্তৃক ঐ জাঙ্গাল নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ জাঙ্গালের উপরিভাগে স্থানে স্থানে একণে লোকের বসতি হইয়াছে। কোন কোন স্থান জঙ্গলময় হওয়ায় হিংস্র জন্তুর আবাস স্থানে পরিণত হইয়াছে। বহুকালের নির্ম্মিত হইলেও উহার স্থানে স্থানে ১০।১২ হাত উচ্চ হইবে।

(৬) বগুড়া সহরের ১২ মাইল উত্তর পশ্চিমে ও "রাজা বিরাটের" ৪ ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণে

বিরাট রাজ্যের কীর্ত্তিকলাপ স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বগুড়া ও নিকটবর্ত্তী জেলার অধিবাসিগণ এই প্রদেশকে মহাভারতোক্ত বিরাট রাজের মৎস্যদেশ বলিয়া যে জন- প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিতেছেন তাহার সার্থকতা কি? এই প্রদেশ কি বাস্তবিকই মহাভারতীয় বিরাট রাজত্বের সহিত অভিন্ন? আমরা এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

অবশ্য ভারতবর্ষের পৌরাণিক স্থানগুলির ভৌগোলিক সীমা নির্দ্দেশ করা আজকাল অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণাদিতে ভারত-বর্ষের বিভিন্ন স্থানগুলি যে যে নামে পরিচিত হইয়াছে, তাহাদের সেই সংজ্ঞা এখন আর বর্ত্তমান নাই এবং এরূপ ভাবে বিকৃত ও বহুস্থানে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে এক্ষণে তাহাদের অবস্থান নির্ণয় সহজসাধ্য নহে। কিন্তু এরূপ হইলেও পুরাণাদির ও রামায়ণ মহাভারতের বর্ণনা হইতে মহাভারতীয় যুগের বিরাটরাজ্য প্রাচীন মৎস্যদেশের অবস্থান যে একেবারে নির্ণয় করা যায় না, একথা আমরা বিশ্বাস করি না।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

সরস্বতী দৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ ১৭
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥ ১৯

* * * *

হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্ম্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২১
আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যো রার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ২২

(মনু দ্বিতীয় অধ্যায়)

অর্থাৎ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যে যে প্রদেশ আছে, পণ্ডিতেরা সেই দেব নির্ম্মিত দেশকে "ব্রহ্মাবর্ত্ত" কহেন। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ ও মথুরা এই কয়েকটি দেশকে "ব্রহ্মর্ষি দেশ বলে। এই ব্রহ্মর্ষি দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ হীন। উত্তরে হিমা-লয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি—এই উভয় পর্ব্বতের মধ্যস্থানে বিনশন দেশের পূর্ব্বে ও প্রয়াগের পশ্চিমে যে দেশ তাহাকে "মধ্যদেশ" কহে (সরস্বতী নদীর অন্তর্দ্ধান প্রদেশকে বিনশন

পানিতলা হাটের অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে জঙ্গলের সমীপবর্ত্তী একটি প্রান্তরের মধ্যে অতি প্রাচীন কূপাকার একটি গর্ত্ত আছে ঐ গর্ত্তকে দেশীয় লোকে "ভোগবতীগঙ্গা" বলে। স্থানীয় প্রবাদ এইরূপ যে যৎকালে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন তৎকালে এই কূপ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত ভোগবতী গঙ্গার নিকটে "কোদাল ধোওয়া পুষ্করিণী" নামক একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে 'ভীমের জাঙ্গাল" নির্ম্মাণ শেষ হওয়ার পর এই পুষ্করিণীতে ভীমসেন কোদাল ধৌত করিয়াছিলেন।

কহে)। পূর্ব্ব পশ্চিমে সমুদ্রদ্বয়, উত্তর দক্ষিণে হিমগিরি ও বিন্ধ্যগিরি, ইহার মধ্যস্থানকে পণ্ডিতেরা "আর্য্যাবর্ত্ত" বলেন।

মনুসংহিতার বচন দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে "মৎস্যদেশ" কুরুক্ষেত্র, কান্যকুব্জ ও মথুরার নিকটবর্ত্তী, এবং ঐ কয়েকটি প্রদেশ "ব্রহ্মর্ষি" দেশান্তর্গত ছিল।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে সহদেব কর্ত্তৃক দক্ষিণ দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে দুইটি মৎস্যদেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"তথৈব সহদেবোঽপি ধর্ম্মরাজেন পূজিতঃ।
মহত্যা সেনয়া রাজন্ প্রযযৌ দক্ষিণাং দিশম্॥ ১
স শূরসেনান্ কার্ৎস্ন্যেন পূর্ব্বমেবাজয়ৎ প্রভুঃ।
মৎস্যরাজঞ্চ কৌরব্যো বশে চক্রে বলাদ্বলী॥ ২
অধিরাজাধিপঞ্চৈব দন্তবক্রং মহাবলং।
জিগায় করদঞ্চৈব কৃত্বা রাজ্যে ন্যবেশয়ৎ॥ ৩
সুকুমারং বশে চক্রে সুমিত্রঞ্চ নরাধিপং।
তথৈবাপর মৎস্যাংশ্চ ব্যজয়ৎ স পটচ্চরান্॥ ৪

(মহাভারত সভাপর্ব্ব ৩১ অধ্যায়)

অর্থাৎ সহদেব মহতী সেনা সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমতঃ মথুরা নগরী জয় করিলেন। তৎপর মৎস্যরাজ তদীয় বলবীর্য্যের অধীন হইলেন। তদনন্তর অধিরাজাধিপতি মহাবল দন্তবক্রকে ··· ··· জয় করিলেন। তৎপর সুকুমার ও নরাধিপ সুমিত্রকে বশীভূত করিয়া পটচ্চর (১) ও অপর মৎস্যদিগকে পরাজয় করিলেন।"

উক্ত বর্ণনায় মথুরার পর মৎস্যদেশের উল্লেখ হওয়ায় এই মৎস্যদেশ ও মনুসংহিতার মৎস্যদেশ এক বলিয়া অনুমান হইতেছে। তৎপর "অপর মৎস্য" দেশের যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আরও দক্ষিণে স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া অনুমান হয়।

উক্ত সভাপর্ব্বের ভীমকর্ত্তৃক পূর্ব্বদিক্ বিজয় প্রসঙ্গে ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে আর একটি স্বতন্ত্র "মৎস্য" দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"স কাশিরাজং সমরে সুবাহু মনিবর্ত্তিতম্॥ ৬
বশে চক্রে মহাবাহু র্ভীমোভীমপরাক্রমঃ।
ততঃ সুপার্শ্বমভিত স্তথা রাজপতিং ক্রথম্॥ ৭
যুধ্যমানং বলাৎ সংখ্যে বিজিগ্যে পাণ্ডবর্ষভঃ।
ততো মৎস্যান্মহাতেজা মলদাংশ্চ মহাবলান্॥ ৮ (৩০ অধ্যায়)

অর্থাৎ তৎপর ভীম নিজ বাহুবলে কাশিরাজের সহিত সুবাহুকে বশীভূত করিলেন। অনন্তর

(১) পটচ্চরান্ চোর দেশান্ (নীলকণ্ঠ)

সুপার্শ্ব যুধামান ও রাজপতি ক্রথকে বলপূর্ব্বক পরাজয় করিলেন। তৎপর মৎস্য ও মহাবল মলদদিগকে জয় করিতে লাগিলেন। এস্থানে কাশিরাজ্যের পূর্ব্বে ও মলদের (বর্ত্তমান মালদহ) নিকট অপর একটি মৎস্যদেশের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

মহাভারত ভীষ্মপর্ব্বের ১ ম অধ্যায়ে তিনটী বিভিন্ন মৎস্য দেশের উল্লেখ আছে যথা --

শূরসেনাঃ পুলিন্দাশ্চ বোধমালা স্তথৈবচ ॥ ৩৯

মৎস্যাঃ কুশল্যাঃ সৌশল্যাঃ কুন্তয়ঃ কান্তিকোশলাঃ।

চেদি মৎস্য করূষাশ্চ ভোজাঃ সিন্ধুপুলিন্দকাঃ ॥ ৪০

ভূপালাঃ প্রতিমৎস্যাশ্চ কুন্তলা কোশলাস্তথা। ৫২

উপরোক্ত শ্লোকগুলি হইতে যে তিনটি মৎস্য দেশের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তাহার প্রথমটি শূরসেনের (মথুরা) নিকট অপরটি কারূষ (সাহাবাদ) দেশের নিকট এবং তৃতীয়টি অর্থাৎ প্রতি মৎস্যদেশ কোশল দেশের নিকট, বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের দশম সর্গে দশরথ কর্ত্তৃক কৈকেয়ীর মানভঞ্জন প্রসঙ্গে এইরূপ শ্লোক আছে ;—

দ্রাবিড়া সিন্ধু সৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।

বঙ্গাঙ্গ মাগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ ॥

অর্থাৎ দ্রাবিড়, সিন্ধু সৌবীর, সৌরাষ্ট্র ও দক্ষিণাপথ এবং বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশি, কোশল প্রভৃতি সমৃদ্ধশালী রাজ্য আমার শাসনাধীন।

উক্ত শ্লোকে মৎস্য দেশ যেরূপভাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তাহাকে মগধের নিকট-বর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের একচত্বারিংশ সর্গে সুগ্রীব অঙ্গদকে দক্ষিণভারত অন্বেষণের ভার দিয়া এইরূপ উপদেশ দিতেছেন যথা—

"ততো গোদাবরীং রম্যাং কৃষ্ণবেণীং মহানদীং।

মেকলানুৎকলাংশ্চৈব দশার্ণ নগরাণ্যপি ॥ ৯

আব্রবন্তী মবন্তীঞ্চ সর্ব্বমেবানুপশ্যত।

বিদর্ভাসৃষ্টিকাংশ্চৈব রম্যান্মাহিষকানপি ॥ ১০

তথা মৎস্যকলিঙ্গাংশ্চ কৌশিকাংশ্চ সমন্ততঃ।

অন্বীক্ষ্য দণ্ডকারণ্যং সপর্ব্বত নদীগুহং ॥ ১১

অর্থাৎ গোদাবরী কৃষ্ণবেণী এবং মহানদী অন্বেষণ করিবে। পরে মেকল, উৎকল, দশার্ণ, আব্রবন্তী, অবন্তী, বিদর্ভ সৃষ্টিক, মাহিষিক, মৎস্য, কলিঙ্গ, কৌশিক এবং দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি অন্বেষণ করিবে।

এস্থানে কলিঙ্গদেশের নিকটবর্ত্তী অপর একটি মৎস্যদেশের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণেও লিখিত আছে যে ভগবান কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া নবধা ভিন্ন ভারতবর্ষকে আক্রমণ করতঃ পূর্ব্বমুখে অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহার মধ্যস্থলে সারস্বত, মৎস্য, শূরসেন, মাথুর, ধর্ম্মারণ্য, পঞ্চাল প্রভৃতি দেশ অবস্থিত। এবং আরও লিখিত আছে যে কলিঙ্গ, চেদি, উর্দ্ধকর্ণ ও মৎস্য প্রভৃতি যে সকল দেশ বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকট অবস্থিত, আর বিদর্ভ, কটকস্থল, দশার্ণ, কৌস্কিন্ধ্যা প্রভৃতি দেশ সকল তাঁহার পূর্ব্বদক্ষিণ পদে অবস্থিত।

এস্থলেও শূরসেন অর্থাৎ মথুরার নিকটবর্ত্তী একটি এবং কলিঙ্গ ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী আর একটি এই দুইটি মৎস্য দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

উদ্ধৃত মনু, মহাভারত, রামায়ণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের বচনাবলী অনুসরণ করিয়া আমরা তিনটি মৎস্যদেশের সন্ধান প্রাপ্ত হইতেছি।

(১) প্রথমটি ব্রহ্মর্ষি দেশান্তর্গত শূরসেন অর্থাৎ বর্ত্তমান মথুরার সমীপবর্ত্তী ;

(২) দ্বিতীয়টি কলিঙ্গ ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী ;

(৩) তৃতীয়টি বর্ত্তমান বঙ্গদেশের অন্তর্গত মলদ অর্থাৎ মালদহের সন্নিকট বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদের মধ্যে তিনটি স্থান আজ পর্য্যন্তও "মৎস্যদেশ" বলিয়া জনশ্রুতিতে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। মথুরা জেলার পশ্চিমাংশে, এবং যে বিস্তৃত ভূভাগ এক সময় কুরুক্ষেত্র বলিয়া গণ্য ছিল তাহার দক্ষিণে রাজপুতনার অন্তর্গত বর্ত্তমান জয়পুরের মধ্যে বৈরাট ও মাচাড়ী নামক দুইটি প্রাচীন স্থান এখনও বিদ্যমান। ঐ দুই স্থান প্রাচীন বিরাট রাজ্য ও মৎস্যদেশের নাম রক্ষা করিতেছে বলিয়া অনুমান হয়। এই মৎস্যদেশই ব্রহ্মর্ষি দেশান্তর্গত শূরসেন অর্থাৎ মথুরার নিকটবর্ত্তী প্রথম "মৎস্য" দেশ। এবং এই মৎস্য দেশেই মহাভারতীয় বিরাটরাজ রাজত্ব করিতেন এবং এই স্থানেই যে যুধিষ্ঠিরাদি অজ্ঞাতবাসে যাপন করিয়াছিলেন, তাহাও মহাভারত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়।

বিরাট পর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ে মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদের অজ্ঞাতবাসের স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

"তস্যৈব বরদানেন ধর্ম্মস্য মনুজাধিপ।
অজ্ঞাতা বিচরিষ্যামো নরাণাং নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯
কিন্তু বাসায় রাষ্ট্রাণি কীর্ত্তয়িষ্যামি কানিচিৎ।
রমণীয়ানি গুপ্তানি তেষাং কিঞ্চিৎ স্ম রোচয়॥ ১০
সন্তি রম্যা জনপদা বহ্বন্নাঃ পরিতঃ কুরূন্।
পঞ্চালাশ্চেদি মৎস্যাশ্চ শূরসেনাঃ পটচ্চরাঃ॥ ১১
দশার্ণা নবরাষ্ট্রাশ্চ মল্লাঃ শাল্বাঃ যুগন্ধরাঃ।
কুন্তিরাষ্ট্রং সুবিস্তীর্ণং সুরাষ্ট্রাবন্তয়স্তথা॥ ১২

(বিরাট পর্ব্ব ১ম অধ্যায়)

অর্থাৎ হে রাজন্ কুরুমণ্ডলীর চতুষ্পার্শ্বে পঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মল্ল, শাল্ব, যুগন্ধর, কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র, অবন্তী এই সমস্ত সুবিস্তীর্ণ বিপুল শস্যসম্পন্ন রমণীয় জনপদ বিদ্যমান আছে ইহার মধ্যে কোন দেশটি আপনার অভিমত হয় বলুন।

এ স্থানেও "মৎস্য ও শূরসেন" একত্র উল্লেখ থাকায় অজ্ঞাত-বাসের "মৎস্য" দেশ শূরসেন অর্থাৎ মথুরার নিকটবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

তৎপর যে সময় পাণ্ডবেরা কাম্যবন হইতে অজ্ঞাত বাস করিবার জন্য মৎস্যদেশাভিমুখে আগমন করেন তৎ-প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত আছে,—

তে বীরা বদ্ধনিস্ত্রিংশাস্তথা বদ্ধকলাপিনঃ।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণাঃ কালিন্দী মভিতো যযুঃ॥ ১
ততস্তে দক্ষিণং তীর মন্বগচ্ছন্ পদাতয়ঃ।
নিবৃত্তা বনবাসাদ্বৈ স্বরাষ্ট্রং প্রেপ্সবস্তদা।
বসন্তো বনদুর্গেষু গিরিদুর্গেষু ধন্বিনঃ॥ ২
সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ বরাহাংশ্চ মারয়ন্তি চ সর্ব্বশঃ।
বিধ্যন্তো মৃগযূথানি মহেশ্বাসা মহাবলাঃ॥ ৩
উত্তরেণ দশার্ণাংস্তে পঞ্চালান্ দক্ষিণেনতু।
অন্তরেণ যকৃল্লোমান্ শূরসেনাংশ্চ পাণ্ডবাঃ।
লুব্ধা ব্রুবাণা মৎস্যস্য বিষয়ং প্রাবিশন্ বনাৎ॥ ৪

অর্থাৎ অনন্তর স্বরাজ্য লিপ্সু শ্মশ্রুধারী পাণ্ডবগণ গোধাঙ্গুলিত্রান বন্ধন ও ধনু, খড়্গ, আয়ুধ, তূণ গ্রহণ পূর্ব্বক পাদচারে কালিন্দী নদীর দক্ষিণতীরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে কখন বা গিরিদুর্গে, কখন বা বনদুর্গে অবস্থান পূর্ব্বক মৃগয়া করতঃ গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দশার্ণ দেশের উত্তর ; পঞ্চাল দেশের দক্ষিণ এবং যকৃল্লোম ও শূরসেনের মধ্য দিয়া মৎস্য দেশে প্রবিষ্ট হইলেন।

উপরোক্ত বিবরণ পাঠে মহাভারতীয় বিরাট রাজত্ব 'মৎস্য' দেশ যে মনুপ্রোক্ত শূরসেন (মথুরা) ও পঞ্চাল দেশের নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মর্ষিদেশান্তর্গত ছিল তদ্বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আমরা যে মথুরার নিকটবর্ত্তী জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত "বৈরাট" ও "মাচাড়ী" নামক স্থানকে প্রাচীন বিরাট রাজ্য ও মৎস্য দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহার সত্যতা উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। বিশ্বকোষে লিখিত আছে—

"বৈরাট সহর দিল্লী হইতে ১০৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম ও জয়পুর রাজধানী হইতে ৪১ মাইল উত্তরে নাত্যুচ্চ রক্তবর্ণ শৈল পরিবেষ্টিত গোলাকার উপত্যকা মধ্যে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বাংশের শেষে নাত্যুচ্চ অধিত্যকার বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ মধ্যে বৈরাট সহর। এক সময় এখানকার তামার খনি ভারত প্রসিদ্ধ ছিল। তদ্ধেতু আইন আকবরীতে বিরাটের নাম

পাওয়া যায়। প্রাচীন বৈরাটের পূর্ব্বাংশ—"ভীমজীকা গাম" (ভীমের গ্রাম) নামে অভিহিত।" (বিশ্বকোষ)

"বৈরাট হইতে ৩২ মাইল পূর্ব্বে এবং মথুরা হইতে ৬৩ মাইল পশ্চিমে "মাছেরী" বা "মাচাড়ী" নামক প্রাচীন গ্রাম। এখানেও বহুতর প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন বিদ্যমান। মাচাড়ী হইতে বৈরাট যাইবার পথিমধ্যে "কুশল গড়" অবস্থিত। মহাভারতে মৎস্যের পার্শ্বে কশল্য নামক জনপদের উল্লেখ আছে। উক্ত কুশল গড় ও কশল্য এক হওয়া— বিচিত্র নহে"। (বিশ্বকোষ)

উপরোক্ত বিরাট-রাজ্য ব্যতীত মেদিনীপুর ও ময়ূরভঞ্জের মধ্যে অপর একটি মৎস্য দেশের সন্ধান পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ রামায়ণ, মহাভারত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে কলিঙ্গ ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের বর্ণনা প্রসঙ্গে যে অপর একটি মৎস্য রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এই মৎস্য দেশই উক্ত মেদিনীপুর ও ময়ূরভঞ্জের মৎস্য দেশ। কিন্তু এই মৎস্য দেশ সম্বন্ধে আলোচনা করা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত গোবিন্দগঞ্জ থানা ও তন্নিম্নস্থ করতোয়া হইতে ৬ মাইল দূরে সরকার ঘোড়াঘাট ও পরগণে আলিগ্রামের মধ্যে "রাজা বিরাট" নামক স্থান ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ কতকদূর ভূভাগ লইয়া অপর একটি মৎস্য দেশের অস্তিত্ব জনপ্রবাদ দ্বারা বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। সম্ভবতঃ এই জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই স্বনামখ্যাত বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন "রাজা নীলাম্বরের পূর্ব্বপুরুষ রাজা নীলধ্বজ সর্ব্বপ্রথম কমতাপুরী নামে নগরী নির্ম্মাণ করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ আজিও কুচবেহার রাজ্যে আছে। এই বংশের তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের সময় রাজ্য পুনর্ব্বার সুবিস্তৃত হইয়াছিল দেখা যায়। কামরূপ, ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত রঙ্গপুর, আর মৎস্যের কিয়দংশ তাঁহার ছত্রাধীন ছিল।" (বাঙ্গালার—ইতিহাসের ভগ্নাংশ—রঙ্গপুর—কমতাপুর)

এই মৎস্য দেশই যে মহাভারত বর্ণিত কারুষ (বর্ত্তমান সাহাবাদ জেলা) দেশের ও মলদের (মালদহ) নিকটবর্ত্তী এবং "বঙ্গাঙ্গ মাগধাঃ মৎস্যা" শ্লোকাংশের বর্ণিত মৎস্য দেশের লক্ষ্যীভূত তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

এই মৎস্য দেশের বিস্তৃতি কতদূর ব্যাপী ছিল তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত দুরূহ। দিনাজপুরের অন্তর্গত রাণীশঙ্কল থানা উত্তর গোগৃহ, এবং পাবনা জেলার রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত "নিমগাছির" নিকটবর্ত্তী প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ দক্ষিণ গোগৃহ, এবং এই স্থানে মহাভারতীয় বিরাট রাজের বাসস্থান ছিল বলিয়া, পাণ্ডবগণ তাঁহাদের সম্বৎসর ব্যাপী অজ্ঞাত বাস যাপন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু মহাভারতীয় বিরাট রাজ্য যে রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুরে অবস্থিত ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি।

মহাভারতের সময় মলদ (বর্ত্তমান মালদহ) একটি স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত

হইত (১)। সম্ভবতঃ মলদ রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলার কতকাংশ এবং বগুড়া জেলার উত্তরাংশের কিয়ৎ-পরিমাণ ভূভাগ লইয়া এই শেষোক্ত মৎস্য রাজ্য স্থাপিত ছিল। বগুড়া জেলার অধিকাংশ স্থান প্রাচীন পৌণ্ড্র রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং বগুড়ার ৮ মাইল উত্তরে মহাস্থান নামক স্থান পৌণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন নগরীর সহিত অভিন্ন ছিল বলিয়া প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং বগুড়া জেলার সুবিল পর্য্যন্ত উত্তর গোগৃহের এবং সুবিল হইতে দক্ষিণে নিমগাছি পর্য্যন্ত দক্ষিণ গোগৃহের সে সীমা জনপ্রবাদ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশেষতঃ মহা-ভারতীয় বিরাট রাজ্যেরই উত্তর ও দক্ষিণ গোগৃহ ছিল বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অপর মৎস্য রাজ্য গুলিরও যে গোগৃহ ছিল তাহা মহাভারতের কোথাও উল্লেখ নাই।

আমাদের অনুমান হয় যে, বর্ত্তমান "রাজা বিরাট" নামক স্থান এতদ্দেশীয় পূর্ব্বো-ল্লিখিত তৃতীয় মৎস্যদেশের রাজধানী ছিল এবং তথায় পরাক্রান্ত মৎস্য নরপতিগণ এককালে রাজত্ব করিতেন। কালক্রমে উক্ত মৎস্য রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, উক্ত রাজ্যের সমস্ত স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়; এবং ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে লোকে মৎস্য দেশ ও মৎস্য রাজ নাম মাত্র অবলম্বন করিয়া তথায় মহাভারতীয় বিরাট রাজ্যের অস্তিত্ব কল্পনা করতঃ ক্রমে উত্তর গোগৃহ, দক্ষিণ গোগৃহ, ভীমের জাঙ্গাল, কীচকের বাড়ী, ভোগবতী গঙ্গা ইত্যাদি কল্পনা করিয়াছে। অথবা মৎসরাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর বিরাট নামক অপর কোন স্বাধীন বা সামন্ত রাজা কিছুকাল এই স্থানে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। তাঁহারই সুদূর স্মৃতি অবলম্বনপূর্ব্বক বর্ত্তমান কল্পনামূলক আখ্যায়িকার উদ্ভব হইয়া থাকিবে। কিরূপে নামের একতা হইতে গল্পের সৃষ্টি হইয়া থাকে ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যে যে স্থান উত্তর গোগৃহ ও দক্ষিণ গোগৃহ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে সম্ভবতঃ ঐ ঐ স্থান পাল ও সেনরাজগণের সমসাময়িক পরাক্রান্ত সামন্ত নৃপতিগণের রাজ-ধানী ছিল। বগুড়া জেলার যে প্রকাণ্ড মৃন্ময়বপ্র 'ভীমের জাঙ্গাল' নামে খ্যাত তাহা কোন পরাক্রান্ত রাজা কর্তৃক তাৎকালিক বেগবতী করতোয়া নদীর প্রবল বন্যা হইতে দেশ রক্ষার জন্য নির্ম্মিত বাঁধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। "কীচকের বাড়ী" ও "ভোগবতীগঙ্গা" প্রভৃতিও ঐরূপ অলীক কল্পনা প্রসূত। অধিক সম্ভব এইরূপ কল্পনার ফলেই দিনাজপুর জেলায় পত্নীতলা থানার অন্তর্গত বাদলগাছি নামক স্থানে ভট্টগুরব মিশ্র (২) স্থাপিত প্রসিদ্ধ "বাদাল স্তম্ভ" "ভীমের পান্টি" নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

(১) "ততোমৎস্তান্ মহাতেজা মলদাংশ্চ মহাবলান্" (মহাভারত সভাপর্ব্ব ৩০শ অধ্যায়)।

(২) ভট্টগুরব শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। বগুড়া জেলার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে মঙ্গলবাড়ী হাটের সন্নিকটে ইঁহার বাসস্থান ছিল বলিয়া অনুমান হয়। ইঁহার প্রপিতামহ দর্ভপাণি মিশ্র দেবপালের মন্ত্রী ছিলেন। তদবধি

কালীকমল সার্ব্বভৌম-প্রণীত ও ১৮৬১ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত "সেতিহাস বগুড়া" নামক গ্রন্থে রাজা বিরাটের তৎসাময়িক অবস্থা এইরূপ লিখিত হইয়াছে। "এইস্থানে প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসের প্রতি রবিবারে মেলা হয়। যে স্থানে মেলা হয়, সে স্থান কেবল অরণ্যময়। মেলা যে স্থানে হয়, সে স্থানের নাম বিরাটের সিংহদ্বার। প্রতি মেলায় ৩।৪ সহস্র লোকামোদ হয়। প্রাতঃকাল হইতে তৃতীয় প্রহর বেলা পর্য্যন্ত মেলা থাকে। মেলায় ভিক্ষুক যত, যাত্রীও তত; ভিক্ষুকদিগের উৎপাতে যাত্রীরা বিরত হয়। এই মেলায় খাদ্যসামগ্রী তাবৎই মেলে; কেবল মৎস্য, হরিদ্রা, ঘৃত, কাষ্ঠ একেবারেই ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিলে পাকক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। বনের মধ্যে তাবৎ প্রকার বৃক্ষ ও বন্য জন্তু আছে। অনেক লোকামোদ হয় তন্নিমিত্ত বন্য জন্তুর ভয় থাকে না। যে সময় মেলা হয়, ঐ সময় অরণ্যের এমন মনোরম নৈসর্গিক শোভা প্রকাশ হয় যে, তাহাতেই লোকের ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকে না। ... ... এই মেলায় একটি আশ্চর্য্য ঘটনা হয়। যত যাত্রী আগমনপূর্ব্বক পাকশাক করিয়া আহারান্তে উচ্ছিষ্ট পত্র বা পাত্র ফেলিয়া যায়, পর দিবস তাহার কোন চিহ্ন থাকে না। কে যে পরিষ্কার করে তাহারও নির্ণয় হয় না। ... ... এই মহারণ্যের মধ্যে রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলার সাহেব লোক শিকার করিতে আইসেন। এই স্থানে যতপ্রকার ব্যাঘ্র, তদ্রূপ ব্যাঘ্র বঙ্গদেশের আর কোন স্থানেই দেখা যায় না। ... ... ময়ূর নানাবিধ, সর্প নানাজাতি ও হরিণ অশেষবিধ এইস্থানে আছে। জ্বালানি কাষ্ঠ প্রতিবৎসর রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলায় বিক্রয় হইতে যায়। এইক্ষণ এই স্থানের অনেক ভূমিতে প্রচুর ধান্য হয়।"

আটচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে স্থান নিবিড় অরণ্য পরিপূর্ণ ছিল এবং যে স্থানে নানাপ্রকার বন্য জন্তু বিচরণ করিত, এক্ষণে সে স্থানে সামান্যরূপ জঙ্গল ব্যতীত আর কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি এক্ষণে পরিষ্কৃত ও সম্পূর্ণ কৃষিকার্য্যোপযোগী হইয়াছে।

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র সেন বি, এল্

ইঁহার পিতামহ সোমেশ্বর ও পিতা কেদার মিশ্র পুরুষানুক্রমে পাল-রাজগণের মন্ত্রিত্ব করিতেন। ভট্ট গুরবমিশ্র মহারাজ নারায়ণপাল দেবের মন্ত্রী ছিলেন এবং ইনিই বাদালে গরুড়স্তম্ভ স্থাপন করেন। "মাতঃ শৈলসুতা" ইত্যাদি গঙ্গা-স্তব ইঁহারই রচিত। উক্ত গরুড়স্তম্ভকে দেশীয় অশিক্ষিত লোকেরা "ভীমের পাচি" (অর্থাৎ গোতাড়ন দণ্ড) বলিয়া থাকে।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সময় নিরূপণ ও জীবনী।*

ভারতভূমির পুরাতত্ত্বের যতই অনুসন্ধান হইতেছে ততই দেখা যাইতেছে যে, কি গণিত ও জ্যোতিষ, কি সাহিত্য, স্মৃতি ও দর্শন, কি ধর্ম্মনীতি, কি শিল্প ও বাণিজ্য, সকল বিষয়েই ভারত-ভূমি ভূমণ্ডলের রাজ্ঞীস্বরূপা ছিলেন। যে বিজ্ঞানের বলে সভ্যজাতির এত উন্নতি, সেই বিজ্ঞানের মূল গণিত, এই ভারতবর্ষে উদ্ভূত হইয়াছে। আর্য্যভট্ট, পরাশর, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষিগণ এই ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মানবাদির ধর্ম্মশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে এই ভারতবর্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতে প্রেমপূর্ণ সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের প্রথম প্রচার করেন। যে ন্যায় দর্শনে ভারত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, এই বঙ্গদেশই সেই নব্য ন্যায়দর্শনের জন্মভূমি; এই বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্র যেরূপ পরিমার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল, অন্য কুত্রাপি তাহা পরিলক্ষিত হয় না। এই বঙ্গভূমিতে অনেকানেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত উৎপন্ন ও প্রাদুর্ভূত হইয়া ন্যায়ের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব আলোচনাপূর্ব্বক গভীরভাবপরিপূর্ণ গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া বাঙ্গালীর নাম গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। এই বঙ্গভূমিতে অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন বাসুদেব সার্ব্বভৌম জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, তৎকালে নিবদ্ধপ্রায় গৌতম-শাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া বঙ্গভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এই বঙ্গ-ভূমিতে কুশাগ্রবুদ্ধি তার্কিকচূড়ামণি রঘুনাথ শিরোমণি জন্ম পরিগ্রহণ পূর্ব্বক, মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া বঙ্গভূমির প্রাধান্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ন্যায়তত্ত্বে কয়জন মনুষ্য পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? এই বঙ্গভূমিতেই মথুরানাথ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রামভদ্র সার্ব্বভৌম, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্য এবং বিশ্ব-নাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উৎপন্ন হইয়া ন্যায়ের বহুবিধ পুস্তকরত্নে ন্যায়ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন; এবং এই বঙ্গভূমিতেই স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক স্মৃতিশাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া বঙ্গদেশ উজ্জ্বল এবং নবদ্বীপ-ভূমিকে "সর-স্বতীর পীঠস্থান"-রূপে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের ধারাবাহিক কোন ইতিবৃত্ত নাই।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন; তৎসংগৃহীত জ্যোতিষতত্ত্ব নামক গ্রন্থের রবিসংক্রান্তি গণনায় উল্লিখিত আছে :—

"নবাষ্ট শক্রহীনেন শকাব্দাঙ্কেন পূরিত।"

অর্থাৎ ১৪৮৯ শকাঙ্কেতে পূরণ করিবে। এতদ্দ্বারা ঐ শকে তাঁহার জ্যোতিষতত্ত্ব সংগৃ-

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-রঙ্গপুর-শাখা-সভার চতুর্থবার্ষিক ষষ্ঠমাসিক অধিবেশনে পঠিত।

হীত হয় তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। জ্যোতিষতত্ত্ব তাঁহার শেষ সময়ের গ্রন্থ বলিয়া সকলে অনুমান করেন; এক্ষণে ঐ গ্রন্থ যদি আমরা তাঁহার ৬০ বৎসর বয়সের গ্রন্থ অনুমান করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার জন্মকাল ১৪২৯ শাকে বলিতে পারি। অতএব মহাত্মা চৈতন্যদেবের ২০।২২ বৎসর পরে রঘুনন্দনের জন্ম অনুভূত হয়। বঙ্গের বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ৺রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র সি, আই, ই, মহাশয়ও তাঁহাকে চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী * বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে তদীয় গ্রন্থ হইতে আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য একাদশীতত্ত্বে বিষ্ণুপূজা-পদ্ধতিতে এবং আহ্নিক তত্ত্বে "হরিভক্তি-বিলাস" নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব উক্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থ যে হরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থের পরে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থের কাল নিরূপণ করিতে পারিলে, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের কাল নিরূপণ সহজ হইবে। সনাতন গোস্বামী ভাগবত গ্রন্থের দশম স্কন্ধের এক টীকা রচনা করেন, ঐ টীকার নাম বৃহদ্বৈষ্ণবতোষিণী; ঐ টীকা ১৪৭৬ শাকে সমাপ্ত হয়, তদ্‌গ্রন্থেই বিবৃত আছে।

"শাকে ষট্ সপ্ততি মণৌ পূর্ণেযাটীপ্পনী শুভা"

আবার সনাতন গোস্বামী-কৃত ঐ বৃহৎ বৈষ্ণবতোষিণী গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন "অন্যদ্ভগবদ্ভক্তিবিলাসের টীকায় বিশেষরূপে করা হইয়াছে" ইত্যাদি। সুতরাং হরিভক্তি-বিলাসের টীকা যে বৃহদ্বৈষ্ণবতোষিণীর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টতঃই অনুমান করা যায়। এতদ্দ্বারা তাঁহার তদ্‌গ্রন্থাংশ যে উক্ত সময়ের অগ্র পশ্চাৎ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা অনায়াসেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়; তদ্ভিন্ন তাঁহার গ্রন্থে রায় মুকুটের (১৪৩১ খৃঃ) উল্লেখ ও নির্ণয় সিন্ধুতে (১৬১২ খৃঃ) তাঁহার স্মৃতি-তত্ত্বের উল্লেখ দেখিয়া তাঁহাকে এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী কালের লোক বলিয়া ধরা যাইতে পারে, তাহা হইলে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে উপরে যে সময় নির্দ্দেশ হইল, তাহা একরূপ প্রকৃত সময় বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বিগত অগ্রহায়ণ মাসের নব্যভারত পত্রিকায় "স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের জন্মস্থান বিচার" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয় জনশ্রুতি-মূলে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের আদি বাসস্থান শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ উপবিভাগস্থ মন্দারকান্দি গ্রাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বপ্রণীত "উদ্বাহ চন্দ্রালোক" নামক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বন্দ্যঘটী বংশ পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশং চ জন্মনালঙ্কৃতবন্তঃ অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গপ্রদেশে তেষাং বংশ্যাঃ সন্তি। পরন্তু তেষাং নিবাসো নবদ্বীপে ইতি কিংবদন্তি কথাংপি পুণ্য সম্পদা তৈর্জনাহ-

---

* রঘুনন্দন চৈতন্যদেবাৎ পরবর্ত্তীতি রাজেন্দ্র লাল মিত্রঃ (মিত্র গোষ্ঠীপত্রিকা ২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা)।

লঙ্কৃতে বংশে প্রদেশে চায়মপি সমজনিষ্ঠতেত্থত্বস্মৎ সগোত্রাঃ পূর্ব্বতনাশ্চেতত্তোতাবতাঽপি মৎ পূজনীয়া"। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয়ের প্রবন্ধে প্রকাশ, মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয় এবং "নবদ্বীপ মহিমা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের বাসস্থান নবদ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অধুনা নবদ্বীপ-সমাজ হইতে প্রকাশিত পুস্তিকায় লিখিয়াছেন :—

"রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের যে স্মৃতিশাস্ত্রের নিবন্ধ গ্রন্থ সকল নব্য স্মৃতি নামে লোক-সমাজে প্রচলিত, যাঁহার কৃত নিবন্ধ সকল বাঙ্গালী হিন্দু মাত্রের ধর্ম্মকর্ম্মের প্রমাণ, যাঁহার নিবন্ধ-মাত্র অবলম্বন করিয়াই পণ্ডিতগণ স্মার্ত্ত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সমাজে পূজিত হন, সেই রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এই নবদ্বীপেরই।"

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের বাসস্থানের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ের উপায় নাই। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য, রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য গোত্র বিখ্যাত বেণীসংহার-প্রণেতা ভট্টনারায়ণের বংশসম্ভূত। হরিভট্টাচার্য্যও একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন,নবদ্বীপে তাঁহার স্মৃতির টোল ছিল ; "সময়প্রদীপ" নামক স্মৃতির গ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। হরিহর ভট্টাচার্য্যের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ রঘুনন্দন, কনিষ্ঠের নাম যদুনন্দন। যদুনন্দন বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হন। রঘুনন্দন অতি শান্তস্বভাব ও ধীরপ্রকৃতি ছিলেন। কথিত আছে, হরিহরকে তাঁহার পুত্রের অসদাচরণের জন্য কখন কোন অভিযোগ শ্রবণ করিতে হয় নাই।

রঘুনন্দন যেমন শান্ত ছিলেন, লেখাপড়াতেও তাঁহার তেমনই মনোযোগ ছিল। তিনি পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া ব্যাকরণ, অভিধান ও কাব্যাদি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; অল্পকালমধ্যেই সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার জন্মিল ; তিনি পঠদ্দশাতেই নব নব ভাবপূর্ণ কবিতা লিখিয়া সহাধ্যায়ীদিগের নিকট এবং অধ্যাপকের নিকট বিশেষ আদৃত হইতে লাগিলেন। তিনি যে ভবিষ্যতে একজন প্রধান লোক হইবেন, তাহা এই সময় হইতেই অনেকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

হরিহর ভঙ্গ কুলীন ছিলেন। ভঙ্গ কুলীনদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ তৎ-কালে অতিশয় প্রবল ছিল, কিন্তু হরিহর এই উভয়েরই বিরোধী ছিলেন। তিনি পুত্রের কাব্যাদি পাঠ শেষ হইলে অন্ততঃ ২০ বৎসর বয়সে নবদ্বীপেই পুত্রের বিবাহ দেন। এই বিবাহের পরই রঘুনন্দন পিতার নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন।

পিতার নিকট কিছু দিন পড়িয়া তিনি সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির নিকট অধ্যয়ন করেন। আচার্য্য চূড়ামণি মহাশয়ও স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, জীমূতবাহন-কৃত দায়ভাগের "দায়তত্ত্বার্ণব" নামে এক টীকা প্রকাশ করেন। তদ্ভিন্ন "কৃত্য-তত্ত্বার্ণব" ও "উদ্বাহ-তত্ত্বার্ণব" প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়া

গিয়াছেন। কথিত আছে, বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট তদীয় জীবনের শেষভাগে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

রঘুনন্দনের সময় বঙ্গে সমৃদ্ধির কাল, মহাত্মা চৈতন্যদেব এই সময়ে ধর্ম্মপথের পথিক হইয়া সনাতন সত্যধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়া সর্ব্ববর্ণের লোকদিগকে ধর্ম্মপথের পথিক করিতেছেন এবং তর্ককেশরী রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ন্যায়ের নূতন ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া সর্ব্বোচ্চ আসনে আসীন হইয়াছেন, সুতরাং রঘুনন্দন স্বীয় প্রাধান্য লাভাশায় ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাস্তবিক সহাধ্যায়ী বা সমসাময়িক ব্যক্তিগণের কাহাকেও কোন বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিতে দেখিলে বুদ্ধিমান্ ও উচ্চাভিলাষী ছাত্রগণের মনে উচ্চাভিলাষ জন্মে এবং অন্য বিষয়ে প্রাধান্য লাভের চেষ্টা তাঁহাদিগের মনে স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে।

এই সময়ে বঙ্গের সিংহাসনে মুসলমান ভূপতি সৈয়দ হোসেন সা উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই মুসলমান-সুলতানের রাজ্যকাল প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হইয়াছে। তাঁহাদের এই দীর্ঘ অধিকার-কালে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার রীতিনীতি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্মের জ্যোতিঃ দিন দিন মলিন হইয়া আসিতেছে, তৎকালে ধর্ম্ম রক্ষা বিষয়ে বদ্ধপরিকর না হইলে ধর্ম্ম রক্ষা কঠিন হইবে, এই বুঝিয়াই রঘুনন্দন স্বধর্ম্ম রক্ষা পক্ষে বদ্ধপরিকর হইলেন। রঘুনন্দন পঠদ্দশাতেই দেখিলেন, প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে নানা মুনির নানা মত, এবং নব্য স্মৃতি-সংগ্রাহকগণও প্রকৃত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, এই সকল প্রাচীন ও নব্য স্মৃতি-কারগণের মত সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে ধর্ম্মাচরণ নিতান্তই কঠিন হইবে; আরও তৎকালে সমাজে ধর্ম্মাচরণের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দাঁড়াইয়াছে। রঘুনন্দন স্মৃতি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই মলমাসতত্ত্ব সংগ্রহ করেন, এবং এই গ্রন্থের প্রথমেই তিনি যে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহারও উল্লেখ করেন।

"মলিম্লুচে দায়ভাগে সংস্কারে শুদ্ধিনির্ণয়ে।
প্রায়শ্চিত্তে বিবাহে চ তিথৌ জন্মাষ্টমীব্রতে॥
দুর্গোৎসবে ব্যবহৃতৌ বেকাদশ্যাদিনির্ণয়ে।
তড়াগ ভবনোৎসর্গে বৃষোৎসর্গ ত্রয়ে ব্রতে।
প্রতিষ্ঠায়াং পরীক্ষায়াং জ্যোতিষে বাস্তুযজ্ঞকে।
দীক্ষায়ামাহ্নিকে কৃত্যে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে॥
সামশ্রাদ্ধে যজুঃ শ্রাদ্ধে শূদ্রকৃত্য বিচারণে।
ইত্যষ্টাবিংশতি স্থানে তত্ত্বং বক্ষ্যামি যত্নতঃ॥"

অর্থাৎ মলমাস (মলিম্লুচ), দায়, সংস্কার, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, উদ্বাহ, তিথি, জন্মাষ্টমী, দুর্গোৎসব, ব্যবহার, একাদশী, জলাশয়োৎসর্গ ঋগ্বেদীয়, সামবেদীয়, যজুর্ব্বেদীয় বৃষোৎসর্গ

শ্রাদ্ধ, ব্রত, দেব, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা, জ্যোতিষ, বাস্তুযাগ, দীক্ষা, আহ্নিক কৃত্য, শ্রীপুরুষোত্তম, শূদ্রকৃত্য, মঠপ্রতিষ্ঠা, সমস্ত স্মৃতিকে এই অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে বিভক্ত করেন। এই অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্ব সমাপ্ত করিতে তাঁহার ন্যূনাধিক ২১ বৎসর কাল পরিশ্রম করিতে হয়। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি কেবল গ্রন্থ পড়িয়া স্বীয় মত স্থাপন করেন নাই। তিনি মিথিলা কাশী প্রভৃতি ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ ও তদ্দেশীয় আচার ব্যবহার রীতিনীতি পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক তদ্দেশবাসী অধ্যাপকদিগের সহিত বিচার করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্বে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি মাত্রেরই জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা উত্তমরূপে লিখিত হইয়াছে। তিনি ঐ সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ মতের একবাক্যতা করিবার জন্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র আদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রমাণ উদ্ধৃত করতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি সমুদয় নিরূপণ করিয়াছেন, এবং কোন স্থানে বা প্রাচীন গ্রন্থের মত খণ্ডন করিয়া কোথাও বা গ্রন্থবিশেষের মত উদ্ধৃত করিয়া স্বমতের সাধন দিয়াছেন এবং কোথাও বা শ্রুতি ও স্মৃতির ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থে তিনি অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, মীমাংসকতা, সারগ্রাহিতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ফলে ভিন্ন ভিন্ন মুনি-মতের বিরোধ সামঞ্জস্য করিতে হইলে যে এক অসাধারণ ক্ষমতা ও বিচার-শক্তির আবশ্যক হয়, এই গ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। জীমূতবাহন দায়ভাগ সম্বন্ধে যেরূপ ভূয়োদর্শন ও ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া গিয়াছেন, রঘুনন্দনও আচার সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। রঘুনন্দনের গ্রন্থে অধিকারী না হইলে কেহই স্মার্ত্ত নামের অধিকারী হইতে পারেন না।

কিরূপে সাক্ষীকে পরীক্ষা করিতে হয়, কিরূপেই বা বিচার করিতে হয়, এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীরই বা কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, ব্যবহার-তত্ত্বে তৎসমুদয় সূক্ষ্মরূপে আলোচিত হইয়াছে। রঘুনন্দনের ঐ সকল গ্রন্থ সংগ্রহে তাঁহার মত প্রচারিত হওয়ায়, তৎকালের প্রচলিত আচার ব্যবহার কোন কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

এইরূপ পরিবর্ত্তন হওয়ায় নবদ্বীপের ও অন্যান্য স্থানের অধ্যাপকগণ তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিয়া বিচারার্থী হন, কিন্তু রঘুনন্দন এমন দৃঢ়তা সহকারে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন যে, পরিশেষে তাঁহার বিরোধিগণ সকলেই তাঁহার মতাবলম্বী হইলেন। ইহাতে অল্পকালমধ্যেই তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে প্রক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, দিন দিন তাঁহার টোলে ছাত্র প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার সুশিক্ষার গুণে ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া অধ্যাপকের প্রতি ভক্তি-বশতঃ, যখন অধ্যাপনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন গুরুর গ্রন্থ হইতে আপন আপন ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইরূপে অল্পকাল-মধ্যে ছাত্রমণ্ডলী দ্বারা বঙ্গভূমির চারিদিকে তাঁহার মত প্রচারিত হইয়া পড়িল। রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব, প্রাচীন স্মার্ত্তগণের গ্রন্থাবলম্বনে রচিত হইয়া তাঁহাদের অধ্যয়ন ও

অধ্যাপনা বিলুপ্ত করিয়া, সমস্ত বঙ্গদেশে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বঙ্গদেশে এমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নাই, যাঁহার গৃহে দুই চারিখানি স্মৃতিতত্ত্ব না পাওয়া যায়। কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মেল প্রচলিত হইবার শতবর্ষ-মধ্যে বংশজ চূড়ামণি স্মার্ত্ত রঘুনন্দন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি রাঢ়ীয় সমাজের অবস্থা অবলোকন করিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হন, এবং উচ্চসম্মানপ্রাপ্ত কুলীনব্রাহ্মণ-সমাজে শাস্ত্র-বহির্ভূত আচার ব্যবহার, বিধর্ম্মীর অনুকরণ, সনাতন ধর্ম্মে অনাস্থা, পরশ্রীকাতরতা, পরস্পর বিদ্বেষিতা, মূর্খের প্রাধান্য, পণ্ডিতের হতাদর ইত্যাদি ব্যভিচার দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া তাহার প্রতিবিধানের জন্যই প্রধানতঃ স্মৃতিতত্ত্ব প্রচারের সঙ্কল্প করেন।

মেল বন্ধন হেতু পাত্রাভাব-প্রযুক্ত কুলীন-কন্যাগণের বিবাহ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়ায়, শ্রীনাথ আচার্য্য প্রভৃতি কুলীন-সন্তানগণ, শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া যখন বয়স্থা কন্যার বিবাহ ও বহুবিবাহের সমর্থন করিতে থাকেন, তখন অনাচার বিরোধী বংশজসমাজের মুখপাত্র রঘুনন্দন স্বীয় "উদ্বাহতত্ত্বে" উঁহাদিগের মতসমূহ অশাস্ত্রীয় * বলিয়া খণ্ডন করেন। আরও স্ব স্ব মেল মধ্যে পাত্রাভাব ঘটায়, কুলীনগণ কন্যার বয়ঃকনিষ্ঠ পাত্রকেও কন্যা সম্প্রদান করা বিধেয় এবং কন্যা ঋতুমতী হইয়া যাবজ্জীবন গৃহে থাকিলে তবুও নির্গুণ মেল-বহির্ভূত পাত্রে কন্যা সমর্পণ করা হইবে না বলিয়া ঘোষণা করায়, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, দ্বাদশোর্দ্ধবয়স্কা এবং পাত্রাপেক্ষা অধিকবয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহণ নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ, আর দৃষ্টরজস্কা অনূঢ়াকন্যা গৃহে রাখিলে তাঁহার পিতৃপুরুষ ও জ্ঞাতিবর্গ সকলেই নরকস্থ হইবে।

তিথিতত্ত্বে তিনি আর্য্যঋষিগণের প্রণোদিত তিথি বিশেষে নিষিদ্ধ আহার্য্য বস্তুর সম্যক্ আলোচনা করায়, তাঁহার নিয়মই সমাজে বিশেষরূপে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়।

রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব প্রকাশের পরই তিনি পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য গয়াক্ষেত্রে যাত্রা করেন। তিনি গয়ায় উপস্থিত হইয়া, পিণ্ডদান করণ জন্য মন্দিরে প্রবিষ্ট হইতে উদ্যত হইলে, মন্দিরাধ্যক্ষ পাণ্ডারা তাঁহার নিকট অসঙ্গত কর চাহেন। রঘুনন্দন তাহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া যান এবং এক ক্রোশ পরিমিত গয়াক্ষেত্রের পরিমাণ বলিয়া, তিনি প্রান্তরে গিয়া পিণ্ডদান করিতে উদ্যত হইলেন। এদিকে পাণ্ডারা যখন শুনিলেন যে, ইনি নবদ্বীপের "স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য", তখন তাঁহারা চমকিত ও মহাভীত হইয়া তাঁহাকে পুনরানয়ন জন্য তদুদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা বুঝিয়া-

---

* যথা—"কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাঽপ্রদত্তা গৃহে বসেৎ। ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বরয়েৎ স্বয়ং॥ অঙ্গিরাঃ। প্রাপ্তেতু দ্বাদশে বর্ষে যদা কন্যা ন দীয়তে। তদা তস্যাস্তু কন্যায়াঃ পিতা পিবতি শোণিতং॥

রাজমার্ত্তণ্ডে—সম্প্রাপ্তে দ্বাদশে বর্ষে কন্যাং যো ন প্রযচ্ছতি। মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতং। মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈবচ। এবস্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাং॥ যস্তুতাং বিবহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ। অসম্ভাষ্যো হ্যপাঙ্ক্তেয়ঃ স জ্ঞেয়ো বৃষলীপতিঃ॥ (উদ্বাহতত্ত্ব)

ছিলেন যে, যদি রঘুনন্দন ঐরূপ স্থানে পিণ্ড দিয়া যান, তাহা হইলে আর কেহ আসিয়া মন্দিরে শ্রাদ্ধাদি করিবে না। অনন্তর তাঁহারা রঘুনন্দনকে অনেক স্তব ও স্তুতি করিয়া আনিয়া শ্রীমন্দিরে শ্রাদ্ধাদি করাইলেন। পাঠক! দেখুন, এখন রঘুনন্দনের মত কি প্রবল-রূপে প্রচারিত হইয়াছে। পাণ্ডারা মনে করিয়াছিলেন যে, রঘুনন্দন যাহা করিবেন, তাহাই প্রচলিত হইবে। ইহা সামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতি স্মৃতি-তত্ত্ব ভিন্ন "রাসযাত্রাপদ্ধতি", "সঙ্কল্পচন্দ্রিকা", "ত্রিপুষ্করাশান্তিতত্ত্ব", "দ্বাদশযাত্রা প্রমাণতত্ত্ব" নামে কয়েকখানি স্মৃতিপুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঐ সকল পুস্তকে কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তির এবং কি প্রগাঢ় যুক্তি ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন! কি শুভক্ষণেই তিনি বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! তাঁহার জন্মগ্রহণে হিন্দুসমাজে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল এবং সংস্কৃত-সাহিত্য আলোচনার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। যতদিন পৃথিবীতে সংস্কৃতসাহিত্য বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন রঘুনন্দনের নাম কখনই বিলুপ্ত হইবার নহে। তিনি "স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য" এই আখ্যায় আখ্যাত হইয়া, অবিনশ্বরকীর্ত্তিরূপ শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গবাসীর হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছেন। এইরূপ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়াও তিনি অহঙ্কৃত ছিলেন না। তিথিতত্ত্বের শেষে লিখিয়াছেন :—

"বিরুদ্ধং গুরুবাক্যস্য যদত্র ভাষিতং ময়া
তৎক্ষন্তব্যং বুধৈরেব স্মৃতিতত্ত্ব বুভুৎসয়া।
স্মৃতিতত্ত্বে প্রমাদাদ্যদ্বিরুদ্ধং বহুভাষিতং
গুণ লেশানুরাগেণ তচ্ছোধ্যং ধর্ম্মদর্শিভিঃ॥

এইরূপে রঘুনন্দন আজীবন শাস্ত্রালোচনায় থাকিয়া, প্রায় সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রমকালে কালকবলে পতিত হন। এক্ষণে নবদ্বীপে রঘুনন্দনের বংশ নাই।

কাশিরাম বাচস্পতি ও শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈতের বংশীয় রাধামোহন গোস্বামী এই অষ্টাবিংশতি তত্ত্বান্তর্গত কতিপয় গ্রন্থের দুইখানি টীকা করিয়াছেন। কাশিরাম বাচস্পতি আপনাকে, সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণ রামকৃষ্ণের পৌত্র ও রাধাবল্লভের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রাদ্ধতত্ত্বের টীকার সমাপ্তিকালে কাশিরাম বাচস্পতি লিখিয়াছেন :—

"যং প্রাসূত সমস্তশাস্ত্রনিপুণ রামকৃষ্ণাত্মজঃ
শ্রীরাধোত্তরবল্লভাখ্য সুকৃতী প্রজ্ঞাসুচূড়ামণিঃ
তেন শ্রীযুক্ত কাশিরাম কৃতিনা যত্নেন নিষ্পাদিতা
টীকানাতিসুশৃঙ্খলাপিকৃতিভিঃ সানুগ্রহৈ দৃশ্যতাং।"

(বিশ্বকোষ হইতে সঙ্কলিত)

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের বংশাবলী।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য।

স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি।*

তর্কচূড়ামণি মহাশয় স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক স্থানে পণ্ডিতসমাজে তর্কচূড়ামণি মহাশয় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুকবি এবং আলঙ্কারিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

দিনাজপুরের অন্তর্গত রাজারামপুর গ্রামে পৈতৃক বাটীতে ৺তর্কচূড়ামণি মহাশয় বাঙ্গালা ১২৪৮ সালের ২রা বৈশাখ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। রাজারামপুর গ্রামটি দিনাজপুর সহরের এবং দিনাজপুরের রাজবাটীর সন্নিকটে অবস্থিত। এ গ্রামটীর অবস্থা পূর্ব্বে বেশ উন্নত ছিল এবং অনেকগুলি অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণের বাস ছিল। এক্ষণে অন্যান্য অনেক পল্লীগ্রামের ন্যায় এ গ্রামটির অবস্থাও অনেক পরিমাণে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই বংশানুক্রমে সুপণ্ডিত ছিলেন। দিনাজপুরের কোন কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনার সহিত এই বংশের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমি তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের জীবন-বৃত্তান্তের সংশ্রবে এই বংশ সম্বন্ধে দুই একটি ঘটনার অবতারণা করিব। ভরসা করি যাঁহারা ঐতিহাসিক, তাঁহাদিগের নিকট ইহা অপ্রীতিকর হইবে না।

দিনাজপুরের স্থায়ী অধিবাসিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ অতি বিরল; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এবং অধ্যাপকের বংশ দিনাজপুরে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তর্কচূড়ামণি মহাশয় নিজবাটীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান করিতেন এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণও ঐরূপ চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহুদিন হইতে এই সৎকার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে দিনাজপুরের ন্যায় বিদ্যাহীন স্থানে রাজারামপুরের এই ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বংশই বহুদিন ধরিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিদ্যাদান করিয়া ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছিলেন। আমি অতি আহ্লাদসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পরও তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত সারদাচন্দ্র কবিভূষণ মহাশয় স্বগৃহে পূর্ব্ববৎ চতুষ্পাঠী রক্ষা করিয়া ছাত্রগণকে বিদ্যাদান করিতেছেন।

মহেশচন্দ্রের পিতা ৺ঈশানচন্দ্র ন্যায়রত্ন ৩২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গঙ্গালাভ করেন। তৎকালে মহেশচন্দ্রের বয়স ৫ বৎসর মাত্র। মহেশচন্দ্রের অপর দুই ভ্রাতা হরচন্দ্র ও গিরিশ চন্দ্রও তৎকালে বালক ছিলেন। তাঁহাদিগের মাতা হরসুন্দরী দেবী সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা ছিলেন। সে সময়ে বালকদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করা যেরূপ দুরূহ ব্যাপার ছিল, তাহা স্মরণ

---

* ইহার চিত্র পত্রিকার প্রথমে দ্রষ্টব্য।

করিলে হরসুন্দরী দেবী আপন পুত্রগণের শিক্ষার জন্য যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এতদঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না, এবং ইংরাজি শিক্ষা ব্রাহ্মণদিগের অকর্ত্তব্য বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস ছিল। দিনাজপুরে ইংরাজীশিক্ষা সম্বন্ধে রাজারামপুরের এই ব্রাহ্মণবংশই পথপ্রদর্শক। এই বংশ যেরূপ পণ্ডিতের বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, সেইরূপ দিনাজপুরের রাজপুরোহিত-বংশ বলিয়া ইহাদিগের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। মহেশচন্দ্রের খুল্লতাত বিজয়চন্দ্র এই বংশের একজন কীর্ত্তিমান্ পুরুষ ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন—যেরূপ সংস্কৃত শিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়, সেইরূপ ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনও অত্যাবশ্যকীয়। তাই তিনি সাধারনের প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তদানীন্তন স্থানীয় রাজপুরুষগণের সহায়তায় দিনাজপুরে প্রথম ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং মহেশচন্দ্রের অগ্রজ গিরিশচন্দ্রকে ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ইনি কিছু দিন এই বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া কলিকাতায় গিয়া পাঠ সমাপন করেন এবং দিনাজপুরের অধিবাসিগণের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম বি, এ পরীক্ষায় এবং তৎপরে বি, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মহেশচন্দ্রের সর্ব্বাগ্রজ হরচন্দ্রও কিছু দিন সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ইংরাজী শিক্ষা করেন, এবং তিনিও বি, এ এবং বি, এল্, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই উভয় ভ্রাতাই দিনাজপুরে প্রতিষ্ঠার সহিত আইন ব্যবসায় করেন। এক্ষণে উভয়েই পরলোকগত। বিজয়চন্দ্রের এই কার্য্যে ব্রাহ্মণদিগের ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে যে বিরাগ ছিল, তাহা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়। বিজয়চন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয়ে যাঁহারা প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অদ্যাপি কেহ কেহ বর্ত্তমান আছেন। ইংরাজি ১৮৫৪ সালে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, * এবং এই বিদ্যালয়ই আজ কাল জেলা স্কুল রূপে পরিণত হইয়াছে।

* দিনাজপুর ইংরাজী বিদ্যালয় ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ১২৬০ সালের ১লা বৈশাখ তারিখের রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"ইংরেজী ১৮৫২ সালের জানুয়ারিমাসে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হিন্দুকালেজের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইংরেজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া এ পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী রাজসভাপণ্ডিত মহাশয় স্বয়ং সুপরিশ্রম সহকারে বঙ্গভাষা শিক্ষা দিয়া যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, প্রধান সদর আমীন মেং জেমস্ রেলীং মহাশয় স্কুলের প্রতি বিলক্ষণ অনুরাগী আছেন, সুতরাং সাহেব এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র।" রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ ১৮৫৩ সাল, ১২ এপ্রেল, ২৮৩ সংখ্যা।

এতদ্ব্যতীত বিজয় চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় দিনাজপুর ভূম্যধিকারি-সভার প্রথম সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। রঙ্গপুর ভূম্যধিকারি-সভার উদ্‌যোক্তৃবর্গই ঐ সভা স্থাপনের জন্য অগ্রণী হইয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে রঙ্গপুর বার্ত্তাবহের ঐ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"আমরা দিন দিন আনন্দপ্রবাহে বিনীত হইতেছি, আমাদিগের সন্নিহিত প্রাচীন রাজনগর জিলা দিনাজপুর এত কালের পর বুঝি সুন্দর সুসভ্য স্থল হইল। অভিনবীনা দিনাজপুর ভূম্যধিকারি-সভা অতি সুনিয়মে চলিতেছে; আগামী ৬ বৈশাখ রবিবার ঐ সভার প্রথম ত্রৈমাসিক বৈঠক হইবেক, সর্ব্বত্র সভার সুযোগ্য সম্পাদক

মহেশচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে স্বগ্রামে নিজ কুলপুরোহিত ৺গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। সতের বৎসর বয়ঃক্রমে ব্যাকরণ, ভট্টি, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্য সমাপনান্তে তিনি নবদ্বীপে মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট নব্য-ন্যায় অধ্যয়ন করিতে গমন করেন। তৎপর কলিকাতায় গিয়া সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকটে অলঙ্কার প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন এবং পুনরায় নবদ্বীপে আসিয়া ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে অধ্যয়ন সমাপনান্তে মহেশচন্দ্র স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তর্কচূড়ামণি এবং তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় যে সময় কলিকাতা নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে অধ্যয়ন করিতেন, তখন দিনাজপুর হইতে ঐ সকল স্থানে যাতায়াত অতি কষ্টকর ছিল। তৎকালে উত্তর বঙ্গের বর্ত্তমান রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই; রাজমহল হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেলপথ ছিল। সুতরাং দিনাজপুর হইতে হয় নৌকাযোগে, না হয় রাজমহল হইয়া রেলপথে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইত। পথের দুর্গমতা হেতু সে কালে অনেকেরই কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে গিয়া বিদ্যাভ্যাস করা ঘটিয়া উঠিত না। তখন কলিকাতাও বড় সুখের স্থান ছিল না; গ্যাসের আলো, জলের কল, বৈদ্যুতিক আলোক, ট্রামগাড়ী প্রভৃতি আধুনিক কলিকাতার বিলাসের সামগ্রীগুলি কিছুই ছিল না। তৎকালে দুর্গন্ধময় বড় বড় ড্রেন, ময়লা এবং অস্বাস্থ্য কলিকাতার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাসকালে মহেশচন্দ্র বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন, তাঁহার অবস্থা ক্রমে অতিশয় শঙ্কাজনক হইয়া উঠে। দৈবক্রমে স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে ডাকা হইলে তিনি মাত্র এক দাগ ঔষধ দিয়া বলিয়া যান, যদি ইহাতে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে যেন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয়, নতুবা আর সংবাদ দিবার প্রয়োজন নাই। মঙ্গলময়ের কৃপায় ঐ এক দাগ ঔষধই ধন্বন্তরির ন্যায় কাজ করিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি বলিলেন, আর ঔষধের প্রয়োজন নাই। যিনি সকল রোগের এক মাত্র ঔষধ, তিনিই রোগীকে রোগমুক্ত করিবেন। এইরূপে কেবল মাত্র ভগবানের কৃপায় তাঁহার জীবন রক্ষা হয়।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় বাল্যকাল হইতেই তাঁহার পিতৃপিতামহাদির ন্যায় চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত এবং স্থাপত্য বিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন। তিনি নিজে সেতার প্রভৃতি যন্ত্রে বেশ

শ্রীযুত বিভয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বাক্ষরিত নিমন্ত্রণপত্র বিতরিত হইতেছে। বর্ণিত সভার জনৈক অধ্যক্ষ রঙ্গপুরবাসী শ্রীযুত ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী (মন্থনার জমিদার) এবং সহকারি-সভাপতি শ্রীযুত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী (কুণ্ডীগোপালপুরের জমিদার) মহাশয় এবারে সভাস্থ হইতে গমন করিবেন কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না ও সভার উপযুক্ত তত্ত্বাবধারক রঙ্গপুর ভূম্যধিকারি-সভার সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুত বাবু তারক চন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয় আগত ৪ বৈশাখ ডাকযোগে দিনাজপুর যাত্রা করিবেন" ইত্যাদি।

সুরেন্দ্র।

পারদর্শী ছিলেন এবং অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। গীতবাদ্য তাঁহার নিকট এত প্রিয় ছিল যে, তিনি নিজ পুত্রকে অসঙ্কোচে গান শুনাইবার জন্য অনেক সময়ে অনুরোধ করিতেন। বিদ্যার্থীদিগের অধ্যাপনা কার্য্যে তিনি যতদূর আনন্দ লাভ করিতেন, জীবনে তিনি অন্য কোনও কার্য্যে এত আনন্দানুভব করিতেন না। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন অন্যান্য কার্য্যে বিরত থাকিলেও, ছাত্রগণকে পাঠ দেওয়ার কার্য্য সহজে ছাড়িতেন না। যখন ছাত্রদিগের অধ্যাপনা করিতেন তখন মনে হইত, তিনি তন্ময় হইয়া সংসার ভুলিয়া গিয়াছেন, সাহিত্যরসে ডুবিয়া গিয়াছেন।

আমাদিগের দেশের প্রচলিত বিশ্বাস এইরূপ যে, দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বাঙ্গালা ভাষাকে বড় আদরের চক্ষে দেখেন না এবং অনেক সময় অতি তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তর্ক-চূড়ামণি মহাশয় সে শ্রেণীর পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় একখানি মহাকাব্য রচনা করেন। গ্রন্থখানির নাম "নিবাতকবচবধ"। মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত "নিবাত-কবচবধ" ইহার মূল এবং তদবলম্বনে গ্রন্থকার খাঁটি সংস্কৃত মহাকাব্যের লক্ষণানুসারে এই গ্রন্থের প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে সকল সমালোচনা হইয়াছিল, তাহারই মধ্য হইতে কথঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলেই উহার পরিচয় দেওয়া হইবে;—"এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, বীর করুণ-রৌদ্রাদি-নবরস-বিশিষ্ট নানালঙ্কার-সমন্বিত বিবিধ ছন্দোবন্ধে বিরচিত এবং সর্গাদিতে বিভক্ত গ্রন্থের নাম মহাকাব্য। সংস্কৃতে মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত গ্রন্থ সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে মাঘ এবং ভারবি। বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত ঐরূপ গ্রন্থ ছিল না। এই নিবাত কবচ বধ তাঁহার প্রথম উদ্যম।" সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কমল বিদ্যাম্বুধি ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহোদয় "নিবাতকবচবধ" সম্বন্ধে তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন,"সংস্কৃত ভাষাতে কিরূপ কাব্য রচনা করে, ইহা বাঙ্গালায় যতদূর সম্ভব তুমি এক প্রকার অতি বিচিত্র নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছ।" অপর এক স্থানে লিখিয়াছেন "ফলতঃ তুমি যে অভিপ্রায়ে গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, অর্থাৎ সংস্কৃত কবিদিগের রচনা প্রণালী বাঙ্গালা ভাষায় অভিনয় করিবে, সে অভিপ্রায় আমার মতে সুসিদ্ধ হইয়াছে। শব্দবিন্যাস সর্ব্বত্রই অতি পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ।"

সুতরাং "নিবাত কবচ বধ" বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটি নুতন রত্ন প্রদান করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে এবং সংস্কৃতের দিক্‌টা একেবারে বাদ দিয়া বঙ্গসাহিত্যের দিক্ হইতে দেখিলেও তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের স্থান সাহিত্যজগতে অতি উচ্চ, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। নিবাতকবচবধ সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত এবং অতি বৃহৎ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনার দ্বারা এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক মনে করিয়া তাহাতে বিরত রহিলাম।

নিবাত কবচ বধ ব্যতীত তিনি আরও একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের নাম "রস কাদম্বিনী"। ইহা সংস্কৃত অমরুশতক কাব্যের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ। কবি

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে অমরুশতক সম্বন্ধে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে "কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে অন্তঃকরণে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হয়, অমরুশতকের কোন কোন অংশ পাঠেও তদনুরূপ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ অমরু যে একজন অতি প্রধান কবি ছিলেন তাহার কোন সংশয় নাই। অমরু অধিক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই যথার্থ বটে; কিন্তু তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার প্রধান কবি বলিয়া চিরস্মরণীয় হইবার সম্পূর্ণ সংস্থান হইয়াছে।"

কবি বলিতেছেন "এই সরস শতক খানি গাঢ় সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত হওয়াতে—সাধারণে ইহার রসাস্বাদ করিতে পারেন না, এই হেতু আমি বাঙ্গালা পদ্যে এই কাব্যের অনুবাদ করিলাম।" সুতরাং তর্কচূড়ামণি মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যের অনন্ত খনি হইতে দুই একটী রত্ন উঠাইয়া বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার অলঙ্কৃত করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়-মান হয়।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় সংস্কৃতে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। "কাব্যপেটিকা" ও "ভগবচ্ছতক" তাঁহার রচনা-মাধুর্য্যের এবং কবিত্ব-শক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহা ব্যতীত তিনি সংস্কৃতে "দিনাজপুর-রাজবংশ" এবং "ভূদেব-চরিত" রচনা করেন। এই গ্রন্থদ্বয় দুর্ভাগ্যবশতঃ অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পিতামহ ৺কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের রচিত ধীরানন্দ তরঙ্গিণী নামক একখানি সংস্কৃত চম্পূ কাব্য তিনি নিজের টীকাসহ প্রকাশ করেন। "পরমাণুবাদ ব্যবস্থাপনা" তাঁহার রচিত ন্যায়প্রবন্ধ। ইহা ব্যতীত "নলোদয়" নামক একখানি মহাকাব্য এবং প্রাকৃত পিঙ্গল টীকা এবং মেঘদূত টীকা তিনি রচনা করেন কিন্তু প্রকাশিত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির বিস্তৃত সমালোচনা এই ক্ষুদ্রপ্রবন্ধ-মধ্যে সম্ভবপর নহে এবং আমার তদ্রূপ শক্তিও নাই। তথাপি তাঁহার কবিত্বের এবং রচনানৈপুণ্যের নিদর্শন স্বরূপ দুই এক স্থান হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতে সাহসী হইতেছি। এই সকল উদ্ধৃত অংশ হইতে ইহাই বুঝা যাইবে যে, তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে কেবল পণ্ডিতচূড়ামণি ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ ছিল, এবং যখনই সুযোগ হইত তখনই তিনি ভগবৎ-স্তুতি দ্বারা আনন্দানুভব করিতেন। তাঁহার রচিত "ভগবচ্ছতকম্" নামক গ্রন্থখানি তাঁহার ভগবৎ-প্রেমের এবং সহৃদয়তার বিশেষ পরিচায়ক। বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া তিনি মাতাকে সাক্ষাৎ দেবী বলিয়া মনে করিতেন এবং জগতের পিতামাতা এবং নিজ পিতা-মাতাকে অভেদ জ্ঞান করিতেন। বালকগণকে তিনি সর্ব্বদাই এইরূপ উপদেশ দিতেন যে, পিতামাতার সেবা এবং তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তিই ভগবানের প্রতি ভক্তি। তাই ভগবচ্ছতক গ্রন্থখানি রচনা করিয়া তিনি স্বীয় পিতা ঈশান চন্দ্রের নামে উৎসর্গ করিয়া বলিতেছেন ;—

ঈশান চন্দ্রভূষণ, লোকস্য পিতর্গৃহাণ দেবেদম্।
ভগবচ্ছতকম্ নাম, স্তোত্রং দত্তং প্রসীদ চমে॥

পঞ্চবিংশতি শ্লোকে বলিতেছেন ;—

পিতাসি দেহং জনয়ন্মমেদং।
মন্নেন পুষ্পন্ বিপদশ্চ রক্ষন্,
জ্ঞানোপদেশেন মনুষ্য ভাবং॥
মাম্প্রাপয়ংশ্চাসি মহাগুরুস্ত্বম্॥

এস্থলে স্বীয় জনককে লক্ষ্য করিয়াই বিশ্বপিতা পরমেশ্বরের নিকট আত্মনিবেদন জানাইতেছেন। ভগবচ্ছতকের প্রথম শ্লোকটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পিতা যেরূপ পুত্রের সহিত লুকোচুরি খেলিয়া থাকে, কবিও যেন পরম পিতার সহিত খেলা করিতেছেন। তাই বলিতেছেন ;—

অন্তর্ধ্বংসে নয়ন বিষয়া দৃষ্ট দৃষ্টোঽপি সদ্যো
হস্তাদ্ভ্রশ্যন্নিব ধৃত ধৃতোঽপ্যাশু দূরম্প্রয়াসি।
জ্ঞাত জ্ঞাতোঽপ্যাপ সরসিচ স্বান্ত বৃত্তেরকস্মাৎ
কস্ত্বং ক্রীড়ন্নিব মমপুরো ব্যজ্যসে সীয়সে চ॥

এই শ্লোকটির সৌন্দর্য্য প্রকৃত ভাবুকের নিকট অতি চমৎকার বলিয়া বোধ হইবে, এতৎ সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নাই। কবি এই শ্লোকটিতে যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা যিনি সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন তিনিই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। পরম পিতা পরমেশ্বরের সহিত ক্রীড়াচ্ছলে অতি সুন্দররূপে ভক্ত সাধকের মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই "ভগবচ্ছতক" গ্রন্থে কবি ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দর্শন শাস্ত্রের নানারূপ মতামত উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়া পরিশেষে আপ্তবাক্য সম্বন্ধে যে মত স্থাপন করিয়াছেন, তাহাও অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। কবি বলিতেছেন :—

"পিতৈব ধাতা পিতুরেব বাক্যং
শ্রুতি স্মৃতিস্থং মত মাপ্ত বাক্যং
তদেব মে মুখ্যতম্যং প্রমাণং
তদেব সম্যগ্বিদিতং হি বেদঃ॥

এস্থলেও পিতৃবাক্যই বেদবাক্যতুল্য, তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন। বাহুল্য ভয়ে এই গ্রন্থ হইতে অন্যান্য অনেক সুন্দর স্তোত্র উদ্ধৃত করিতে বিরত রহিলাম।

নবদ্বীপে অধ্যয়ন-কালে তর্কচূড়ামণি মহাশয় একটি গঙ্গাষ্টক রচনা করিয়াছিলেন। তাহা তৎপ্রণীত কাব্যপেটিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। স্তোত্র রচনার মাধুর্য্য এবং সৌন্দর্য্য এই গঙ্গাষ্টকে কিরূপ ফুটিয়াছে, তাহাই দেখাইবার জন্য নিম্নে ঐ অষ্টকের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

বেদ পুরাণ স্মৃতয়োঽপারং ব্রুবতে তব মহিমানং।
কিং গণয়সি ভিয় মুদ্ধর্ত্তুং মামপি কৃত বহু পাপ্‌মানং॥
যাবদ্‌ গুরু বা যাবদ্‌ বহুবা পাপং ক্ষমসে হর্ত্তুং।
তাবদ্‌ গুরুবা বহুবা কোঽপি ন পাপং ক্ষমতে কর্ত্তুং॥

এই অষ্টকের পদলালিত্য এবং সৌন্দর্য্য এই উদ্ধৃত অংশ হইতেই উত্তমরূপে পরিস্ফুট হইতেছে। কাব্যপেটিকা গ্রন্থখানি অতি বৃহৎ গ্রন্থ এবং দুই খণ্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থস্থিত শ্লোকগুলির রচনাকৌশল এবং পদলালিত্য অতি সুন্দর। ভাষার কোনরূপ জটিলতা নাই এবং সংস্কৃতে অতি সাধারণ জ্ঞান থাকিলেই. শ্লোকগুলির অর্থ বোধ হয়। জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা এবং ভক্তিপ্রদর্শনচ্ছলে কবি লবণসমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী মণির অপ্রস্তুত প্রশংসা দ্বারা বলিতেছেন :—

বদ্ধঃ শৈবল তন্তুভিঃ কৃমিধিয়া লীঢ়োজ্ঝিতঃ কচ্ছপৈঃ।
পুচ্ছাগ্রৈস্তঃ শফরীভিরপ্যভিহতো বীচীভিরান্দোলিতঃ॥
আবর্ত্তৈ রপি ঘূর্ণিতঃ প্রণয়িভিঃ শম্বুকযূথৈঃ সমং।
ক্ষারোদন্বতি হন্ত তিষ্ঠতি জন্মভূপক্ষপাতী মণিঃ॥

অনুবাদ যথা,—

কভু শেওলার জালে জড়াইয়া বেঁধে ফেলে
কূর্ম্ম কভু পোকা ভেবে চাটিয়া উগরে।
পুঁটীও লেজের বাড়ী মেরে যায় তাড়াতাড়ি
ভীষণ তরঙ্গ কভু আন্দোলিত করে॥
কখন ঘুরায় পাক, যেন কুমারের চাক
তবু শামুকের সঙ্গে বন্ধুভাব পাতি।
লবণ-সাগরোদরে মুক্তারত্ন বাস করে
জনম-ভূমির প্রতি হ'য়ে পক্ষপাতী॥

লবণ-সমুদ্রের ভিতরে শম্বুকাদির সহিত প্রণয় স্থাপন করিয়া তরঙ্গের আন্দোলন-মধ্যে শেওলায় জড়িত হইয়া এমন কি পুঁটী মৎস্যেরও লাঙ্গুল-তাড়না সহ্য করিয়া এবং কূর্ম্মাদির কর্ত্তৃক ভক্ষিত এবং পশ্চাৎ উগরিত হইয়া মণি সমুদ্র ত্যাগ করিয়া যায় না ; পরন্তু সমুদ্র-মধ্যেই বাস করে।

কাব্যপেটিকার অনেক স্থল হইতেই এইরূপ সৌন্দর্য্যের এবং ভাবলালিত্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তাহাতে বিরত রহিলাম।

উক্ত চূড়ামণি মহাশয়ের পাণ্ডিত্য এবং কবিত্বের সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী হইব, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। এই হেতুতে আমাদের নিজের মতামত বাদ দিয়া ভিন্নদেশীয় পণ্ডিতগণের মতামতের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক। বোম্বাই কোলহাপুর-নিবাসী সুকবি

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আপ্পা শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"তর্কচূড়ামণি মহাশয় কাব্যরসের সাগর, গুণের আলয়, অলঙ্কারের বিহার ও প্রতিভা-কল্পলতার সুমিষ্ট ফল। ইঁহার পদবিন্যাসরীতি অতিশয় হৃদয়ঙ্গম। ইঁহার রচিত রামাষ্টক বড়ই মনোরম।" এইরূপ সমালোচনার পর ইঁহার কাব্যাদির সরলতা সম্বন্ধে আমাদিগের আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন বোধ করি না।

তর্কচূড়ামণির মাতৃভক্তির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার মাতা হরসুন্দরী দেবী প্রায় অশীতি বৎসর বয়সে কাশীলাভ করেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় মাতার কাশী-প্রাপ্তি-সংবাদে বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন, এবং যখন কোন বিষয়ে মাতার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইত, তখনই তিনি স্নেহ এবং ভক্তিতে আপ্লুত হইতেন। মাতার বৃদ্ধ বয়সে তিনি স্বহস্তে মাতৃসেবা করিয়া নিজকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতেন।

৪৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। এই ঘটনাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অতিশয় ধীরতার সহিত তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। অনেকেই তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু সে সকল উপদেশে তিনি অবহেলাই করিয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা, নিষ্ঠা এবং শাস্ত্রের প্রতি ভক্তি অবিচলিত ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাঁহার নির্ভীকতা। আজ বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের অধঃপতনের বিষয় চিন্তা করিয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। যে ব্রাহ্মণ একদিন সকল জাতির পূজনীয় ছিলেন, যে ব্রাহ্মণ একদিন সংসারের ঐহিক সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পারলৌকিক সুখের জন্য এবং অনাবিল আনন্দের রসাস্বাদ জন্য সংসারকে উপেক্ষা করিতেন, যে ব্রাহ্মণের চরিত্রবল এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য সমাজের শীর্ষস্থানে তাঁহার আসন ছিল,—আজ সেই ব্রাহ্মণ-সন্তানকে যখন সামান্য অর্থের লোভে পরপদে লুণ্ঠিত এবং পর-পদ সেবায় ব্যস্ত দেখিতে পাই তখন মনে হয়, ভারতবর্ষের বেদপুরাণাদি জ্ঞানের রক্ষক এবং ভারতবর্ষের গৌরব ব্রাহ্মণজাতির বংশধর বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্যতা তাহাদিগের নাই। আমাদিগের এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত মহাত্মার সম্বন্ধে আমরা একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, তিনি অর্থ বা সম্মানের খাতিরে কখনও নিজের স্বাধীনতা হারান নাই। যখন তিনি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন শেষ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন, সেই সময় তাঁহাকে চাকুরী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধপত্র আইসে; কিন্তু আর্থিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল না হইলেও, তিনি "চাকুরী" করিয়া নিজের স্বাধীনতা হারাইতে সম্মত হন নাই। তিনি নিজে যে মত প্রকৃত বলিয়া মনে করিতেন, স্বার্থের খাতিরে কখনও সে মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সম্মত হইতেন না। আমরা জানি, কোন কোন বিষয়ে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিবার জন্য কোন কোন বিষয়ী ব্যক্তি কর্ত্তৃক তিনি অত্যন্ত অনুরুদ্ধ হন এবং এইরূপে তাঁহাদিগের মতে মত দিলে তাঁহার বিশেষ উন্নতির এবং পদগৌরবের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যে মতটি তিনি অভ্রান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহা কেবল অন্যের খাতিরে এবং নিজ স্বার্থসিদ্ধির অনুরোধে

তিনি কখনই পরিবর্ত্তিত করিতে সম্মত হন নাই। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাষী ছিলেন; যাহা অন্যায় এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন, তাহা কোনরূপ প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া ন্যায়সঙ্গত এবং শাস্ত্রসম্মত বলিয়া "পাঁতি" দিতেন না। তাঁহার এইরূপ স্বাধীন অন্তঃকরণের জন্য এবং স্পষ্টভাষিতার জন্য সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত।

গত বৎসর হইতে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, এজন্য তিনি কিছু দিন কাশী-ধামে বাস করেন। সেখানেও পীড়িত অবস্থায় অনেকগুলি বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট গিয়া বিদ্যালাভ করিত। তিনি আনন্দিতচিত্তে রোগের যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া ছাত্রগণের অধ্যাপনা করিতেন। কাশীধাম হইতে প্রত্যাগত হওয়ার কিছু দিন পরে গত আষাঢ় মাস হইতে অধিকতর পীড়িত হইয়া পড়েন। পীড়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া গত ১৩১৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের ২২ তারিখে, বৃহস্পতিবারে তিনি এ পাপময় জগৎ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। অনন্ত-মঙ্গল-নিধান পরমদেব ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার আত্মা সচ্চিদানন্দ পর ব্রহ্মে লীন হউক।

শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বাভ্রবী কায়া।

উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে অদ্যাপি যে সকল পুরাকীর্ত্তির অভ্রান্ত নিদর্শন লোকলোচনের অগোচরে অগৌরবে কালযাপন করিতেছে, তন্মধ্যে নানা দেবদেবীর পুরাতন প্রস্তরমূর্ত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে এই সকল বিচিত্র পাষাণ-প্রতিমা সুরচিত দেবমন্দিরে সযত্নে সংস্থাপিত হইয়া নিয়ত যথাযোগ্য উপচারে অর্চ্চিত হইত;—যাত্রা মহোৎসবাদি উপলক্ষে, জনসমাজকে পুলকাঞ্চিত করিয়া, তাঁহাদের কর্ম্মক্লান্ত সাংসারিক জীবনেও সসীমের মধ্যে অসীমের অনন্তলীলা প্রকটিত করিয়া, ক্ষণকালের জন্য স্বর্গ-সৌভাগ্যের বিমল কিরণ বিচ্ছুরিত করিয়া দিত। এখন আর তাহা তেমন ভাবে দেদীপ্যমান দেখিবার উপায় নাই। কোনও স্থানে পুরাতন প্রসিদ্ধ রাজনগরের চিতাভস্মাচ্ছন্ন আধুনিক অরণ্যানির মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক প্রস্তর মাত্র দেবায়তনের আভাস প্রদান করিতেছে,—কচিৎ কোনও পুরাতন প্রতিমার ভগ্নাবশেষমাত্র সহসা ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়া পুরাতন স্মৃতিচিহ্ন উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেছে।

এ দেশের পুরাকীর্ত্তির তথ্য সংকলনে অগ্রসর হইতে হইলে, এই সকল পুরাতন দেব-মূর্ত্তির যেরূপ আলোচনা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, এখনও সেরূপ আলোচনা প্রবর্ত্তিত হইতে

পারে নাই; বরং এই শ্রেণীর স্মৃতিচিহ্ন অধিকাংশ স্থলেই প্রকারান্তরে উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে! এবার উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের বগুড়ার অধিবেশনে যে সকল পুরাতন দেবমূর্ত্তি ও তাহার ভগ্নাবশেষ প্রদর্শিত হইয়াছিল, সময়াভাবে তাহারও যথাযোগ্য আলোচনার অবসর উপস্থিত হইতে পারে নাই। একটি মূর্ত্তি বিশেষ ভাবে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা হরগৌরীমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। অধিবেশনের অত্যল্প কাল পরেই তাহা সভামণ্ডপ হইতে অপহৃত হইয়া গিয়াছে! কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই আর একটি অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তনের ঐরূপ মূর্ত্তি আবার বগুড়া অঞ্চলেই সহসা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সংবাদে যুগপৎ হর্ষবিষাদে আন্দোলিত হইয়া গৌড়ে উপনীত হইবামাত্র জানিতে পারিলাম, তথায় তুলসীহাটা থানার অধিকার-মধ্যে একটি পুরাতন সরোবরের পঙ্কোদ্ধার-সময়ে ঠিক ঐরূপ একটি দেবমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার পাদপীঠে পাঁচটি নাগরাক্ষর বর্ত্তমান আছে। বলা বাহুল্য, তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তর-মূর্ত্তির সন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া, তাহা দর্শন ও পরীক্ষা করিয়া অক্ষরাবলী পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠকালে পণ্ডিতবর রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। যখন পাদপীঠ সুমার্জ্জিত করিয়া নাগরাক্ষর পাঠ করিয়া বলিলাম "বাভ্রবী কায়া", তখন আমার ন্যায় পণ্ডিত মহাশয়ও হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বগুড়া প্রদেশে দুইটি এবং মালদহ প্রদেশে একটি এই মূর্ত্তি উপর্য্যুপরি আবিষ্কৃত হইয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছে,—এক সময়ে উত্তর বঙ্গের সকল স্থানেই এই দেবমূর্ত্তির পূজা প্রচলিত ছিল, এখন ইহার নাম পর্য্যন্তও বিস্মৃতি-গর্ভে বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে!

সে কোন্ সময়,—কি সূত্রে এই মূর্ত্তির পূজা এক সময়ে প্রচলিত থাকিয়া পরে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে,—এ সকল প্রশ্ন উপেক্ষা করিয়া আমাদিগের দেশের পুরাতত্ত্ব-সংকলন-কার্য্যে সফলকাম হইবার সম্ভাবনা নাই। দুরূহ হইলেও, তাহার রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য যথাসাধ্য আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে মালদহে যথাযোগ্য যন্ত্রাদির অসদ্ভাবে যে চিত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা নিতান্ত অস্পষ্ট। তদ্দ্বারা মূর্ত্তি-সৌন্দর্য্য প্রকটিত হওয়া দূরে থাকুক, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিও সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হয় নাই। সুতরাং মূর্ত্তির বর্ণনামাত্রই লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম।

মূর্ত্তি একখানি অনতিবৃহৎ কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত, তাহার বিপরীত পৃষ্ঠ অসমতল, নিম্নে একটি প্রস্তর কীলক—তদ্দ্বারা এই শ্রীমূর্ত্তি তাহার আসনে সংস্থাপিত ছিল। প্রস্তরফলকের যে পৃষ্ঠে মূর্ত্তি খোদিত, তাহাকে তিন অংশে বিভক্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সকলের নিম্নে পাদপীঠাংশ,—তাহার একদিকে এক নারীমূর্ত্তি,—অন্যদিকে কারুকার্য্য। পাদপীঠের উপরে যে অংশে শ্রীমূর্ত্তি খোদিত আছে, তাহার একদিকে বৃষ, অপরদিকে সিংহ। বৃষের উপরিভাগে আসনস্থ চতুর্ভুজ পুরুষ মূর্ত্তি,—তাহার বামপদ আসননিবিষ্ট দক্ষিণপদ আসন হইতে নিম্নভাগে দোদুল্যমান। এই শ্রীমূর্ত্তির বাম জানুকে আসন করিয়া একটি দ্বিভুজধারিণী নারীমূর্ত্তি উপবিষ্টা। তাহার বামহস্তে একটি আয়ুধ, দক্ষিণহস্ত

পুরুষমূর্ত্তিকে আবেষ্টন করিয়া তাহার দক্ষিণ অংসোপরি বিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। পুরুষ-মূর্ত্তির উপরের বামহস্তে সুদীর্ঘ ত্রিশূল, উপরের দক্ষিণ হস্তে ধুস্তূর-কলিকা;—নীচের দক্ষিণহস্তাঙ্গুলি নারীমূর্ত্তির চিবুক-সংলগ্ন, নীচের বামহস্ত নারীমূর্ত্তিকে আবেষ্টন করিয়া তাহার বামস্তনতলে সযত্নবিন্যস্ত। উভয় মূর্ত্তিই বিচিত্রকারুকার্য্য-খচিত-সূক্ষ্মবস্ত্র-পরিহিত, বিবিধ রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিত, এবং শিরোভূষণে বিভূষিত। পুরুষমূর্ত্তি ঈষৎ সহাস, নারীমূর্ত্তি ব্রীড়ান্বিত। ইহাতে যে শিল্প-কৌশল অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কাব্যের ন্যায় মধুময় হইয়াও নিরতিশয়িতরূপে অনির্ব্বচনীয়! এই শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়ের উপরিভাগে কারুকার্য্য-খচিত বৃত্তাভ "চালি" বা প্রতিমার চাল;—তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি স্তবপরায়ণ মূর্ত্তি, মধ্যস্থলে সিংহমুখ। পাদপীঠের অক্ষরপংক্তি পাঠে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, যদিও ইহাতে দুইটি শ্রীমূর্ত্তি বিদ্যমান তথাপি "মাতুরভ্যহিতত্বাৎ" ইহার নাম "বাভ্রবী কায়া"—এবং নারীমূর্ত্তিই মূল শ্রীমূর্ত্তি। এই পাষাণপ্রতিমা তাঁহারই অর্চ্চন-প্রথা সূচিত করিতেছে।

ঠিক এইরূপ না হইলেও, এই শ্রেণীর একটি যুগলমূর্ত্তির ধ্যান এখনও একেবারে অপ্রচলিত হইয়া পড়ে নাই। তাহা মহাদেবের ধ্যানাবলীর মধ্যে "তন্ত্রসারে" এইরূপ উল্লিখিত আছে। তৎ যথা—

"বন্ধূকাভং ত্রিনেত্রং শশিশকলধরং স্মেরবক্ত্রং বহস্তং
হস্তৈঃ শূলং কপালং বরদমভয়দং চারুহারং নমামি।
বামোরুস্তম্ভগায়াঃ করতলবিলসচ্চারুরক্তোৎপলায়াঃ
হস্তেনাশ্লিষ্টদেহং মণিময়বিলসদ্ভূষণায়াঃ প্রিয়ায়াঃ॥"

অপিচ

"বন্দে সিন্দূরবর্ণং মণিমুকুটলসচ্চারুচন্দ্রাবতংসং
ভালোদ্যন্নেত্রমীশং স্মিতমুখকমলং দিব্যভূষাঙ্গরাগং।
বামোরুস্থস্তপাণেররুণকুবলয়ং সংদধত্যাঃ প্রিয়ায়া
বৃত্তোত্তুঙ্গস্তনাগ্রে নিহিতকরতলং বেদটঙ্কেষ্টহস্তম্॥"

যে শ্রীমূর্ত্তি "বাভ্রবী কায়া" নামে পাদপীঠে স্পষ্টাক্ষরে খোদিত, তাহার সহিত উল্লিখিত কোনও ধ্যানেরই সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যে ধ্যানের সহিত সামঞ্জস্য হইতে পারে, সেইরূপ ধ্যান আমার অপরিজ্ঞাত। "বভ্রো মহাদেবস্য স্ত্রী বাভ্রবী" ইতি বাক্যে "দুর্গা" অর্থমাত্র সংক্ষেপে "শব্দকল্পদ্রুমে" উল্লিখিত আছে, এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যেও দুর্গা "বাভ্রবি" নামে সম্বোধিতা বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি "বাভ্রবী" নামে কখনও স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে অর্চ্চিতা হইতেন কিনা, তাহার কোনও প্রমাণ অবগত হইতে পারি নাই।

দুর্গার "বাভ্রবী" নাম কি চিরপ্রচলিত পুরাতন নাম? মার্কণ্ডেয় পুরাণ অতি

পুরাতন হইলে, তাহাতে "বাভ্রবি" এইরূপ সম্বোধন পদের উল্লেখ দেখিয়া তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এই নাম পুরাতন হইলেও, জনসমাজে পূর্ব্বাপর সমভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, অমরসিংহের "নামলিঙ্গানুশাসন" গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। যাহা অমরসিংহের বহুপূর্ব্বকাল হইতে সাহিত্যে ব্যবহৃত, এরূপ অনেক নামই "নামলিঙ্গানুশাসনে" উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা ধরিয়া পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ কোন কোন সুপণ্ডিত তর্ক করিয়া থাকেন, "ঐ সকল নাম নিশ্চয়ই অমরসিংহের পরবর্ত্তী কালে সৃষ্ট হইয়াছিল।" তাঁহারা প্রমাণস্থলে অমরসিংহের গ্রন্থপ্রতিজ্ঞার উল্লেখ করিয়া থাকেন। যথা—

"সমাহৃত্যান্যতন্ত্রাণি সংক্ষিপ্তৈঃ প্রতি সংস্কৃতৈঃ
সম্পূর্ণমুচ্যতে বর্গৈ র্নামলিঙ্গানুশাসনম্॥"

অমরসিংহ স্বকীয় গ্রন্থপ্রতিজ্ঞায় "সম্পূর্ণমুচ্যতে" কি অর্থে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তাহার সম্যক্ আলোচনার অভাবে, তাঁহার উক্তি বিবাদের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। অমরসিংহ একজন "শাব্দিক" বলিয়াই প্রসিদ্ধ; "শাব্দিক" ভিন্ন "নামলিঙ্গানুশাসনের ন্যায় গ্রন্থরচনা করা যে অসম্ভব ব্যাপার, তাহা সহজেই প্রতিভাত হয়। তিনি শব্দকে "নিত্য" বলিয়াই স্বীকার করিতেন। শব্দ নিত্য; তাহার প্রচলন নূতন হইতে পারে। এক সময়ে প্রচলিত, এক সময়ে অপ্রচলিত, এবং পুনরায় প্রচলিত, এইরূপ ভাবে শব্দ সকল পুনঃ পুনঃ আমাদিগের সম্মুখীন হইতেছে, ইহা অস্মদ্দেশের একটি প্রাচীন মত। সে যাহা হউক, অমরসিংহ স্বকীয় গ্রন্থে "সম্পূর্ণমুচ্যতে" প্রতিজ্ঞা করিয়াও, কি জন্য তাঁহার পূর্ব্বকাল হইতে সাহিত্যে প্রচলিত বহু শব্দের উল্লেখ করেন নাই, তাহার কারণ "ত্রিকাণ্ড শেষ"-কার পুরুষোত্তমদেব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। "ত্রিকাণ্ডশেষ" নামক গ্রন্থ অমরসিংহের গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে বিরচিত হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ পরিশিষ্ট রচনার প্রয়োজন কি, তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া পুরুষোত্তম দেব সংস্কৃত সাহিত্যের একটি মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—

"অলৌকিকত্বাদমরঃ স্বকোষে ন যানি নামানি সমুল্লিলেখ।
বিলোক্য তৈরপ্যধুনা প্রচারময়ং প্রযত্নঃ পুরুষোত্তমস্য॥"

অমরসিংহের সময়ে লৌকিক সাহিত্যে যাহা প্রচলিত ছিল না, তাঁহার পরবর্ত্তী কালে সেরূপ বহু শব্দের প্রচলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়াই, পুরুষোত্তমদেব পরিশিষ্টরচনার জন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন। এই স্বল্পাক্ষর-নিবদ্ধ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থসূচনাবাক্যের মধ্যেই সেই ঐতি-হাসিক তথ্য নিহিত হইয়া রহিয়াছে। অমরসিংহের "নামলিঙ্গানুশাসনে" দুর্গার "বাভ্রবী" নাম উল্লিখিত নাই; পুরুষোত্তমদেবের "ত্রিকাণ্ড শেষে" দুর্গার "বাভ্রবী" নাম উল্লিখিত আছে। সুতরাং পুরুষোত্তমদেবের সময়ে যে ইহা লোকসমাজে প্রচলিত ছিল, তাহাই সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইতেছে। ইহা এতকাল কেবল উভয় কোষগ্রন্থের তুল-

নায় সমালোচনাকালেই ধরা পড়িতে পারিত; কিন্তু "বাভ্রবী কান্না" বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে খোদিত অক্ষরাবলী সংযুক্ত মালদহের প্রস্তরমূর্ত্তি, এবং অবিকল তদাকারবিশিষ্ট বগুড়ার প্রস্তরমূর্ত্তিদ্বয় এক্ষণে পুরুষোত্তমদেবের উক্তির যাথার্থ্য প্রকটিত করিয়া দিল। এখন আবার কালপ্রভাবে এইরূপ আকারবিশিষ্ট প্রতিমার নির্ম্মাণ, প্রতিষ্ঠা বা পূজা জনসমাজে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে,—এমন কি তাহার ধ্যান পর্য্যন্ত লোকস্মৃতি হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে! তথাপি ইহার প্রচলন এবং অপ্রচলনের মধ্যে একটি রহস্যবিজড়িত পুরাতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহার আলোচনা প্রবর্ত্তিত হইবার সুসময় উপস্থিত।

কেবল এই একটি মূর্ত্তি কেন, সকল মূর্ত্তি ধরিয়াই পুরাতত্ত্বালোচনায় ব্যাপৃত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, এবং ইহা যখন উত্তরোত্তর উত্তরবঙ্গেই আবিষ্কৃত হইতেছে, তখন ইহার আলোচনা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য "উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনকেই" বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। সহসা তথ্য নির্ণয়ের জন্য ব্যগ্র না হইয়া, তথ্যনির্ণয়ের উপযোগী বিবরণ সংকলনের চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার প্রধান কার্য্য মূর্ত্তিবিবৃতি-সংকলন। উত্তরবঙ্গের বিবিধ স্থানে যে সকল মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহার বর্ণনা ও চিত্রসংযুক্ত বিবরণ ক্রমে সংগ্রহ করিতে পারিলে, আলোচনার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইবে। আমি ইহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন লেখককে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিবিবৃতি-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহাদিগের সংকলিত বিবরণ ক্রমে পত্রিকায় প্রকাশিত ও কালে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থনিবদ্ধ হইলে, ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের বর্ত্তমান দুর্গম পথ কিয়ৎপরিমাণে সুগম হইয়া পড়িবে। এই উপায়ে কেবল যে পূজাপদ্ধতির বিলুপ্ত তথ্যই আবিষ্কৃত হইবে তাহা নহে, বিবিধ লোক-ব্যবহার ও শিল্পকৌশলাদিও অভিব্যক্ত হইয়া পড়িবে। প্রত্যেক শ্রীমূর্ত্তির ভাস্কর্য্য-নৈপুণ্যের মূলতত্ত্বের যথাযথ বর্ণনা,—বসনভূষণাদির সচিত্র বিবরণ,—বাহনাদির যথোপযুক্ত পরিচয় একত্র সংকলিত হইলে, তদ্দ্বারা ইতিহাসের এক চিরাবরুদ্ধ তোরণদ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

রঙ্গপুরের জাগের গান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—•—০—•—

৩। কৃষ্ণের বড়শীতে মাছ ধরা।

ছিপছিপানি ৬৯ বিষ্টি পড়ে ঘাড়ে নিল ছিপ্ ৭০।
অন্তরে আগুন জ্বলে করিয়া ধিপ্ ধিপ্॥
বাঁও হাতে ৭১ বোল্লার চাক ৭২ ধরাত্ ৭৩ গুঁজে বাঁশী।
মাছ মারিতে চলে কাণাই মুখে মধুর হাসি॥
যেই ঘাটে সিন্নান করে রাধা বিনোদিনী।
সেই ঘাটে বড়্শী ফেলায় কাণাই গুণমণি॥
জলেতে ভাঁসিয়া পাতা ৭৪ করে টিপ্ ৭৫ টিপ্।
দুই হাতে টানিয়া কাণাই তুলিয়া ধরে ছিপ্॥
রাধা কয় কি এ মাছ রুই না কাতল ৭৬।
রুই মাছের মুড়া মিঠা আর মিঠা কোল ৭৭॥
কাণাই কয় কেনে মামী দেন জলের ছিটা ৭৮॥
তোমার কোল হতে কি মামী রুয়ের কোল ৭৯ মিটা॥
রাধা কয় কি কইস্ কাণাই শোন দশ কথা।
রুইয়ের মাথা ছাড়িয়া তুঞি খালু মোর মাথা॥
কি মাছ মারিতে আসিস্ নিতি ৮০ যমুনায়।
কত জন আইসে আর কত জন যায়॥
এ কেমন মাছ মারা বলি করে কাণাকাণি।
আমাকে লইয়া পাছত ৮১ হইবে টানাটানি॥

৬৯। ছিপছিপানি=টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি।
৭০। ছিপ=বড়শীর ছিপ্।
৭১। বাঁওহাতে=বামহস্তে।
৭২। বোল্লার চাক=বোলতার রসচক্র।
৭৩। ধরাত=ধড়াতে।
৭৪। পাতা=বড়শী মোনা।
৭৫। টিপটিপ=একবার ডুবে একবার ভাসে।
৭৬। কাতল=কাতলা মাছ।
৭৭। কোল=পেটী।
৭৮। জলের ছিটা=শীতার্ত্ত অস্নাত ব্যক্তির ছিটা অশান্তিকর।
৭৯। কোল=ক্রোড়।
৮০। নিতি=নিত্য।
৮১। পাছত=পশ্চাতে, পরে।

ছিপে টান দেও যখন তখন হয় গেয়ান ৮২।
ছিপে টান দেওয়া নয়রে তোর পরাণে মারা টান ॥
মাছের মুখে নাগে নারে এবড় বড়্শী।
বড়্শী নোয়ায় বড়্শী নোয়ায় এ মোর সাঁড়াশী ॥
বাঁকা বাঁকা দুইটা ভুরু তোমার দুইটা ছিপ।
নোহার বড়্শী তোমার ঐ চোকের টিপ্ ৮৩ ॥
জানি না কিছুইরে কাণাই জানি না কিছুই।
বুঝিয়া সুঝিয়া তোমার কিছুই না ছুঁই ॥
তঁওতো কেমন করি নাগিল বড়শী।
ঠারে ঠোরে কতই বোলে এ পাড়া পড়শী ॥
যৌবন জলে সুখে ভাসি পুঁটি মাছের মত।
মিঠার লোভে গিলনু বড়্শী এলা ৮৫ হয় হত।
মাতার উপর বিষ্টি পড়ে করিয়া টোপ্ টোপ্।
কি মাছ ধরিতে কাণাই ফেলাও এমন টোপ ॥
গোয়ালের ৮৪ ছাওয়াল তুমি খাও ননী ছানা।
অকারণে মার কেনে অবোধ মাছের ছানা ॥
বাড়ী যা'য়া ছানা ননী খাও পেট ভরি।
বাঁচুক মাছের ছানা বাঁচুক বউরি।
ভাগিনা হইয়া কেনে মামির ভিতি ৮৬ লোভ।
ভাল মানুষ দেখিলে পরে বড় হইবে ক্ষোভ ॥
অলপে অলপে যাও বাড়ীত চলিয়া।
হাড় ভাঙ্গিয়া দিবে যদি দেখে দেওয়ানিয়া ॥
এক ভিতি আছে নদী ও ভিতি ৮৭ ননদী।
কোন ভিতি যাইমেন কাণাই পরাণ বাচা'ন যদি ॥
কাণাই বলে কেনে ভয় দেখান নিতি নিতি।
তোমাকে ছাড়িয়া মামী যাম কোন ভিতি ॥
তরাসে কাঁপিছে গাও ডরে কাঁপে মাথা।
তোমার অঙ্গে লুকাইম কে ধরিবে হেথা ॥

৮২। হয় গেয়ান = জ্ঞান হয়, মনে হয়।
৮৩। টিপ্ = কটাক্ষ।
৮৪। গোয়ালের ছাওয়াল = গোপনন্দন।
৮৫। এলা = এখন।
৮৬। ভিতি = দিকে।
৮৭। ও ভিতি = ওদিকে।

তোমার অঙ্গ কাঞ্চা সোণা সোণার উঠে ঢেউ।
তোমার অঙ্গে লুকাইলে না দেখিবে কেউ॥
সোণার অঙ্গে সোনার হারে শোভা নাহি হয়।
ছিঁড়ি ফেলাও কণ্ঠের হার কাকে কর ভয়॥
এই আমার বাহু দুইটী নীলমণির মত।
গলা জড়াইলে মামী শোভা হইবে কত॥
গলা জড়াইলে মামী বুকে পড়মো ৮৮ তোর।
সোনার অঙ্গে মাণিকের হার দেখিয়া হইমেন ভোর॥
হাসিতে হাসিতে রাধা জলত ৮৯ যা'য়া পড়ে।
আস্তে ব্যস্তে ধরে কাণাই নামিয়া জলের তোড়ে॥
রাধারে ধরিয়া কাণাই জলে দিল ডুব।
আজিকার পালা সারা সুখ হৈল খুব॥

রাস।

আশিন ৯০ গেইছে, ৯১ কাত্তিকের আ'জ গেল আধেক ৯২ দিন
রাত্তির কোণা ৯৩, একটুক্ বা'ড়্ছে, পাওয়া না যায় চিন্ ৯৪॥
গাদ্‌লা ৯৫ নাই, ঝড়ি ৯৬ নাই, কাশিয়ার ফুল ফুটে।
নাচিয়া বেড়ায় খঞ্জন গুলা ইত্তিউত্তি ৯৭ ছুটে॥
নদীর জল টল্‌টল্ দেখা যায় বালা।
মাথার উপর আকাশ খানি খালি সব নীলা॥
রাস্তায় ঘাঁটায় কাদো ৯৮ নাই খালি পায়ে যাও।
আনিতে হৈবেনা জল ধুবার লাগেনা পাও॥
শীত গীরিষ ৯৯ কিছুই নাই বড় মজার দিন।
মাছি নাই মশা নাই করেনা পিন্ পিন্॥

৮৮। পড়মো=পতিত হইব।
৮৯। জলত্=জলেতে।
৯০। আশিন—আশ্বিন মাস।
৯১। গেইছে=গিয়াছে।
৯২। আধেক—অর্দ্ধেক।
৯৩। রাত্তিরকোণা—রাত্রিটুকু।
৯৪। চিন্—চিহ্ন।
৯৫। গাদ্‌লা—বাদ্‌লা।
৯৬। ঝড়ি—বৃষ্টি।
৯৭। ইত্তিউত্তি—এদিক ওদিক।
৯৮। কাদো—কাদা, কর্দ্দম।
৯৯। গীরিষ—গ্রীষ্ম।

সাঞ্জের বেলা পুরুবদিগে, ঝলক দিয়া চান্দ।
আকাশের গায় উঠে, অই কেমন তার ছান্দ॥
গাছের উপর পড়ে জোনাক ১০০ রূপার গাছ করি।
পাতের উপরে জোনাকের খাটেনা কারিকুরি॥
নদীর জল জোনাক পায়া করে ঝক্ ঝক্।
বালুর চর কাশিয়ার ফুল জ্বলে চক্ চক্॥
জোনাকতে ভরিয়া গেল সমস্ত পির্থিমি ১০১।
আকাশতে তারা গুলা করে রিমি ঝিমি ১০২॥
সিঙ্গাহারের ১০৩ ফুলে ফুলে ঢাকিল সব বন।
সুবাস ১০৪ পা'য়া ঘরে থাকির ১০৫ কারো না হয় মন॥
সব ঠাঁই ছড়ায় বাস ফুর ফুরা বায় ১০৬।
লাখে লাখে ভ্রমরা উড়ে যুতি ফুলের গায়॥
এমন সময় নদীর কুলে বাঁশীত দিল শান।
গলে মালা চিকণ কালা করে রাধা রাধা গান॥
বাঁশীর সুরে ভাসিয়া গেল আকাশ পাতাল মাটি।
জাতি কুল ধরম করম ভাসিল সব মাটী॥
রূপসী যতেক ছিল ব্রজের বউরী।
সকলে বাহির হইল নাই কেউ বৈরী॥
সকলি মিলিল আসি নিকুঞ্জের বনে।
ডালি ভরি তুলি ফুল আনে জনে জনে॥
ফুলের কঙ্কণ পরে ফুলের নেপুর ১০৭।
ফুলের হার ফুলের তাড় সবে ভর পুর॥
কাণে দিল ফুলের কুণ্ডল মাথায় ফুলের সিঁতি।
ফুল সাজে সাজিল যতেক ব্রজের যুবতী॥
সবে বলে দেখাবো আজি কেমন চিকণ কালা।
চিনিয়া নেউক কাঁঞ্ তার রাধা সেই রূপসী বালা॥
চিন্তে যদি নাই পারে মা'র্মো ঠোক্না ১০৮ গালে।
এই কি তোমার ভালবাসা যাও গরুর পালে॥

১০০। জোনাক = জোৎস্না।
১০১। পির্থিমি = পৃথিবী।
১০২। রিমিঝিমি = টিপ্ টিপ্।
১০৩। সিঙ্গাহারের ফুলে = শেফালিকা পুষ্পে
১০৪। সুবাস = সুগন্ধ।
১০৫। থাকির = থাকিতে।
১০৬। বায় = বাতাস।
১০৭। নেপুর = নূপুর।
১০৮। ঠোক্না = আঙ্গুল দিয়া গালে মারা।

যার জন্যে ছাড়ি বন্ধু খাওয়া শোওয়া বইসা ১০৯ ।
তারে এখন চিননা যে কেমন ভালবাসা ॥
সে দিন যেমন দিন দুপরে ক'রচে বসন চুরি ।
আ'জ তার কাণ ধরিয়া দেখাম চাতুরী ॥
বান্ধ্‌ম ১১০ তার হাত দুখানি দিয়া নীল শাড়ী ।
সবার আগে ধরা চূড়া বাঁশী নিম ১১১ কাড়ি ॥
হাঁসিয়া হাঁসিয়া তবে দিমো ১১২ করতালি ।
নারীর হাটে নারীর হাতে কি করবেন বনমালী ॥
মাইয়া মানুষ ১১৩ দেখ্‌লে তার উচাটন মতি ।
ভাল করি হাউস ১১৪ মিটামো ১১৫ যতেক যুবতী ॥
মাইয়ামানুষ দেখ্‌লে তার জিভার পড়ে নাল ১১৭ !
এতেক যুবতীর সনে ধরুক দেখি তাল ॥
নীল শাড়ী চুরি করি বসিছিল ঠ্যালে ১১৭ ।
আ'জ তার পত্তিশোধ ১১৮ দিমো রাত্তির কালে ॥
নীল মেঘের মত হয় কালীয়ার রং ।
নীল শাড়ী করমো তারে করমো বড় রং ১১৯ ॥
সবাই পরমো তাকে ছিঁড়া ছিঁড়ি করি ।
দেখিমো কেমন করেন একেলা মুরারি ॥
এই যে কাচুলি গুলা বড় হইছে কশা ১২০ ।
একবার দিলে আর না যায় তাক্ খসা ॥
এগুলা ছিঁড়িয়া ফেলাও দুক্ষ ১২১ কর দূর ।
দেখিমো কালীয়া ছোঁড়ার কত বুক পুর ॥
কানুর হাতের তলা লাল পীঠির ভিতি নীল ।
সুন্দর কাঁচুলি হৈবে না হইবে ঢিল ১২২ ॥
দুইখানি কানুর হাত এতেক রমণী ।
দেখিমো দেখিমো কেমন করেন নীলমণি ॥

---

১০৯ । বইসা = বসা ।
১১০ । বান্ধ্‌ম = বাঁধিব ।
১১১ । নিমো = লইব ।
১১২ । দিমো = দিব ।
১১৩ । মাইয়া মানুষ = স্ত্রীলোক ।
১১৪ । হাউস = অভিলাষ ।
১১৫ । মিটাম = মিটাইব ।
১১৬ । নাল = মুখের লালা ।
১১৭ । ঠ্যালে = ডালে ।
১১৮ । পত্তিশোধ = প্রতিশোধ
১১৯ । রং = রঙ্গ ।
১২০ । কশা = আঁট আঁট !
১২১ । দুক্ষ = দুঃখ ।
১২২ । ঢিল = ঢিলা ।

একেবারে তুল্‌মো সবে রসের তুফান।
ঝগড়া নাই ঝাঁটি নাই সকলি সমান॥
গাছের আওরালে ১২৩ থাকি সব শুনিল কাণু।
হাস্‌তে হাস্‌তে আসিল কাণাই বাজাইয়া বেণু॥
কাণাই কয় মিলিছেন যতেক যুবতী।
আমার কারণে তোমরা কি ক'রলেন যুকতি॥
কাড়িয়া নিমেন ১২৪ পীতধড়া সাবাস সাবাস।
পীত বরণ তোমার উরাত ১২৫ হৈবে পীতবাস॥
কাণাইর কথা শুনি হাসিয়া আটখান।
এ পক্ষে উহার গায়ে ছুটি রসের বাণ॥
যতেক গোপিনী আছিল তত হৈল কাণু।
নাচিতে লাগিল সবে ডগ মগ তনু॥
পায়ের নেপুর বাজে হাতের কঙ্কণ।
মধুর বাঁশরী বাজায় মদন মোহন॥
নাচিতে নাচিতে উঠে গানের তরঙ্গ।
গভীর শব্দে বাজে রসের মৃদঙ্গ॥
ভুবন ভরিয়া গেল এ রসের গানে।
ভাঙ্গিল শিবের ধ্যান উঠে দেবী সনে॥
পঞ্চ মুখে গান গায় ডম্বরু বাজায়।
নাচে শিব ঠ্যাস্‌ ১২৬ দিয়া ভবানীর গায়॥
যত দেবী যত দেবা ১২৭ এ রাস হেরিয়া।
রথের উপরে সবে পড়ে মুরছিয়া॥
নাচিছে গোপিনী গণ নাচার নাই শেষ।
খুলিল মাথার খোপা ১২৮ আউলাইল ১২৯ কেশ
ছরমে ১৩০ সবার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম।
আপন অঞ্চলে তাহা মুছাইছে শাম॥
নাচিতে নাচিতে সবার ছিঁড়িয়া গেল ডুরি।
খসিল কাঁচুলি তাদের খইসে যেন শাড়ী॥

১২৩। আওরালে = আড়ালে।
১২৪। নিমেন = লইবেন।
১২৫। উরাত = উরু।
১২৬। ঠ্যাস দিয়া = অঙ্গের গায়ে অঙ্গ নির্ভর করিয়া।
১২৭। দেবা = দেব।
১২৮। খোপা = কবরী।
১২৯। আউলাইল = খুলিয়া গেল।
১৩০। ছরমে = শ্রমে।

সোগ ১৩১ ঠাঁই কাল জল কোন ঠাঁই নাই ॥
সমুদ্দুর ১৩২ হইছে ১৩৩ আ'জ আপনি কাণাই ॥
আদি নাই অন্ত নাই নাই কূল কিনার।
এ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে উঠে শক্তি কার ॥
গণিতে না পারি কত আসিছে কামিনী।
সগ্‌গুলি ১৩৪ হইছে নদী যতেক গোপিনী ॥
কামের বাতাসে সবার উঠিছে হিল্লোল।
রাসের তরঙ্গে সবার বাড়িছে কল্লোল ॥
সকল নারীর শিরা ১৩৫ কাণাইর সাধা ১৩৬।
আপনি হইছে গঙ্গা তায় গৌরী রাধা ॥
শত শত গোপিনী গাঙেরে ১৩৭ সঙ্গে করি।
ভাসেয়া ভুবন ধায় গঙ্গা হরি হরি ॥
ঝম্প দিয়া পড়ি মিশে সেই কালা জলে।
রতিরাম দাস রাস গায় কুতূহলে ॥
কাণাই ধামালি ১৩৮ পালা এত দূরে সারা।
বৈষ্ণবেতে গাও হরি শাক্তে গাও তারা ॥
ব্রাহ্মণের শ্রীপাদ পদ্মে করি পরণাম ১৩৯।
নিবেদন করে দাস জাতি নাম ধাম ॥
পুরব ১৪০ দিগেতে ১৪১ ব্রহ্মপুত্রের মেলানি ১৪২।
পশ্চিমে কুশাই ১৪৩ গঙ্গা আছয়ে ছড়ানি ১৪৪ ॥
উত্তরেতে গিরিরাজ দক্ষিণে বাঙ্গালা।
যে দেশে কিরিপা ১৪৫ করে কামাক্ষ্যা মঙ্গলা ॥
করতোয়া শিবের বিভার ১৪৬ হস্তজল।
মধ্য দিয়া বয়া ১৪৭ যায় করি টল টল ॥

১৩১। সোগ = সকল।
১৩২। সমুদ্দুর = সমুদ্র।
১৩৩। হইছে = হইয়াছে।
১৩৪ সগ্‌গুলি = সকলি।
১৩৫ শিরা = শ্রেষ্ঠ।
১৩৬ সাধা = কাণাই যাঁর সাধনা করিয়াছেন।
১৩৭ গাঙেরে = নদীগুলিকে।
১৩৮ ধামালী = ক্রীড়া।
১৩৯। পরণাম = প্রণাম।
১৪০। পুরব = পূর্ব্ব।
১৪১। দিগেতে = দিকেতে।
১৪২। মেলানি = গমন।
১৪৩। কুশাই = কৌশিকী।
১৪৪। ছড়ানি = ছাড়িয়া।
১৪৫। কিরিপা = কৃপা।
১৪৬। বিভার = বিবাহের।
১৪৭। বয়া = বহিয়া।

করতোয়ার তীরে আছে শীলাদেবীর ঘাট।
পরশুরামের আছে সেখানেতে পাঠ ১৪৮॥
পৌষ মাঘে হয় যদি নারায়ণী যোগ।
শতেক যোজন হ'তে আইসে কত লোক॥
এই সীমার মাঝে দেশ পোণ দুয়ার ১৪৯ খিতি ১৫০।
এ দেশে আমাদের জাতির বসতি॥
হায়রে রাজার বংশে লভিয়া জনম।
পরশু রামের ভয় এ বড় সরম॥
রণে ভঙ্গ দিয়া মোরা এ দেশে আইসাছি ১৫১।
ভঙ্গ ক্ষত্রি রাজবংশী এই নামে আছি॥
ব্রাহ্মণেরে দেখি যেন ১৫২ দেবতার মত।
ব্রাহ্মণেতে নারায়ণে নাহি কিছু ভেদ॥
এই দেশে ঘোড়াঘাট-রঙ্গপুর * জেলা।
যে জেলা করিছে বঙ্গদেশের উজলা॥
এ জেলার শেষ রাজা রাজা নীলাম্বর।+
ভোট চীন ব্রহ্মা ১৫৩ আদি যারে দিলা কর॥

১৪৮। পাঠ=পীঠস্থান।
১৪৯। পোণদুয়ার=পৌণ্ড্র।
১৫০। খিতি=ক্ষিতি।
১৫১। আইসাছি=আসিয়াছি।
১৫২। যেন—উচ্চারণ=য্যান্।
১৫৩। ব্রহ্মা=ব্রহ্মদেশ

* ঘোড়াঘাট-রঙ্গপুর—রঙ্গপুর প্রদেশ মুসলমান আমলের পূর্ব্বে কামতাপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; এই সময়ে ঘোড়াঘাট এ অঞ্চলের একটী প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া বিখ্যাত হয়। রাজা নীলাম্বর ঘোড়াঘাটের গড় ও অনেক কীর্ত্তি স্থাপন করেন। পরে মুসলমান আমলে এই ঘোড়াঘাট এ অঞ্চলের রাজধানী হয়; ইংরেজ আমলের প্রথমেও ঘোড়াঘাট রঙ্গপুরের সদর ছিল।

+ কামতাপুরের ১ম রাজা নীলধ্বজ। ইনিই ১৫৫০—৬০ শকাব্দে কামতাপুর রাজধানীর পত্তন করেন। ইনি প্রথমে বগুড়া জেলার এক ব্রাহ্মণের গোপালক ছিলেন; কালে ধর্ম্মপালের তদানীন্তন বংশধর দুর্ব্বল হওয়ায় তাঁহাকে বধ করিয়া নীলধ্বজ রাজা হন। নীলধ্বজের পুত্র চক্রধ্বজ পরে তৎপুত্র নীলাম্বর রাজা হন। নীলাম্বরের মন্ত্রীপুত্র রাণীর প্রতি আসক্ত হওয়ায়, রাজা তাহাকে বধ করিয়া সেই মাংস মন্ত্রীকে খাওয়ান। মন্ত্রী এ কথা জানিতে পাইয়া নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া রাজসংসর্গ পরিত্যাগ করতঃ গোপনে গৌড়েশ্বর হুসেন সার নিকট প্রতিশোধ লইবার জন্ত সাহায্য প্রার্থনা করেন। নবাব বহু সৈন্ত সামন্ত লইয়া কামতপুর যাত্রা করেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া গেল, কিন্তু রাজা কিছুতেই পরাজিত হইলেন না। ভাবিতে বিস্মিত হইতে হয় যে, হুসেন সা নাকি ক্রমাগত ১২ বৎসর কাল এই নগর অবরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু দীর্ঘকাল অবরোধেও রাজার কোনরূপ কাতরতা প্রকাশ পায় নাই। মুসলমানেরা এত দীর্ঘকাল অবরোধেও যখন রাজার কিছুই করিতে পারিল না, তখন কৌশল অবলম্বন করিল। রাজাকে সংবাদ পাঠান হইল যে, মুসলমানেরা অবরোধ উঠাইয়া লইবে, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে মুসলমান রমণীগণ রাণীদের সঙ্গে একবার দেখা করিতে চাহেন। নীলাম্বর এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু কপট মুসলমানেরা দোলায় স্ত্রীলোক না পাঠাইয়া কতকগুলি সশস্ত্র যোদ্ধা পাঠাইল। তাহারা দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগর অধিকার করিল ও রাজাকে বন্দী করিল। সেই হইতে কামতাপুরের অবনতি।

যার তলোয়ারে প্রাণ দিয়াছিল গাজি ১৫৪।
যার ভয়ে পলাইল কত কত কাজি॥
শেষেতে কারসাজি ১৫৫ করে সাজি নারীবেশ।
সেই হাতে পুড়ি গেল এই পুণ্য দেশ॥
পরে নরনারায়ণ হৈল পুন রাজা। *
ভোট ব্রহ্মা আদি তার পুন হইল প্রজা॥
সেই শিব বংশে জন্ম রাজা পরীক্ষিৎ। +
রঙ্গপুরের ১৫৬ পূর্ব্ব ভাগে যার ছিল স্থিত ১৫৭॥
যে চাতুরী অস্তরে ১৫৮ নিয়াছে ভারত।
সেই চাতুরীতে তারে কৈল হস্তগত॥
সেই হ'তে দিল্লীর বাদসাহা হৈল রাজা।
প্রজাগুলা পূর্ব্বের মত নাহি থাকে তাজা॥
নিজের ভগিনী দিয়া বাদসাহের কাছে।
মানসিংহ পাইল মান এইরূপ ছাঁচে ১৫৯॥

১৫৪। গাজি=ইস্মাইলগাজি।
১৫৫। কারসাজি=কপটতা।
১৫৬। রঙ্গপুরের পূর্ব্বভাগ=কামরূপ।
১৫৭। স্থিত—স্থিতি।
১৫৮। অস্তরে—অস্ত্রে।
১৫৯। ছাঁচে=ধরণে।

* শিববংশীয় কুচবিহার রাজের মূলপুরুষ—বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক মুসলমান-কবল হইতে কামতাবিহারের উদ্ধার সাধন হয়। বিশ্বসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র নরনারায়ণ কামতাবিহারের রাজা হন। ইঁহার রাজ্যের সীমা পূর্ব্বে স্বর্ণকোষী ও পশ্চিমে করতোয়া। এই নরনারায়ণ হইতেই কুচবিহারের সর্ব্বপ্রথম 'নারায়ণ' মুদ্রা প্রচলিত হয়।

+ রাজা নরনারায়ণের কনিষ্ঠের নাম শুক্লধ্বজ বা চিলারায় তৎপুত্র রঘুদেব। এই রঘুদেবের পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ। শুক্লধ্বজের মৃত্যুর পর নরনারায়ণ অপুত্রক থাকায়, রঘুদেবকে পোষ্য লয়েন। পোষ্য লওয়ার কিছুদিন পর রাজার একটী পুত্র হয়। ইহাতে রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় নিরাশ হইয়া রঘুদেব তলে তলে বিদ্রোহী হন; এবং পূর্ব্বাঞ্চলের শত্রুদিগের সহিত মিলিত হইয়া জ্যেষ্ঠতাতের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু পরে ভীত হইয়া পলাইয়া যান। এই ঘটনার পর হইতে স্বর্ণকোষী নদীর পূর্ব্ব হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত রঘুদেব রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র পরীক্ষিৎ রাজা হয়েন। পরীক্ষিৎ সমগ্র রাজ্যের রাজা হইয়া গদাধর তীরস্থ গিলাঝাড় নামক স্থানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার সময়ে ঢাকার মুসলমান শাসনকর্ত্তা ইঁহার নিকট রাজস্ব চাহেন ও পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। পরীক্ষিত ভীত হইয়া মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া আগ্রার সম্রাটের নিকট গমন করেন। সেখান হইতে ঢাকার নবাবের উপর আদেশ আনেন যে, রাজা যেমন রাজস্ব দিতে পারগ হন, নবাব তাহাই লইতে বাধ্য হইবেন। রাজা আসিয়া সরল মনে নবাবের নিকট একেবারে দুই কোটি টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। তাঁহার মন্ত্রী এই বিষয় জানিয়া তাঁহাকে মুসলমানের অসঙ্গত অর্থ লোভের কথা জানাইলে, তিনি ভীত হয়েন; শেষে যুক্তি করিয়া পুনরায় সম্রাটের নিকট গিয়া এই ভ্রম সংশোধন করিয়া আনিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে পাটনায় বা রাজমহলে রাজার মৃত্যু হইল। এই সুযোগে ঢাকার নবাবসৈন্য প্রতিশ্রুত অর্থের অছিলায় রাজ্য অধিকার করিল। এই ঘটনা প্রায় ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে ঘটে। তৎপর মানসিংহ বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা হয়েন।

রঙ্গপুরে ফতেপুর প্রকাণ্ড চাকেলা।
রাজারায় রাজা তায় আছিল একেলা॥
ধর্ম্মে মতি রাজারায় কত কৈল দান।
ব্রহ্মোত্তর ভূমি কত ব্রাহ্মণেতে পান॥
ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর আর বৈষ্ণোত্তর আদি।
কতদান করিয়াছে নাহি যে অবধি॥
মন্থনা বামনডাঙ্গা প্রভৃতি পরগণা।
ফতেপুরের অন্তর্গত সব যায় গণা॥
অনুগত ব্রাহ্মণ জানিয়া কৈল দান।
ফতেপুরের এত বড় এই জন্যে মান॥
কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং।
সে সময়ে মলুকেতে হৈল বার টিং ১৬০॥
যেমন যে দেবতার মূরতি গঠন।
তেমনি হইল তার ভূষণ বাহন॥
রাজার পাপেতে হৈলো মুলুক আকাল ১৬১।
শিওরে রাখিয়া টাকা গৃহী ১৬২ মারা গেল ১৬৩
কত যে খাজানা পাইবে তার নেকা নাই ১৬৪।
যত পারে তত নেয় আরো বলে চাই॥
দেও দেও চাই চাই এই মাত্র বোল।
মাইরের চোটেতে উঠে ক্রন্দনের রোল॥
মানীর সম্মান নাই মানী জমিদার।
ছোট বড় নাই সবে করে হাহাকার॥
সোয়ারিত ১৬৫ চড়িয়া যায় পাইকে মারে জোতা ১৬৬।
দেবীসিংহের কাছে আজ সবে হ'লো ভোঁতা ১৬৭॥
পারে না যাঁটায় চল্‌তে ঝিউরী বউরী।
দেবীসিংহের লোকে নেয় তাকে জোর করি॥

১৬০। বারটিং = হররাম প্রভৃতি সহচর।
১৬১। আকাল – দুর্ভিক্ষ।
১৬২। গৃহী = গৃহস্থ।
১৬৩। গেল = উঃ = গ্যাল।
১৬৪। নেকা = স্থাক: = লেখা।
১৬৫। সোয়ারিত্‌ = সোয়ারিতে = পাল্কিতে।
১৬৬। জোতা = জুতা।
১৬৭। ভোঁতা = অকর্ম্মণ্য।

পূর্ণ কলি অবতার দেবীসিংহ রাজা ।
দেবীসিংএর উপদ্রবে প্রজা ভাজা ভাজা ॥ *
রাজারায়ের পুত্র হয় শিবচন্দ্র রায় ।
শিবের সমান বলি সর্ব্ব লোকে গায় ॥
ইটাকুমারিতে তার আছে রাজবাটী ।
দেখিতে প্রকাণ্ড বড় অতি পরিপাটী ॥
কত ঘর কত দুয়ার কত যে আঙ্গিনা ।
তার সনে কোন বাড়ীর তুলনা লাগে না ॥
বড় ঘর চণ্ডীমণ্ডপ টুঁই ১৬৮ অতি উঁচা ।
দুই চালে ঘর খানি কোণা গুলা নীচা ॥

* দেবীসিংহ হররামকে খাজানা আদায় জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। 'হররাম আসিয়াই সকল জমিদারকে তলব দিলেন। সকলেই জমা বৃদ্ধির কবুলতী দিতে অস্বীকার করিলেন। তখন হররাম তাঁহাদের প্রতি প্রহারের আজ্ঞা দিলেন এবং তাঁহাদিগকে ঢাক বাজাইয়া বৃষভারোহণে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিতে বলিলেন। সামাজিক শাসনে এরূপ দণ্ডে জাতিচ্যুত হইতে হইত। দুই চারি জন জমিদারের এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া বাকি সকল জমিদারই কবুলতী দিলেন। কবুলতী দিবার পরেই টাকা আদায় আরম্ভ হইল। কেহই টাকা দিতে পারিলেন না। জমিদারদিগের জমি নামমাত্র মূল্যে দেবীসিংহ বেনামীতে স্বয়ং কিনিয়া লইতে লাগিলেন। তাহাতেও সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায় হইল না। কাজেই তখন জমিদারবর্গ বেত্রাঘাত সহ্য করিতে লাগিলেন। কাহারও টাকা নাই, প্রহারে অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া অসংখ্য লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার পর কৃষকদের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। উপায়াস্তর না দেখিয়া কৃষককুল দেশত্যাগ করিতে বাঞ্ছা করিল। হররাম তাহা নিবারণ করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে প্রাহারা রাখিল। আবার এই প্রাহারা-ওয়ালাদের বেতন দিবার জন্য 'চৌকবন্দি' নামক নূতন করের সৃষ্টি হইল। দিনাজপুরে দেবীসিংহ অষ্টাদশ প্রকারের কর আদায় করিতেছিলেন, হররাম রঙ্গপুরে একবিংশতি প্রকারের কর সৃষ্টি করিল।

এইরূপ অত্যাচার করিয়া হররাম কিছু আদায় করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু দেবীসিংহের তাহাতে মন উঠিল না। তবে হররামের কার্য্যপটুত্বে তাঁহার কোন দিন অবিশ্বাস জন্মে নাই, তথায় সূর্য্যনারায়ণ নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। সূর্য্যনারায়ণ আসিয়া রৌদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। জমিদারদিগের ত কথাই নাই, স্ত্রীলোকদিগের উপরেও ভয়ানক অত্যাচার হইতে লাগিল। অন্তঃপুরচারিণীগণ প্রকাশ্য স্থানে আনীত হইতে লাগিলেন। দেবীসিংহের অনুচর বর্গ বল পূর্ব্বক সেই সকল কুলকামিনীর অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করিয়া অলঙ্কার উন্মোচন করিতে লাগিল। কখনও বা তাঁহাদিগকে বিবস্ত্র অবস্থায় সাধারণের সম্মুখে দণ্ডায়মান রাখা হইল। স্ত্রীজাতির শেষ অপমান, সর্ব্ব সমক্ষে তাহাও সংঘটিত হইতে লাগিল। ক্ষোভে, রোষে, অপমানে, কত সহস্র কুলললনা আত্মহত্যা করিয়াছেন, কে জানে? কত উষ্ণশ্বাস উঠিয়া ঈশ্বরের সিংহাসন উত্তপ্ত করিয়াছে, কে বলিবে? তাঁহাদিগকে বিবস্ত্র করিয়া বেত্রাঘাত করা হইত। বংশ খণ্ড অর্দ্ধচন্দ্রাকারে চাঁচিয়া তাহার দুই প্রান্ত স্তনদ্বয়ে বিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত, বংশদণ্ড স্তন ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইত।" "মূর্চ্ছিত হইয়া রমণীগণ ভূতলে পতিত হইলে রক্তস্রোতে ধরাতল সিক্ত হইত। ** তাহার পর দুর্বৃত্তেরা এই নিপীড়িত রমণীগণের ক্ষত বিক্ষত দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে মশাল ও গুলের আগুন ধরাইয়া দিত।" এইরূপ ভাবে তাঁহাদের জীবন শেষ হইত। তাই মহাত্মা এডমান বর্ক বৃটিশ মহাসভায় ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, "আমার বিশ্বাস এরূপ ভয়ানক অত্যাচার ও উৎপীড়ন কাহিনী দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাস আর কখনও কলঙ্কিত হয় নাই; এমন কি অসভ্যযুগেও কোনও যথেচ্ছাচারী রাজা কিম্বা শোণিতলোলুপ উন্মত্ত ঘাতকবর্গে দ্বারাও এমন নৃশংস কাণ্ডের সূচনা হয় নাই।"

১৬৮। টুঁই = চালের অগ্রভাগ।

পশ্চিম দুয়ারী মণ্ডপ আর কোন খানে নাই।
এ ঘর হাতে যে ঘর হইবে সেটাও দেখবার পাই॥
কত পাইক পেয়াদা আছে কত দারোয়ান।
কত যে আমলা আছে কত দেওয়ান।
মন্থনার কর্ত্রী জয়দুর্গা চৌধুরাণী।
বড় বুদ্ধি বড় তেজ সকলে বাখানি॥
শিবচন্দ্রের কাজ কর্ম্ম তার বুদ্ধি নিয়া।
তার বুদ্ধির পতিষ্ঠা ১৬৯ করে সকল ১৭০ দুনিয়া ১৭১॥
আকালে দুনিয়া গেল দেবী চায় টাকা।
মারি ধরি লুট করে বদ্‌মাইস পাকা॥
শিবচন্দ্রের হৃদে এই সব দুক্ষ বাজে।
জয়দুর্গার আজ্ঞায় শিবচন্দ্র সাজে॥
দেবীসিঙ্গের দরবারে শিবচন্দ্র গেল।
প্রজার দুস্কের কথা কহিতে লাগিল॥
রজ্‌পুত কালাভূত দেবিসিং হয়।
চেহারায় মৈষাসুর হইল পরাজয়॥
শু'নে চক্ষু কট্‌ মট্‌ লাল হৈল রাগে।
'কৌন্‌ হ্যায় কৌন্‌ হ্যায়' বলি দেবী হাঁকে॥
শিবচন্দ্রক কয়েদ করে দিয়া পায়ে বেড়ি।
শিবচন্দ্র রাজা থাকে কয়েদখানাত্‌ পড়ি॥
দেওয়ান শুনিয়া পরে অনেক টাকা দিয়া।
ইটাকুমারিত আনে শিবে উদ্ধারিয়া॥
বৈদ্যবংশ চন্দ্র শিবচন্দ্র মহাশয়।
দেবীসিঙ্গের অত্যাচার আর নাহি সয়॥
রঙ্গপুরে আছিল যতেক জমিদার।
সবাকে লিখিল পত্র সেঠ্‌টে ১৭২ আসিবার॥
নিজ এলাকার আর ভিন্ন এলাকার।
সকল প্রজাক ডাকে রোকা ১৭৩ দিয়া তার॥
হাতি ঘোড়া বরকন্দাজে ইটাকুমারী ভরে।

১৬৯। পতিষ্ঠ=প্রতিষ্ঠা।
১৭০। সকল=সকল।
১৭১। দুনিয়া=পৃথিবী।
১৭২। সেঠ্‌টে=সেইখানে।
১৭৩। রোকা=ক্ষুদ্রচিঠি অনাবৃত পত্র

সব জমিদার আইসে শিবচন্দ্রের ঘরে ॥
পীরগাছার কর্ত্তী আইল জয়দুর্গা দেবী।
জগমোহনতে ১৭৩ বৈসে একে একে সবি॥
রাইয়ৎ প্রজারা সবে থাকে খাড়া হৈয়া।
হাত জুড়ি চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইয়া॥
পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরণে নাই বাস।
চামে ঢাকা হাড় কয়খান করি উপবাস ॥ *
শিবচন্দ্র খাড়া হইয়া কয় হাত জোড়ে।
রাগেতে কহিতে কথা চক্ষে জল পড়ে ॥
প্রজাদেক দেখাইয়া জমিদার গণে।
এদের দুস্ক না ভাবিয়া অন্ন খা'ন কেনে ॥
উত্তর হাতে জল আসিয়া বড় নাগে বাণ।
সেই বাণে খা'য়া ফেলায় যত কিছু ধান ॥
কত দিনে কত কষ্টে কত টাকা দিয়া।
ক্যারোয়ার মুখ ১৭৪ আমি দিয়াছি বান্ধিয়া।
রাজার পাপে প্রজা নষ্ট দেওয়ার নাই জল।
মাঠে ধান জ্বলিয়া গেল ঘরে নাই সম্বল।
বচ্ছরে বচ্ছরে ১৭৫ এলা হইতেছে আকাল।
চালে নাই খেড় ১৭৬ কারো ঘরে নাই চা'ল ১৭৭ ॥
মাও ছাড়ে বাপ ছাড়ে ছাড়ে নিজের মাইয়া ১৭৮।
বেটা ছাড়ে বেটি ছাড়ে নাই কারো মায়া ১৭৯।

* দেবীসিংহের অত্যাচারে সেই সমস্ত দরিদ্রব্যক্তি কিরূপ উৎপীড়িত হইয়াছিল, তাহাদের অবস্থা কতদূর শোচনীয় হইয়াছিল. তাহা দেবীসিংহের নিজের কথাতেই উত্তমরূপ প্রতীয়মান হয়। দরিদ্রের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াও যখন তিনি অর্থ সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন তিনি মনোদুঃখে লিখিয়া ছিলেন,—"বড়ই বিড়ম্বনার বিষয় যে.—বলিতে কি রঙ্গপুরের কৃষকগণের মধ্যে যেরূপ ভয়ানক অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, বোধ হয়, বঙ্গের অন্য কোনও স্থানে সেরূপ হয় নাই ; যে সময়ে তাহাদের ক্ষেত্রে শস্যাদি জন্মে, সে সময় ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে তাহাদের গৃহে এক কপর্দ্দক মূল্যের দ্রব্যও দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহারা প্রায় উপবাস করিয়াই দিন কাটায় ; আর এই জন্যই দুর্ভিক্ষে অনেক লোক মারা পড়িতেছে ; তাহাদের সম্বলের মধ্যে দুই একটী মৃৎপাত্র এবং জীর্ণ-পর্ণ কুটীর। কুটীরগুলির অবস্থা এতই শোচনীয় যে, তাহার বিশ পঁচিশখানি বিক্রয় করিলেও দশটি টাকা সংগৃহীত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।"

১৭৩। জগমোহন—নাটমন্দির।
১৭৪। ক্যারোয়া মুখ—নদী বিশেষের মোনো।
১৭৫। বচ্ছরে বচ্ছরে—বৎসরে বৎসরে।
১৭৬। খ্যাড় খড়।
১৭৭। চা'ল—চাউল।
১৭৮। মাইয়া—পত্নী।
১৭৯। মায়া—মমতা।

দুষ্ট রাজা দেবীসিংহে বুঝাইতে গেলাম।
আমার পায়ে বেড়ী দিল দেওয়ানের গোলাম ১৮০ ॥
প্রজার অবস্থা দেখি যাক্ করিতে হয়।
কর জমিদারগণ তোম্‌রা মহাশয় ॥*
কারো মুখে নাই কথা হেটমুণ্ডে ১৮১ রয়।
রাগিয়া শিবচন্দ্র রায় পুনরায় কয় ॥
যেমন হারামজাদা রজপুত্‌ ডাকাইত।
খেদাও ১৮২ সর্ব্বায় তাক ঘাড়ে দিয়া হাত ॥
জ্বলিয়া উঠিল তবে জয়দুর্গা মাই।
তোমরা পুরুষ নও শকতি কি নাই ? ॥
মাইয়া হয়া জনমিয়া ধরিয়া উহারে।
খণ্ড খণ্ড কাটিবারে পারোঙ্‌ তলোয়ারে ॥
করিতে হৈবেনা আর কাহাকেও কিছু।
প্রজাগুলা করিবে সব হইব না নীচু ॥
রাগি কয় শিবচন্দ্র থর থর কাঁপে।
ফ্যাণা ১৮৩ ধরি উঠে যেমন রাগি গোঁমা সাঁপে ১৮৪ ॥
শিবচন্দ্র নন্দী কয় শুন প্রজাগণ।
রাজার তোমরা অন্ন তোমরাই ধন ॥
রঙ্গপুরে যাও সবে হাজার হাজার।
দেবীসিংহের বাড়ী লুট বাড়ী ভাঙ্গ তার ॥
পারিষদবর্গ সহ তারে ধরি আন।
আপন হস্তেতে তার কাটিয়া দিমো কাণ ॥

১৮০। দেওয়ানের গোলাম—দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহের গোলাম ইহাই বোধ হয় কবির বলিবার অভিসন্ধি।
১৮১। হেটমুণ্ডে—অধোমুখে।
১৮২। খেদাও—তাড়াও।
১৮৩। ফ্যাণা—ফণা
১৮৪। গোঁমা সাঁপে—গক্ষুর সর্পে।

* একটি নিঃস্বার্থ প্রজারঞ্জক অথচ নির্ভীক জমিদারের সুন্দর চিত্র শিবচন্দ্রের চিত্রে প্রতিফলিত দেখা যায়। বঙ্গে এইরূপ প্রজারঞ্জক জমিদারের অসদ্ভাব ছিল না। রাণী ভবানী প্রভৃতি অনেক প্রজারঞ্জক জমিদারের নাম করা যাইতে পারে। প্রজারাও সেইরূপ রাজভক্ত ছিল। এই কবিতাতেই দেখা যাইবে যে, যখন শিবচন্দ্র জমিদারদিগকে দেবীসিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে ছিলেন, তখন মন্থনা বা পীরগাছার জমিদার মহিষী জয়দুর্গা দেবী ব্যতীত সকলেই ভয়ে ভীত হইয়া নির্ব্বাক ছিলেন। বীর-নারী জয়দুর্গা শিবচন্দ্রকে যথেষ্ঠ উৎসাহ দিয়া নীরব জমিদারদিগকে যেরূপ ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, সে ভর্ৎসনা আধুনিক জমিদারদিগেরও প্রণিধান করিবার যোগ্য। শিবচন্দ্র যখন জমিদারগণের দ্বারা কোনই সাহায্য পাইবার আশা দেখিলেন না, তখন প্রজাদের নিকট প্রতীকার প্রার্থী হইলেন। ভক্ত প্রজারা জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ দলে দলে ধাবিত হইয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে সদলে দেবীসিংহকে তাড়াইয়া দিল।

শিবচন্দ্রের হুকুমেতে সব প্রজা ক্ষ্যাপে ১৮৫।
হাজার হাজার প্রজা ধায় এক ক্ষ্যাপে ১৮৬॥
নাঠি নিল খন্তি ১৮৭ নিল নিল কাচি ১৮৮ দাও।
আপত্য ১৮৯ করিতে আর না থাকিল কাঁও ১৯০॥
ঘাড়েতে বাঁকুয়া ১৯১ নিল হালের জোয়াল।
জাঙ্গলা বলিয়া সব চলিল কাঙ্গাল॥
চারি ভিতি হাতে আইল রঙ্গপুরে প্রজা।
ভদ্রগুলা আইল কেবল দেখিবার মজা॥
ইঁটা দিয়া পাইট্‌কা ১৯২ দিয়া পাটকেলায় ১৯৩ খুব।
চারি ভিতি হাতে পড়ে করিয়া ঝুপ ঝুপ॥
ইঁটায় ঢেলের চোটে ভাঙ্গিল কারো হাড়।
দিবীসিংএর বাড়ী হৈল ইটার পাহাড়॥
খিড়িকির দুয়ার দিয়া পলাইল দেবীসিং।
সাথে সাথে পালেয়া গেল সেই বারচিং॥
দেবীসিং পালাইল দিয়া গাও ঢাকা।
কেউ বলে মুর্শিদাবাদ কেউ বলে ঢাকা॥ *

১৮৫। ক্ষ্যাপে=ক্রুদ্ধ হয়।
১৮৬। এক ক্ষ্যাপে=এক একবারে।
১৮৭। খন্তি—মাটী খনন অস্ত্র।
১৮৮। কাচি=কাস্তে।
১৮৯। আপত্য—অনভিমত।
১৯০। কাঁও=কেহই।
১৯১। বাঁকুয়া=বাঁক।
১৯২। পাইট্‌কা=ইট।
১৯৩। পাট্‌ক্যালায়=ঢিল ছুড়ে।

* ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নিরীহ প্রজার যখন আর পলায়নেরও সুবিধা রহিল না, মরিবার ভয় দূর হইয়া গেল, তখন প্রজাবৎসল শিবচন্দ্রের উৎসাহ উত্তেজনা ও মন্ত্রণায় সকল প্রজা দেবীসিংহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। প্রতিজ্ঞা করিল, কেম্পোনির লোকদিগকে আর সেদেশে রাখিবে না, যে প্রকারে হউক তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে, না হয় আপনারা মরিবে।

"খৃষ্টান পুঙ্গব গুডলাড সাহেব আহার করেন আর নিদ্রা যান। কাজকর্ম্ম দেবীসিংহই করেন। দেবীসিংহের কীর্ত্তিকলাপ তিনি দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না, উৎকোচের মায়া কে পরিত্যাগ করে? যথাসময়ে গুডল্যাডের কর্ণে এ সকল সংবাদ পৌঁছিল। তিনি শুনিলেন, নূরলউদ্দিনকে প্রজারা 'নবাব' পদে বরণ করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। তিনি ত্বরায় লেফটেনান্ট ম্যাগডোনাল্‌ড সাহেবকে সৈন্যসহ প্রেরণ করিলেন। বিদ্রোহীদল এক স্থানে নাই, সাহেব কাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন? তখন গুডল্যাড এক হুকুম বাহির করিলেন যে, ম্যাক্‌ডোন্যাণ্ড যাহাকে ধরিবেন, তাহাকেই বধ করিতে পারিবেন। তাহাতেও বিদ্রোহ দমন হইল না। লেফ্‌টেনান্ট সাহেব শুনিলেন, নূরলউদ্দিন মোগলহাটে আছেন। তিনি সেই স্থানে যাত্রা করিলেন। নূরলউদ্দিন পঞ্চাশজন মাত্র লোক মোগলহাট লইয়াছিলেন। তাঁহার দলবল সকলেই পাটগ্রামে ছিল। ম্যাক্‌ডোন্যাণ্ড অতর্কিত ভাবে মোগলহাটে নূরলউদ্দিনকে আক্রমণ করিলেন। একটু ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইল, নূরলউদ্দিন আহত হইয়া অল্পদিনেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন, এবং নূরলউদ্দিনের দেওয়ান দয়াশীল হত হইলেন। এই সময়ে গুডল্যাড সাহেব প্রচার করিলেন যে, অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে প্রজার আর কোন ভয় নাই, রাজস্ব আদায়ের জন্য তাহাদের উপর আর কোন অত্যাচার হইবে না। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা যে হিসাবে খাজানা দিয়াছিল, তাহাই দিতে হইবে, খাজানা বৃদ্ধি রদ হইয়া

ইংরাজের হাতে রাজ্য দিলেন চক্রপাণি।
সুবিচার করি গেল আপনি কোম্পানি ॥
ইংরাজ বিচার করে এজলাস করি।
একে একে ফাটকেতে রাখে চিংএ ধরি ॥ *
সেই শিবচন্দ্র রাজা ইটাকুমারীর।
সেই গ্রামে বাস করি জানিবেন থির ১৯৪ ॥

যাইবে। এই কথা শুনিয়া প্রজাবর্গ গৃহে ফিরিল। * * যাহা হউক দেবীসিংহের অত্যাচারে নিরীহ বাঙ্গালী প্রজাও অস্ত্রধারণ করিয়াছিল।" এই কয়েকজন রঙ্গপুরের প্রজার জীবনদানের ফলেই সমস্ত বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্ত্তন হয় ইহা রঙ্গপুরবাসীর কম গৌরবের বিষয় নহে।

"রঙ্গপুর-বিদ্রোহ যত সহজে মিটিল, কথাটা তত শীঘ্র মিটিল না। কলিকাতা কৌন্সিলে এই বিদ্রোহের কারণ অবধারণ জন্য পিটারসন সাহেবকে রঙ্গপুরে প্রেরণ করিলেন। পিটারসন আসিয়া প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইলেন। শেষে তিনি জমিদারদিগকে হাজির হইতে ইস্তাহার দিলেন। অধিকাংশ জমিদারই দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল, একজন ব্যতীত কেহই হাজির হইল না। পিটারসন সাহেব তাহার জবানবন্দি লিখিতে গুডল্যাডের কাছে পাঠাইয়া দিলেন, গুডল্যাড্ তাহাকে দেবীসিংহের জিম্মা করিয়া দিলেন. ইহার পর আর কেহই সাক্ষ্য দিতে হাজির হয় নাই। পিটারসন জমা ওয়াশীল বাকী তলব করিলে দেবীসিংহ তাহা দাখিল করিল. গুডল্যাড সাহেব তাহার নকল রাখিবার ছলে তাহা চাহিয়া লইয়া গেল, আর ফিরাইয়া দিল না। এইরূপে নানারূপে ব্যর্থ মনোরথ হইয়াও পিটারসন সাহেব সব বুঝিতে পারিলেন ও তাঁহার মন্তব্য লিখিয়া দিলেন;" মন্তব্যের এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন যে, "আমার প্রথম পত্রে প্রজাবর্গের প্রতি কঠোর অত্যাচারের বিবরণ সাধারণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র। প্রজাগণের প্রধান অপরাধ এই যে, তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের প্রতি উৎপীড়নের যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, বিদ্রোহাচরণ ভিন্ন তাহাদের অন্য উপায় ছিল না। প্রজাদের নিকট হইতে যে উপায়ে রাজকর সংগৃহীত হইত, তাহা লুণ্ঠনের নামান্তর মাত্র; আনুষঙ্গিক অত্যাচার ও উৎপীড়নেরত কথাই নাই। এই সমস্ত অত্যাচার দুই পাঁচ জনের উপর নহে. প্রায় সকল লোককেই তাহা সহ্য করিতে হইত। কিন্তু অত্যাচার সহ্য করিবারও একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, সেই সীমা অতিক্রম করিলেই তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত চেষ্টা হয়। যখন এই সমস্ত নিরপরাধ প্রজাবর্গের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল, তথাপি তাহাদের গুরুতর করভারের অর্দ্ধাংশমাত্র পরিশোধিত হইল না,—অধিকন্তু তাহারা কঠোর শারীরিক দণ্ড ভোগ করিতে লাগিল, যখন সমাজচ্যুত করিবার জন্য তাহাদিগকে অতি জঘন্যভাবে অপমানিত করা হইল, তাহাদিগের মহিলাবর্গের সম্ভ্রম বিনষ্ট করা হইল, তখন তাহাদের মনের ভাব কিরূপ হইতে পারে. তাহা আপনারা বিবেচনা করিবেন।"

* কবি বলিতেছেন 'ইংরাজ 'সুবিচার করিলেন'। তাহার কারণ এই যে, হেষ্টিংস বেগতিক বুঝিয়া স্পষ্ট বক্তা মহাত্মা পিটারসন সাহেবকে মিথ্যাবাদী বলিয়া দণ্ডের জন্য এক নূতন কমিসন বসাইলেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কমিসন বসিল। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতে গবর্ণর জেনারল হইয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া রঙ্গপুর বিদ্রোহ সম্বন্ধে নানা কথা শুনিতে লাগিলেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কমিশনের কার্য্য শেষ হইল। দেবীসিংহকে বাধ্য রাখিবার জন্যই হউক, বা যে কোন কারণেই হউক, অনেকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। কাজেই দেবীসিংহের অপরাধ সাব্যস্ত হইল না। হররাম প্রভৃতি অত্যাচার করিয়াছিল; ইহাই প্রমাণীত হইল। তাঁহারা এক এক বৎসরের নিমিত্ত কারারুদ্ধ হইলেন। আমাদের সরল গ্রাম্য কবি অল্পেই সন্তুষ্ট। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ হররাম প্রভৃতি যে ইংরাজ কর্ত্তৃক দমিত হইবেন, কবি সে কল্পনা স্বপ্নেও করিতে পারেন নাই, তাই এ হেন লোককে কারাদণ্ডে দণ্ডিত দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক 'ইংরাজ সুবিচার করিলেন' বলিয়াছেন। আরও বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই হইতে ইংরেজের হস্তে রাজ্য আসিল।

১৯৪। থির—স্থির।

কুঁড়া ১৯৫ আছে বাঁশদহ নদী আলাইকুড়ী।
কালী আছেন জাগ্রত আরো আছেন বুড়ী ১৯৬॥
ঠাকুরপাড়া বামনপাড়া আছে বৈদ্যপাড়া।
পাড়ায় পাড়ায় গ্রামখানি সব জোড়া॥
কায়েতপাড়া গণকপাড়া, কর্ণিপাড়া আছে।
কামারপাড়া ছুতারপাড়া কুমারপাড়াও আছে॥
মালীপাড়া ১৯৭ নাউয়াপাড়া, রাঢ়িরপাড়ার কাছে।
তাঁতীপাড়া গিরস্তপাড়া, আছে গ্রামের পাছে॥
গ্রামের দক্ষিণে আছে জোলাপাড়া বড়।
দুস্তুতি তৈয়ার ক'র্‌তে তাম্‌রা ১৯৮ বড় দড়॥
গুঁড় কিন্‌তে চাও যদি গুঁড়াতিপাড়া যাও।
কড়ি দিয়া যত কিনো মিলবে আরো ফাও॥
তেলীপাড়া আছে আরো মিয়াপাড়া আছে।
কত পাড়ার কথা কমো গান বাড়ে পাছে॥
বৈদ্যপাড়ার কাছে আছে শোত্তির পাড়া।
এক পাড়ায় কথা কৈলে সব পাড়ায় সারা॥
উত্তরে দক্ষিণে লম্বা ঠাকুরপাড়া খানি।
সর্ক'ল পণ্ডিত তার সকলি বিদ্যামণি॥
দেখিতে সুন্দর তারা আগুনের মত রং।
দেবতার মত মূর্ত্তি তাদের মুনির মত ঢং॥
ভোরে স্নান সন্ধ্যা তর্পণ স্তব পূজা জপ।
সমস্ত দিন পড়া শুনা সমস্ত দিন তপ॥
সকলের আছে চৌপারী ১৯৯ পড়ুয়া কত পড়ে।
পড়ুয়া চলিলে যেন গ্রামখানি নড়ে॥
শ্রীপঞ্চমী পূজার সমে ২০০ পড়ুয়ারা মেলে।
হর হর ধ্বনি করে গ্রাম যেন টলে॥
নবদ্বীপে সরস্বতী আগে এক পহর ২০১।
বসতি করেন ইহা জানে সর্ব্বত্তর ২০২॥

১৯৫। কুঁড়া = কুণ্ড, দহ।
১৯৬। বুড়ী = গ্রাম্য দেবী, বনদুর্গা ; নদীর দেবতা।
১৯৭। নাউয়াপাড়া = নাপিতপাড়া।
১৯৮। তাম্‌রা = তাহারা।
১৯৯। চৌপারী = চতুষ্পাঠী।
২০০। সমে = সময়ে।
২০১। পহর = প্রহর।
২০২। সর্ব্বত্তর = সর্ব্বত্র।

ইটা কুমারিতে থাকে আসি পহর বেলা।
মাইয়া লোকের সঙ্গে হয় সরস্বতীর খেলা ॥ *
সেই ঠাকুর বংশের পদে করিয়া প্রণাম।
মদন কামের জাগ গায় দাস রতিরাম ॥

কুলটা রমণীর উপপতির রূপ বর্ণণা।

আগুনের মত সোয়ামীর ২০৩ রূপ
নাক মুখ চৌখ সব ভাল।
বড় তাঁয় ২০৪ সুন্দর সবাই কয় তাক
বঁধুয়া তো মোর কাল ॥
তেঁওতো ২০৫ বন্ধুয়ার কাণি নগুলের ২০৬
রূপ কোণা ২০৭ সোয়ামীত নাই।
এরূপ দেখিয়া কে সেরূপ চায়
কোন খানে এরূপ পাই ॥
চাঁন্দক ২০৮ সুন্দর ফুলেক সুন্দর
সবাকে সবায় যে কয়।
খানিক ২০৯ দেখিলে সে সব সুন্দর
দেখিতে কি ইচ্ছা হয় ॥
জনম ভরিয়া বঁধুয়ার রূপ
দেখিছোঁ ২১০ মিটেনা আশ।
দেখিতে দেখিতে তেঁওতো মিটেনা
আরো বাড়ে হাভিলাষ ২১১ ॥

"মাইয়া লোকের সঙ্গে হয় স্বরস্বতীর খেলা" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—এখানে বোধ হয় স্ত্রীলোকেরাও বিলক্ষণ শিক্ষিতা ছিলেন।

২০৩। সোয়ামী = স্বামী।
২০৪। তাঁয় = তিনি।
২০৫। তেঁওতো = তথাপিও।
২০৬। কাণিনগুলের = কণিষ্ঠ অঙ্গুলীর।
২০৭। রূপকোণা = রূপটুকু।
২০৮। চান্দক = চাঁদকে।
২০৯। খানিক = ক্ষণেক।
২১০। দেখিছোঁ = দেখিতেছি।
২১১। হাবিলাষ = অভিলাষ।

চোকের কথন আলিস ২১১ হয় না
  পড়েনা চোকের পাতা।
সে রূপের সনে মিছামিছি কেনে
  দেখাইমো লতা পাতা॥
বঁধুয়ার রূপ বঁধুয়ার মত
  আর নাই সেরূপের মত।
কালা মাণিকের রঙ্গও হা'র মানে
  তোমাক বুঝা'মো ২১২ কত॥
মুখখানি তার কেমন সুন্দর
  কপাল চওড়া বড়।
মাথার বাবুরী কোঁকড়া কোঁকড়া
  ঘাড়ে আসি হইছে জড়॥
সরু মোটা নয় ভুরু দুটী তার
  কাল পিপীড়ার সাইর।
কাণের ছেন্দা ২১৩ হাতে বাহির হইছে
  কি মধু খাইতে তার॥
মোটা সোটা তার দীঘল দীঘল
  চৌক দুটী ভাসা ভাসা।
সে চৌক দেখিয়া উঁচা নাক দেখি
  মনের পূরিবে আশা॥
অলপ অলপ হইছে কেবল
  মুখেতে পাতলা মোচ ২১৪।
ভুরু আঁকি বিধি মোচ দুখ্‌না* আঁকিছে
  পড়িছে অলপ পোঁচ॥
ঠোঁট দুইটী তার কত যে সুন্দর
  কুন্দান হীরার দাঁত।

২১১। আলিস=আলস্য।

২১২। বুঝা'মো=বুঝাইব। রঙ্গপুরে উত্তম পুরুষে 'ব' বিভক্তি স্থানে—'ম' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।

১১৩। ছেন্দা=ছিদ্র।

২১৪। মোচ=গোঁপ। গোঁপের বর্ণনায় কবির বলিবার ভাব এই যে, বিধাতা তুলিতে কালী পুরিয়া প্রথমে ভ্রূযুগল আঁকিয়াছেন; তাহাতেই তাঁহার কালী ফুরাইয়া গিয়াছে, সেই তুলি দিয়া গোঁপ আঁকিতে সামান্য মাত্র কালীর পোঁচ পড়িয়াছে। কবি এই উৎপ্রেক্ষা করিতেছেন।

* দুখ্‌না—দুইটী।

দেখিলে বউরী সব ভুলি যায়
ঐ খানে হয় মাত ॥
মুখখানিতে তার কত আছে মধু
মুখখানি মধুর ভাঁড়।
মাথা হাতে তার ক্রমে ঢাল ২১৫ করি
কাটিয়া করিছে ঘাড় ॥
মাঠের মতন কেমন চওড়া
পাটার মতন বুক।
সে কঠিন বুক দেখি শত্তুরুর ২১৬
শুকাইয়া যায় মুখ ॥
বুক-রাজপাটে কে আসি বসিবে
কে হইবে এখানে রাজা।
জোর করি মুঞি দখল করিনু
মোর বুক বড় তাজা ॥
মোটা মোটা তার হাত দুই খানি
নোহা দিয়া যেন গড়া।
ড্যানা ২১৭ দুইখানি মোহার মতন
হাড়ে মংসে ২১৮ রগে জড়া ॥
সিদা ২১৯ যদি করে বাইমের ২২০ মতন
মাঝোতে মাঝোতে ফুলে।
জোরেতে নগুলে ২২১ টিপা যদি যায়
খাল নাহি পড়ে মূলে ॥
সে দাপনা ২২২ দুটী আপনার করিচোঁ ২২৩
কিছুতে নাহি মোর ভয়।
এ ননীর দেহ সখীরে তাহার
সকল দাপট ২২৪ সয় ॥

২১৫। ঢাল=ঢালু।
২১৬। শত্তুরুর=শত্রুর।
২১৭। ড্যানা=বাহু।
২১৮। মংসে=মাংসে।
২১৯। সিদা=সোজা।
২২০। বাইমের মত=বাইম মাছের মত; অর্থাৎ পেশী (muscle) সংযুক্ত। যেমন বাইম মাছের গাত্রে দেখা যায়।
২২১। নগুলে=অঙ্গুলিতে।
২২২। দাপনা=বাহু।
২২৩। করিচো=করিয়াছি।
২২৪। দাপট=বেগ।

ওসারে পসারে   যেমন বুকখানি
তেমনি চরপটা ২২৫ পাছা।
ছিলিমের মত ২২৬   কেনে তার সরু
কমরখানি ২২৭ কও ছাঁচা ২২৮॥
লোহার কলার   গাছের মতন
দুইটী উরাত ২২৯ তার।
শক্ত হইলেও   বড় ছিলছিলা ২৩০
আছে কি এমন আর॥
বড়ই কঠিন   বধুয়ায় সব
নরম কেবল পাঁও।
গোলাপ ফুলের   পাশির ২৩১ মতন
বড়ই ভাগ্যেতে পাও ২৩২॥
বাঁওতে ২৩৩ তামার ২৩৪ খাড়া হনু ২৩৫ মুঞি
ঘর খানি হইল আলা ২৩৬।
কি করি কহিম্   আপনার রূপ
এ বড় হইল জ্বালা॥
আমার রূপের   ঝলক ২৩৭ বেরায় ২৩৮
কে আর পলক ফেলে॥
ফ্যাল্ ফ্যাল্ করি   সকলে চাহিছে
চৌকে যেন রূপ গিলে॥
রূপের ঝলকে   চৌকে লাগে ধান্দা
বাঁন্ধা পড়ে রূপের জালে॥
এ জাল ছিঁড়িয়া   উড়াইতে পারেনা
পার্‌বেওনা কোন কালে॥

২২৫। চরপটা=পাছা, নিতম্ব।
২২৬। ছিলিমের মত=কল্‌কের ন্যায়।
২২৭। কমরখানি=কোমরটী
২২৮। ছাঁচা=সত্য। হিন্দি সাচ্চা শব্দ হইতে উৎপন্ন।
২২৯। উরাত=উরু।
২৩০। ছিল্‌ছিলা=মসৃণ।
২৩১। পাশির=পাপড়ির।
২৩২। পাও=পাইয়াছি।
২৩৩। বাঁওতে=বামেতে।
২৩৪। তামার=তাঁহার।
২৩৫। খাড়া হনু=দাঁড়াইলাম।
২৩৬। আলা=আলো।
২৩৭। ঝলক=জ্যোতি।
২৩৮। বেরায়=বাহির হয়।

কাঞ্চা সোণা যেন আমার বরণ
চুলগুলা মিশ্‌মিশা কাল।
আউলিয়া পড়িছে পিঠের উপর
হাঁটু হাতে কেমন ভাল॥
আঁচড়ান চুল দেবীর মতন
পড়িয়াছে পীঠ ভরা।
নিতি নিতি চাঁদ আঁন্ধারে তাড়ায়
পালাইল পাতালে তারা॥
চাঁন্দে ধরিবারে তাম্‌রা জড় হয়া।
মোকে বুঝি চাঁন্দ ভাবি।—
মাটি ফাড়ি উঠি পিঠির ভিত্তি দিয়া
মোকে ধরে অজগবি ২৩৯॥
মাঝোতে মাঝোতে আছে বেণী ফুল
আকাশে যেমন তারা।
সিঁতির উপর সিঁতিপাটী খানি
দেওয়া চিলিকার ধারা ২৪০॥
সিঁতির উপরে সিঁতি পাটী খানি
হীরা দিয়া গড়া সেটা।
নীল আকাশের মাঝোতে যেমন
গাঁড়া মহিষের ২৪১ ঘাটা॥
উঁচা নীচা নাই ছোট না বড় না
সোনার কপাল মোর।
তাহার উপর সরু সরু ভুরু
সাজা দেয় পা(ই)লে চোর॥
কামরাজা বুঝি ভুরুর শিকলে
পাতিয়া রাখিয়া ফাঁন্দ।
উড়ন্ত নয়ান খঞ্জন দুটীরে
ধরিয়া দিয়াছে বান্ধ॥
রূপের ঢেউতে ভাসিতে ভাসিতে
নয়ান কমল যায়।

২৩৯। অজগবি—অকস্মাৎ।
২৪০। ধারা—তুল্য।
২৪১। গাঁড়া মহিষের ঘাটা—ছায়াপথ।

এ কবিতাটীতে কালিদাসের কোন কবিতার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

তেঁওতো তাহার পাচে কত কত
ভোমরা উড়িয়া ধায়॥
নয়ানের কোণে আগুন জ্বলিছে
কি কহিমো তোর ঠাঁই।
রূপের আগুনে কত যে ফরিঙ্গ
পুড়িয়া হইল ছাই॥
মুখের মতন নাকটী সুন্দর
গোলাপের মত গাল।
মুকুতার মত দাঁতের গাথুনি
ওঁঠ দুটী বড় লাল॥
গলার উপরে দুটী কি তিনটী
পড়িছে অল্প খাঁচ ২৪১।
এরূপ হেরিয়া অনেক আগোতে ২৪২
করিতে দেবির আঁচ ২৪৩॥
হস্ত দুই খানি গোল গাল মোর
কিল্কানি ২৪৪ কবজা ২৪৫ তার।
উঁচা টুচা নাই দেখা নাহি যায়
গোল গাল চমৎকার॥
ড্যানার উপর সুবর্ণের তার
সোনার কঙ্কণ হাতে।
হাতের গুণেতে শোভিছে গহনা
মাণিক জ্বলিছে তাতে।
গলার নীচ হাতে কেরেমে ২৪৬ উঠিছে
বুকখানি হয়া উঁচা।
সংসারের ভিতর এই বুক ছাঁচা
আর সৌগ্ ২৪৭ বুঝি মিছা॥
সে বুক খানি ঢাকা তো ছিল না
আধ খানি ছিল খোলা।

২৪১। খাঁচ—রেখা।
২৪২। আগোতে—অগ্রে।
২৪৩। আঁচ—অনুমান।
২৪৪। কিল্কানি—কনুই।
২৪৫। কবজা—মণিবন্ধ।
২৪৬। কেরেমে—ক্রমে।
২৪৭। সৌগ—সকল।

সে বুকের উপরে মুকুতার মালা
সাত নড়ি আছিল ঝুলা॥
সব জমিদারক্ ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া
দেবীসিং হরেরাম।
যেমন কঠিন হয়া মোটা হয়
উচ্চা হ'য়া করে নাম॥
সেইরূপে বুঝি সৌগ অঙ্গ হাতে
সার নিয়া চুচি* ছুটা।
বড়ই কঠিন মাথা উচা করি
হইছে বুঝি মোটা সোটা॥
শিবচন্দ্রের হাতে যেমন হইল
সে ছুটার অধঃপাত।
সেইরূপ পাপ এছুটার বুঝি
করিবে বন্ধুয়ার হাত॥
একদিগে চুঁচি* আর দিগে পাছা
দুজনে লইল টানি।
আছে কিনা আছে বুঝা নাহি যায়
আমার কমর খানি॥
এক দিকে যেমন মন্থনা লইল
অন্য দিকে বামণডাঙ্গা।
ফতেপুর এখন আছে কিনা আছে
সব দিকে হইছে ভাঙ্গা॥
তার উপর ভার পঞ্চসনা নামে
পড়িছে কাগজের গাদি।
দুর্ব্বল কোমরের উপরে পড়িছে
সেরূপে পেটের সুধি ২৪৮॥
সাগর উপরে তিন নড়া মোর
পড়িছে সোণার গোট।
সুখসাগর ২৪৯ যেন ঘিরিয়া ফেলাইছে।
মদন রাজার কোট॥

২৪৮। সুধি=নাদি বা নাধি, ভুড়ি। ২৪৯। সুখসাগর=পরিখা।

পদ্ম দুখানি সোণার জাঙ্গাল ১৫০
পাশাপাশি হয়া গেইছে।
যে পুরের কাছে মোটা সোটা হয়্যা
বাহিরেতে সরু হইচে॥
চান্দক চিপিয়া জোনাক লইয়া
তাহাতে মিশায়া ননী।
সোণাক চিপিয়া রং খানি নিয়া
বিধি বুঝি সব ছানী॥
তাতে দিয়া মোকে গড়াইছে সখি
না হইলে এমন রূপ।
কেমনে পাইনু এই কোণা ঠিক্
ভাবিয়া থাকেক চুপ॥
পাঁওতে পড়িছে সকলের চোক
কি দেখে পাঁওতে মোর।
সকলেতে কয় ইনিই ভবানী
ভাবেতে হইয়া ভোর

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

২৫০। জাঙ্গাল=উচ্চপথ।